ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥
১নং শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

পরম আরাধ্য পিতৃদেব
স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষের
শ্রীচরণে

ভূমিকা

ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্তমান গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করেছেন। গ্রন্থমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত আলোচনার পূর্বে লেখক বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় কিভাবে বাঙালীর ধর্মীয় চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি বিস্তৃত ইতিহাস দিয়েছেন এবং কি ভাবে ধীরে ধীরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষা ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল তারও বিবরণ লিখেছেন।

দীর্ঘ ধর্মীয় পটভূমিকা প্রস্তুত করার পরে ডঃ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার মানসিক ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কবির ধর্মচিন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে শুধু তাই নয়, কবির সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মগুরুদের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মচিন্তা ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাও এই গ্রন্থে যথাসম্ভব সরলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তা কি ভাবে সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল তারও ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে।

সব থেকে বড় কথা হচ্ছে রবীন্দ্র সাহিত্য থেকেও লেখক কবির ধর্মচিন্তার দিক্ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন এবং এই কঠিন ব্রততে তিনি নানা দিক্ দিয়ে অভিনবত্ব ও মৌলিকতা দেখিয়েছেন। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে বহুস্থলে বিতর্কের অবকাশ আছে তা সকলেই জানেন, এবং ডঃ ঘোষের অভিমত যে সর্বত্রই সর্বজন গ্রাহ্য হবে তা কখনই জোর করে বলা চলে না। কিন্তু লেখকের অকপট প্রয়াস ও পরিশ্রম কোথাও অস্বীকার করা চলে না।

গবেষণার বিষয় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে প্রথম স্পন্দন লাভ করলেও এই গ্রন্থে পাঠকের নানা বিষয়ের বিচিত্র কৌতূহল জাগ্রত ও শান্ত হবে। একাধারে ধর্মের ইতিহাস, বাংলার মনীষার বিবরণ, রবীন্দ্রসাহিত্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও কবি-জীবনের ধর্মচেতনার ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে সংক্ষেপে অথচ সব দিক্ দিয়েই আলোচিত হয়েছে। তাই আমার বিশ্বাস কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক নয় বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসের কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীও এই গ্রন্থ-পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আমি এই গ্রন্থের সুপ্রচার কামনা করি।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
১০, জুলাই, ১৯৬৯

বিশ্লেষণী

এই গ্রন্থে নিবদ্ধ আমার যে গবেষণা কার্যটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ' সেই নাম সম্পর্কে সর্ব প্রথম আমার কিছু বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির যে ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে সেইগুলি আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিরোনামা দেওয়া হয়েছে তার থেকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা বিষয়ে ব্যাপকতর অর্থ করা যেতে পারে। তাই এখানে বলে রাখি যে ধর্মজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধরণের চিন্তা তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্যে পাওয়া যায় তাই আমার আলোচ্য বিষয়। শিরোনামার সহজ অর্থ অন্য ধরণেরও করা যেতে পারে বলেই এই কথাটি প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন।

আমার মনে হয় ইতিপূর্বে ঠিক এই শ্রেণীর কোন সুসম্পূর্ণ কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের যে সমস্ত রচনা এর আগে বিভিন্ন বই ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির রূপ সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত। তবুও এগুলি থেকে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা গভীর ও ব্যাপক ত বটেই, সহজে বোধগম্যও নয়। আমার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝেছি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। আমার গবেষণার ফল এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে লেখা হয়েছে। সংক্ষেপে বোঝার জন্য সংক্ষিপ্তসারও এখানে পৃথকভাবে দেওয়া হল।

দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রেরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রদর্শন আলোচনা করেন এবং দর্শন শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী যে সব technical রূপ ও ভাষ্য দেন, এই গবেষণা কাজের মধ্যে সে শ্রেণীর ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ আমি অন্যভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করেছি। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রের পক্ষে হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিই মূল উপজীব্য বিষয় হত। কিন্তু আমি প্রধানতঃ তাঁর কাব্যগান, নাটক, গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ধর্মমতবাদের যে বিকাশ দেখতে পেয়েছি তারই পরিচয় দেবার চেষ্টা এবং কবির প্রবন্ধগুলি আলোচনা করে সেই মতবাদের সমর্থন অনুসন্ধান করেছি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাবলী থেকে আমি ধর্ম বিষয়ে তাঁর যে চিন্তাধারা লক্ষ্য করেছি মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে মতবাদ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তৃতির ক্ষেত্র অসীম। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য জগতের বহু উর্ধ্বে উঠতে

পেরেছিলেন; ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বোধ ও লাভ ক্ষতির সীমানা ছাড়িয়ে। এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র সমগ্র সৃষ্টির অন্তঃস্থলে পরমানন্দের যে উৎসটি লুকানো আছে সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ তারই উপলব্ধির তপস্যা করে গিয়েছেন বলে মনে হয়। আধুনিক যুগের একজন প্রধান ইংরাজ কবি লিখেছেন—In quest of that one beauty God put me here to find, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য রয়েছে তারই সন্ধানে যাত্রা-পথে এগিয়ে চলাই কবির কাজ। রবীন্দ্রনাথও সমস্ত রচনাসম্ভার ও জীবনের মধ্য দিয়ে এই পরমানন্দের এবং পরম সৌন্দর্যের স্বরূপটি ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস যে কোনদিন শেষ হবার নয় তারও আভাস কবির রচনায় পাওয়া যায়। তাই কবি লিখেছেন,—

জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে,
প্রভাতের আলোকে যা ফোটে নাই প্রকাশে
জীবনের শেষ দানে জীবনের শেষ গানে
হে দেবতা তাই আজি দিব তব সকাশে।......

এই পরমানন্দ, যা ব্রহ্মেরই নামান্তরমাত্র, তার উপলব্ধির জন্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী তপস্যা। একথা কবি নানাভাবেই বলে গিয়েছেন। তাই বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁকে জীবনের চরম আনন্দ দিয়েছে এবং কবি গেয়েছেন,

এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।

শুধু তাই নয়। কবির জীবনে এই তপস্যা শুধু এক জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। জন্মজন্মান্তর ধরেই তা চলবে। তাই কবি বলেছেন,—

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে
তবে তোমার দেখা পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।

পরিশেষে ব্যক্তিগত কথা রূপে বলতে চাই যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ছাড়া আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হত না। তিনি শুধু আমাকে পথনির্দেশই করেননি, উৎসাহ দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন। পাটনার রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের লাইব্রেরীর মাধ্যমে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। সাহায্য পেয়েছি আমার বহু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর কাছ থেকে। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া আর যাদের সাহায্যে আমি অগ্রসর হয়েছি তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কৃতজ্ঞতার নয়। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত অবসরে গবেষণার অবকাশ আমি পাইনি। কর্মকঠোর সংসারের প্রতিদিনের পথ চলায় সকল সময়ে আমার পাশে থেকে মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব সমস্ত ভার গ্রহণ করে আমাকে যথাসাধ্য অবসর দান ও সাহায্য করেছে রীণা ঘোষ।

পুস্তক আকারে প্রকাশ কালে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। বুকল্যাণ্ড এটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বহু মুদ্রণ ত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদ বইটিতে রয়ে গিয়েছে। ক্ষমার্হ না হলেও এ বিষয় পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার এই গবেষণা কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মতের যে সুগভীর তত্ত্বকে আমি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি তা কতদূর সার্থক হয়েছে সে বিবেচনা সুধীজনে করবেন।

১৫. ৮. ৬১ বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

সংক্ষিপ্ত সার

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রথম প্রত্যুষে মানবের মধ্যে ধর্মমনোভাবের বিকাশ :— পৃঃ ১-৭

পৃথিবীতে জীবনের প্রথম স্পন্দন—অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য—প্রকৃতি ও মানুষ—মানসিক শক্তির বিকাশ—সভ্যতার প্রসার—ঐশ্বরিক সত্তার অনুভব—দেবতার কল্পনা—ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার ধর্মীয় অবস্থা :— পৃঃ ৮-১৮

ভারতের সর্বসমন্বয়—বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলন সাধন—ধর্ম ও সাহিত্য—চর্যাগীতির ধর্মমতের ব্যাপকতা ও প্রসার—প্রহেলিকা বিলাস—সুফী সম্প্রদায়—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব—বৈষ্ণব সাহিত্য—মুসলমান কবিদের উপর রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ :— পৃঃ ১৯-৩২

উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ—হিন্দুধর্মের সংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—রামমোহন ও বেদান্ত—বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা—রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ—দেবেন্দ্রনাথ ও উপনিষদ—ব্রাহ্ম সমাজে বেদ ও বেদান্তবাদ পরিত্যাগ এবং রামমোহনের ধারার পরিবর্তন—প্রগতিশীল কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্ম সমাজে বিভাগ—কুচবিহার বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজে পুনর্বিভাগ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিধবা বিবাহ—পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের প্রভাব—চিকাগো সম্মেলন ও স্বামী বিবেকানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় :—
(রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ) পৃঃ ৩৩-৭৫

ভারতে হিন্দু ধর্মের স্থিতিশীলতা—হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়—একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা—রামমোহনের মতবাদ—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, মহা

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

॥ প্রথম প্রত্যুষে মানবের মধ্যে ধর্ম মনোভাবের বিকাশ ॥

জীবন ধারার যে অনন্ত স্রোত মহাকালের দিকে বয়ে চলেছে তার সূত্রপাত যে কবে সে কথা জানা নেই। লক্ষ কোটি বৎসর আগে পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন প্রথম শোনা গেল। জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে কে সর্বপ্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল ও সেই স্বপ্ন ভাঙ্গা দৃষ্টিতে কি দেখেছিল সে কথা জানা না থাকলেও এ তথ্য বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে অনুভবের প্রগাঢ়তায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রকাশ করে বলেছেন— "আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগপূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম।"১

তারপর ডারউইনের বিবর্তনবাদের ধারা বয়ে জীব বংশ ধাপের পর ধাপ ভেঙে এগিয়ে চলেছে পূর্ণতার দিকে—সফলতার দিকে। এমনই করে—একদিন মানুষ পৃথিবীর এই নবরাজ্যে প্রথম পদার্পণ করল। সেদিনের সাল তারিখ আজ আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সে ঘটনা আজ হতে শত সহস্র বৎসর আগেকার ঘটনা। মানুষ যখন প্রথম আগমন করল তখন প্রাণীজগতের অন্যান্য জীবের সঙ্গে তার পার্থক্য বিশেষ ছিল না। অন্যান্য প্রাণীদের মতোই সে ছিল সদা শঙ্কিত। আজ মানুষ যত শক্তিধর, সেদিন এতো শক্তিধর ছিল না। আপনার দুর্বল বাহুবলের জন্য অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের থেকে আত্মরক্ষার চিন্তায় সেদিন মানুষ ছিল সর্বদা উদ্বিগ্ন। শক্তির

১। আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-২৩

অভাব বুদ্ধির প্রভাবে মিটিয়ে নেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। কারণ তা না হলে জীবনধারণের সংগ্রামে তাকে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দিতে হতো। সেই কারণেই মানুষ পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুকেই শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল।

প্রকৃতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সেদিন মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ আত্মরক্ষার চিন্তায় সেদিন মানুষ এতোই ব্যস্ত ছিল যে, প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে সে তার পরিপন্থী বলেই গ্রহণ করেছিল। কারণ সেদিন মানুষের সন্দেহাকুল মন কোন পরিবর্তনকেই বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সে মনে করতো যে এই পরিবর্তন তার অস্তিত্বকে লুপ্ত করার ষড়যন্ত্র মাত্র। প্রকৃতির মঙ্গলদায়ক শক্তিকে সেইজন্য সে শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখতো। প্রকৃতির বিভিন্ন মঙ্গলদায়ক শক্তি যে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রকৃত পক্ষে মানুষেরই উপকার সাধন করে তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে এ বোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা বশতঃ সকল কিছুর প্রতিই মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়তো। রাত্রি সম্বন্ধে সেইজন্যই ছিল ভয়, ঋতু পরিবর্তনে শঙ্কার প্রাবল্য। এমনই আরো কত কি। এক কথায় বলতে পারা যায় যে প্রকৃতির মঙ্গলদায়ক শক্তি সম্বন্ধে মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই কারণে যে অন্যান্য প্রাণীরা যেখানে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে, সেখানে মানুষ মানসিক শক্তির বিকাশে নিজেকে উন্নত করে তোলে। এই মানসিক শক্তির প্রভাবেই সে পৃথিবীতে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পেরেছে। কারণ অন্যান্যদের মতো বাহ্যদৃষ্টিতে সে সকল কিছুকে নিরীক্ষণ করে না, বলে না, 'ফুরায়ে যা দেরে ফুরাতে।' সমস্ত কিছুরই অন্তর্নিহিত শক্তির বা কারণের অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয়। সেই কারণেই মানুষ তার চারিদিকের সকল কিছুকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। এই পর্যবেক্ষণের ফলে সে এক অসীম সত্যকে আবিষ্কার করলো। দেখতে পেলো যে, অদৃশ্য বিধি-বিধানে পৃথিবীর চক্রপথ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রতিদিন একই সময় সূর্য চন্দ্রের উদয় ও অস্ত হয়। একই নিয়মে ঋতুর পরিবর্তন হয়। এক অদৃশ্য হস্ত যেন সমস্ত কিছুকেই পরিচালিত করছে। সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই সমস্ত কিছু চালিত হচ্ছে বলে এই আসা-যাওয়ার কোন ব্যতিক্রম হয় না। শুধু তাই নয়। এই প্রতিনিয়ত শৃঙ্খলাময় প্রাকৃতিক

বিবর্তনের মধ্যে এক অলক্ষিত শুভ নির্দেশ রয়েছে। তখন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগলো যে, কে এই সমস্ত পরিচালিত করছেন তিনি যেই হোন, সকলের মঙ্গল সাধনই তাঁর উদ্দেশ্য। হয়তো সাময়িকভাবে দু'একজনের ক্ষতি তাতে হতে পারে, কিন্তু সামূহিকভাবে সকলের মঙ্গলই তাঁর চরম লক্ষ্য। ধ্বংস শুধু ধ্বংসের জন্যই হয়না, অনেক সময় ধ্বংসের প্রয়োজন হয় সৃষ্টির জন্য। কারণ তা না হলে জীবজগতের অস্তিত্ব বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যেতো। এইভাবেই মানুষ দৈনিক ঘটনা সমূহকে পর্যালোচনা করে অদৃশ্য ঐশীশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করলো। আরেকটি বিষয়ও ক্রমে মানুষের বোধ শক্তির অধিগম্য হল। মানুষ বুঝতে পারলো যে, ঐশীশক্তির প্রভাবে কেবল সৃজনই হয় না ধ্বংসও হয়। যে অগ্নি সমস্ত জীবজন্তুর কবল থেকে রক্ষা করে ও আরও নানা হিত সাধন করে, সেই অগ্নিই সময় বিশেষে বহুদিনের গড়ে তোলা হর্ম্যাকে ভস্মীভূত করে দেয়। সূর্য যেমন আলোর বিকাশে এনে দেয় বরাভয়, তেমনিই গ্রীষ্মের প্রখর কিরণে শস্যকে করে ফেলে দগ্ধ। বর্ষা আনে সঞ্জীবনীধারা। পুনশ্চ, অতি বর্ষণে দেখা দেয় বন্যার তাণ্ডব লীলা। অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে ধ্বংসের লীলা অভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে।

মানুষের বোধশক্তির বিকাশ যত হতে লাগলো ততই সভ্যতাও প্রসার লাভ করলো। ঐশীশক্তি সম্বন্ধে মানুষের এই ধারণা উপলব্ধি সেই কারণেই সভ্যতার সংস্পর্শ হীন জাতি অপেক্ষা, সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল জাতিসমূহের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ভারতেওএর ব্যতিক্রম হয়নি।

আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোবিকাশের আভাস দেখতে পাওয়া যায়, যে ভাব ভারতে বসবাসকারী আদিম জাতি সমূহের মধ্যে ছিল না। তদানীন্তন সাহিত্যেই-এর স্বরূপ আমরা দেখতে পাই।

অগ্রগতির সঙ্গে পূর্ব নির্দিষ্ট যে সত্য আর অবিদিত রইল না, তারই প্রভাবে সে অনুভব করলো যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বর্ষা আদি যত কিছুই মানুষের উপকার সাধন করুক না কেন সমস্ত কিছুই পরিচালিত হচ্ছে এক বিশেষ শক্তির প্রভাবে। সেই কারণে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য চন্দ্রের উদয় ও অস্ত হয়, বর্ষার পর শরৎ ও শরতের পর হেমন্তের যাওয়া আসা পৃথিবীর আঙিনায় চলে। কিন্তু কি সেই মহাশক্তি যিনি এমন সব শক্তিধরদের এক বিশেষ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করছেন [১] সেই অদৃশ্য অনন্ত মহাশক্তিকে আর্যঋষিরা ব্রহ্ম নামে

১। অবশ্য প্রাক আর্য ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ জ্ঞান নেই।

অভিহিত করলেন, বললেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" [৩।১৪।১][১]

ব্রহ্মই সব, সমস্তই সেই ব্রহ্ম শক্তিতে লীন। সেই কারণে সকল শক্তির মূল শক্তি সেই ব্রহ্মই উপাসনার বস্তু। কারণ, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, ইত্যাদি যে কোন শক্তিই হোক না কেন ব্রহ্ম ব্যতীত কেহই প্রকাশমান হতে পারেন না। কারণ ব্রহ্মই সকলের মূলীভূত কারণ।

এষোহগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥[২]

"ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হন, ইনি সূর্য [রূপে প্রকাশ করেন], পর্জন্য [রূপে বর্ষণ করেন], ইন্দ্র [রূপে প্রজাপালন ও অসুরদিগকে সংহার করেন] বায়ু [রূপে মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডল সমূহকে বহন করেন,] পৃথিবী [রূপে সকলকে ধারণ করেন], চন্দ্রমা [রূপে পোষণ করেন], ইনি মূর্ত ও অমূর্ত, যাহা কিছু অমৃত তাহাও ইনি।" অর্থাৎ সমস্ত শক্তিই সেই ব্রহ্ম দ্বারাই প্রকাশমান। ব্রহ্ম ব্যতীত কোন কিছুই ব্যক্ত হতে পারে না।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি ॥[৩]

"তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয়, তাহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।"

এইভাবে মানুষ এক অনাদি অনন্ত অমর শক্তির আবিষ্কার করল—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যাঁর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই সঙ্গে অপর এক সত্য তার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হল। সূর্য চন্দ্রের ন্যায় বিরাট শক্তি যখন সেই অদৃশ্য মহাশক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, এবং জড় ও জীবের সমস্ত কার্যকারণই যখন সে ব্রহ্মকে ছাড়া চলতে পারছে না—কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী,

১। ছান্দোগ্যপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্দশখণ্ড—শাণ্ডিল্যবিদ্যা। উপনিষদ গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ [৩য় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৬] স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত পৃঃ ১৭১।

২। প্রশ্নোপনিষদ—দ্বিতীয় প্রশ্ন [স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী—প্রথমভাগ পৃষ্ঠা-১৪৭ [ষষ্ঠ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৬]

৩। কঠোপনিষদ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা-১১৫।

তখন মানুষের মধ্যেও নিশ্চয় সেই ব্রহ্ম অবস্থিতি করছেন। সুতরাং আমি অর্থাৎ মানুষ হীন নই। কেননা আমার মধ্যেও সর্ব শক্তিমানের অস্তিত্ব রয়েছে—

'যোহ সাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি।"[১]

"যিনি আদিত্য মণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাহা হইতে অভিন্ন।" এই ভাবে নিজের মধ্যে ঐশীশক্তির অমর অনুষ্ঠান আর অগোচর রইলোনা। কিন্তু এই উপলব্ধি সকলের বোধগম্য নয়, কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই সে সত্য অবগত হন,—

হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজংব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥[২]

"জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশ মধ্যে অবিদ্যাদোষশূণ্য নিরবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থসমূহের অবভাসক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানী তাহারাই মাত্র তাঁহাকে জানেন।"

উপনিষদের এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। শ্লোকগুলি ভাবের দিক দিয়ে যেমন সমৃদ্ধ, কবিত্বের দিক দিয়েও তার চেয়ে কম সমৃদ্ধশালী নয়। এক ভাবন গভীর শ্রুতিসুখকর মাধুর্য শ্লোকগুলি পাঠের সময় মনকে অভিভূত করে ফেলে। কবিত্বের এই অনুপম শক্তি ভাবকে আরও বেশী ভার দিয়েছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষার ও সংসর্গের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। শ্লোকগুলির কাব্যমাধুর্য রবীন্দ্রনাথের আজন্ম কবিসত্তাকে বহুগুণে মুগ্ধ, সঞ্জীবীত ও অভিভূত করে ফেলেছিল। সেই কারণেই শ্লোকগুলি তাঁর হৃদয়ে এত গভীরভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে নিজেদের আসন গ্রহণ করতে পেরেছিল।

ঐশীশক্তির প্রভাব ও সত্য তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তিদের মধ্যে অনুভূত হলেও জনসাধারণের মধ্যে হয়তো সে তথ্য নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। অজ্ঞ জনসাধারণ এই অসীমশক্তিকে অনুভব করে সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তি

১। ঈশোপনিষদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ—গ্রন্থাবলী—[প্রথমভাগ], পৃষ্ঠা-১৩।

২। মুণ্ডকোপনিষদ—দ্বিতীয় মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী [প্রথম ভাগ] পৃষ্ঠা ২২২।

সমূহকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হলনা। সূর্যের আলো, অগ্নির তেজ, বর্ষার সঞ্জীবনী প্রভৃতিকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করতে পারলোনা। তারা সাধারণ স্থূল বুদ্ধিতে অনুভব করলো যে এই সকল শক্তি, তাদের মঙ্গল বিধান করছে ও রুষ্ট হলে ক্ষতিসাধনের কারণ হচ্ছে। সেই কারণে সম্ভবতঃ শ্রদ্ধা ও ভীতি বশতঃ তারা এসব শক্তির কাছে অন্ধের মতো নিজেদের মঙ্গলের প্রার্থনা আরম্ভ করলো।[১] তারা দেখল অগ্নি তাদের বন্য পশুদের কবল হতে মুক্ত করে, আলো দেয়। সুতরাং তারা অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাল।—

'হে অগ্নি, তুমি আমাদের ত্রাণকর।' সূর্য রাত্রির অন্ধকারের সকল ভীতিকে অপসারণ করে সেই কারণে তারা স্তুতি করল—

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

তাদের এই প্রার্থনার ফল কতদূর সার্থক হল বা হবে সে বিষয়ে যদিও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ দেখা যায় যে এইসব শক্তি নিজেদের কাজ অপ্রতিহত গতিতে নিজের মতোই করে চলেছে, মানুষের ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনা অনুযায়ী পরিবর্তিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই ধারণার পরিবর্তন হল না। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রাচীন জৈবিক ধর্ম বিশ্বাসের (animism) পরিবর্তন হয়নি। এর অর্থ—ভালো বা মন্দের আত্মার প্রতিভূরূপে পাথর গাছ বা পশুকে পূজা করা। এর একটি সাধারণ উদাহরণ এই সব আত্মার প্রতীকরূপে নাগ, যক্ষ ইত্যাদিকে পূজা করা। মহেঞ্জোদাড়োয় এর পরিষ্কার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।[২] সভ্যতার অগ্রগমনের

১। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি হইয়াছে। ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ ইন্দ্রিয়পরবশ, কুকর্মশালী বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি—দেবত্ব ও হিন্দুধর্ম—ইন্দ্র—[বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৬], পৃঃ ৭৭১

২। It means worship of stones, trees and animals in the belief that these are abodes of spirits, good or evil. A natural corollary of this faith is the worship of Nagas, Yakshas, etc. who are embodiments of these spirits. Clear traces of all these are found at Mahenjo-Daro.—An Advanced History of India, Part I by R. C. Majumdar, H. C. Ray Chowdhury and K. K. Datta—Page-21

সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবধারার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এই কারণেই আদি বৈদিক ধর্মকে হিনোথিইজ্‌ম বা ক্যাথিওথিইজ্‌ম নামেও অভিহিত করা হয়—যার অর্থ একক দেবতাদের পূজা করা, যাদের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করেন। একে প্রাকৃতিক দেবতাদের দিকে অগ্রসরকারী প্রকৃতির পূজাও বলা যায়।[১] এই ভাবেই অধিকাংশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রকৃতির শক্তির প্রতিভূরূপে একেকটি প্রতীক একেকটি দেবতার আসন বা রূপ গ্রহণ করল। বহুব্যক্তি কর্তৃক একেকটি প্রতীককে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপাসনা করার ফলে ক্রমেই জনগণের মধ্যে ধর্মচেতনা বা মনোভাবের সৃষ্টি হল। এমনই ভাবে দেবতারূপীদের আত্মপ্রকাশের পর এক একটি প্রতীককে উপাসনাকারী জনমণ্ডলী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ে পরিণত হল এবং ধর্ম মনোভাবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধার্মিক সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে ধর্ম সম্প্রদায়ের রূপ পরিগ্রহ করল।

১। The early Vedic religion has been designated by the name of Henotheism or Katheotheism a belief in single Gods, each in turn standing out as the highest. It has also been described as the worship of nature leading up to the Nature's God—An Advanced History of India, Part I by R. C. Majumdar, H. C. Ray Chowdhury and K. K. Dutta. Page 37

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় অবস্থা ॥

চক্রনেমীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় প্রতি দেশেরই সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতি পদক্ষেপে উন্নতির সোপানে আরোহন করে চলেছে। প্রতি দেশ অপরের সঙ্গে নিজের সভ্যতার তুলনা করে আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে উঠে অনেক সময় অপর দেশকে করছে অবমাননা। এইভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের এক ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবধান সৃষ্টির অপর এক যন্ত্ররূপে অভিহিত করতে পারা যায় ধর্মকে। যদিও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধার্মিক গোঁড়ামি ক্রমেই অপসৃত হচ্ছে, তবুও এর মূল জাতীয় জীবনের এমন সুদূর প্রদেশে প্রবেশ করেছে যে, কোন দেশেরই অধিবাসীরা এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এ কথা বলতে পারা যায় না। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীনকালে ধর্মীয় মনোভাব ছিল আরও প্রবল। মানুষের মনের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই সৃষ্টি হয়েছে নানা তীর্থস্থলের। সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র স্থানকে 'তীর্থ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকলেও ভারতবর্ষকে মহাতীর্থ বলতে কোন বাধা নেই। কারণ যেখানে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির লোকেরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন সেই স্থানকেই তীর্থ বলা হয়। কিন্তু কালে কালে কেবল একটি মাত্র জাতিই নয়, বহু জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় ভারতে এসে অবশেষে একাত্ম বোধের আহ্বানে মিলিত হয়ে গিয়েছে জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ভেঙে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু জাতি যুগে যুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে আক্রমণকারীরূপে। কিন্তু অবশেষে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পেরে এক মহাজাতির অঙ্গরূপে পরিণত হয়েছে।

একটি বিরাট হিয়া প্রকাশের এই বিশেষত্বের জন্য ভারত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলেও এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল বাঙ্গলায়। সেই কারণে আর্য সভ্যতা গ্রহণ করলেও ব্রহ্মণ্য গোঁড়ামি এখানে স্থান পায়নি। যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে ভারতের অন্যান্য আর্য প্রভাবিত অংশ বাঙ্গলাকে সুনজরে দেখেনি। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে পশ্চিমের আর্যেরা বাঙ্গালায় এলে তাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল এই কারণেই। মোট কথা সকলকে একত্রীকরণের জন্য যে উদার মনোভাব একান্ত আবশ্যক তার সর্বপ্রধান বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিল

বাঙ্গলায়। অর্থাৎ উদারনৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে বাঙ্গলা ছিল অনেক বেশী অগ্রণী।

যুগে যুগে নানা জাতি ও সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করার পর একত্ববোধের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহাজাতির আঙ্গিকে পরিণত হলেও আগন্তুক বা স্থানীয় জাতি বা সম্প্রদায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে পারে নি। ফলে তারা নিজ নিজ প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান বজায় রেখে চলেছিল। এরই ফলে এক মহাজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতাবলম্বীর সৃষ্টি হল। যেমন—নাথ সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়, গোরক্ষমতাবলম্বী ইত্যাদি। উদার নৈতিক বাঙ্গালাদেশ যে এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি একথা বলা বাহুল্য। বরং এখানে বিভিন্ন মতবাদের প্রচার সেই কারণেই কিছু বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে নির্ভরশীল অবলম্বন হিসাবে আমাদের সর্বপ্রথম আলোচনা করতে হয় প্রাচীন সাহিত্যের। কারণ কেবলমাত্র ভারত বা বাঙ্গালা নয়, পৃথিবীর সকলদেশেই সাহিত্যের প্রথম বিকাশ হয় ধর্মকে কেন্দ্র করেই। যার প্রাচীনতম উদাহরণ মিলছে বৈদিক সাহিত্যে। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রচনা চর্যাগীতিগুলিও ধর্ম সম্পৃক্ত। চর্যাপদের শ্লোকগুলির বাইরের অর্থ এক ও গূঢ়ার্থ আর এক। এগুলির রচনাকারী সিদ্ধাচার্যেরা হেঁয়ালীর মাধ্যমে নিজ মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে গুরুরা শিষ্যদের-এর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।

প্রাচীনকালে সংস্কৃতই ছিল দেশের সাহিত্যের ভাষা। এই পদ্ধতিতে ভাঙন আনেন বৌদ্ধেরা। জনসাধারণের মধ্যে মতবাদ প্রচারের জন্য স্থানীয় ভাষাকেই তাঁরা অবলম্বন করেন। বাঙ্গালা দেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। চর্যাপদের রচনাকারী সিদ্ধাচার্যেরা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতাবলম্বীর বজ্রযানশাখার অন্তর্গত সহজপন্থার সাধক। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের একমাত্র পরিচয় বৌদ্ধ হিসাবে নয়। কারণ আমরা অনেক চর্যায় নাথপন্থের আভাসও দেখতে পাই। চর্যাগীতির সমস্ত পদই যে বৌদ্ধমতবাদই প্রচার করেছে একথাও বলা যায় না। সিদ্ধাচার্য সরহের রচনায় নাথ যোগসম্প্রদায়ের ইঙ্গিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার চেয়ে অনেক বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন মোহগ্রস্থ গুরু মীননাথের প্রতি মুক্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের উক্তি হিসাবে উল্লেখ করা যায়, 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশি মণ্ডল। চি অরাঅ সহাবে মুকল, ইত্যাদি। তেমনিই

একই কারণে উল্লেখ করা যায়, 'বজে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা।' এই ছত্রটির।[১] বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের এই একত্রীকরণ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনই বাঙ্গালায় উদারনৈতিক মতবাদের প্রধান বিশেষত্ব। এই কারণের জন্যই সিদ্ধাচার্যদের মতবাদী পদগুলি কেবলমাত্র বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ না থেকে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে দেখা যায় যে নাথ সম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রহণ করে ঢেণ্টন পা-এর পদ কবীরের গানে এসে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে রূপ গ্রহণ করেছে।[২] কি ভাবে বাঙ্গালা চর্যাপদ ভারতের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করল তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে নাথযোগীরা সাধারণত বিভিন্ন স্থলে পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। ভাষার বাঁধন বা জাতিভেদের

১। তান্ত্রিক মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ যোগীপন্থী, এবং চর্যাগীতি কোষের সকল গানই যে তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না সে কথা স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে। কাহ্নের একটি গানের প্রথম হইতে ধর্ম ঠাকুরের ছড়ায় রক্ষিত হইয়াছে (পৃ ২৫৩)। সিদ্ধাচার্য সমূহের রচনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অপেক্ষা নাথ যোগসাধনার ইঙ্গিতই বেশী পাওয়া যায়। এই চর্যাগীতিটি মুগ্ধ গুরু মীননাথের প্রতি মুক্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের উক্তি,—'নাদ নয়, বিন্দু নয়, রবিশশিমণ্ডল নয়।' আর একটি চর্যা গীতিতে একটি ছত্রও যেন কদলীমোহমুক্ত মীননাথকে নির্দেশ করে— বজে জায়া লইলে পরে ভাঙ্গিল তোমার বিজ্ঞান।'—বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)। সুকুমার সেন, পৃঃ ২৫১

২। ঢেণ্টন পা ভনিতাযুক্ত চর্যাগীতিটির বহুল অংশ নাথসসম্প্রদায়ের দ্বারা বহিয়া আসিয়া কবীরের নামিত একটি গানে দেখা দিয়াছে। সম্ভবতঃ ঢেণ্টনের শিষ্য গানটি লিখিয়া ছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়:—

টোলাতে মোর ঘর কিন্তু পড়সী নাই
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপপতির উপদ্রব।...

কবীরের গানটি এই,—অব কেয়া করে গান গাঁও কোতোয়ালা
খ মাংস পসারি সাধ রাখোয়ালা।
মুষা কি নাও বিলাই কাঁড়ারি
শোয়ে মেণ্ডুক নাগ পহারি।
বলদ বিয়াওয়ে গাবী ভই বাঞ্ঝা
বাছরি দুহাওকে দিন তিন সঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সহে যুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে॥—বিচিত্র সাহিত্য
(প্রথম খণ্ড)—সুকুমার সেন। পৃঃ ২৫০—২৫১

প্রশ্ন তাদের কাছে ছিল না। ফলে পূর্বদেশীয় ও পশ্চিম দেশীয়দের মধ্যে এক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। সেইজন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় হিন্দী প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ পাওয়া যায়।[১] আবার ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী ভারতের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে গোরক্ষপন্থী যোগী গায়কের দ্বারা—যারা বর্তমানে 'সারঙ্গীহার' নামে পরিচিত।

বাঙ্গালা দেশের বর্তমান শৈব সম্প্রদায়ভুক্তেরাই প্রাচীন নাথপন্থের বংশধর বলা যায়। সাধনায় সিদ্ধ ও সাধকদের নামের 'নাথ' শব্দ হতেই এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছিল। উত্তর ভারতের কনকট, মচ্ছেন্দ্রী, সারঙ্গীহার, কানিপা ইত্যাদি সম্প্রদায়ই বর্তমান কালে নাথপন্থের বাহক। এর উৎপত্তি ও বিকাশ বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে ঘটলেও এই মতবাদ বাঙ্গালার নিজস্ব বস্তু নয়। বাঙ্গালার উদারনৈতিক মনোভাবের ফলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার মহামিলন ও সংমিশ্রনে যে বিশিষ্ট মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল, নাথ সম্প্রদায়ে তারই প্রকাশ।[২]

এই মতবাদের মূলসূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধান পাই। কারণ যেমন নাথসম্প্রদায়ের নিরঞ্জন আদিনাথ ও শূণ্য পুরাণের ধর্মঠাকুরের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নাই তেমনিই এই দুই কাহিনীর মূল

১। নাথপন্থী যোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিব্রাজক। ইঁহাদের মধ্যে জাতির পাঁতি ত ছিলই না, ভাষার গণ্ডীও নয়। পশ্চিমা যোগী গুরুর পুরবিয়া শিষ্য এবং পুরবিয়া গুরুর পশ্চিমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো বাঙ্গালা নাথপন্থী নিবন্ধে হিন্দি প্রশ্নোত্তর ছড়া মিলিতেছে। বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) —সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ২৫৪

২। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের শেষে নাথ শব্দের অস্তিত্ব। উত্তরবঙ্গ হইতে রাজপুতানা—গুজরাট ও পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে স্থানে স্থানে এখনো যে নিরঞ্জনপন্থী যোগী সন্ন্যাসী ভিক্ষুক সম্প্রদায় কনকট, মাচ্ছেন্দ্রী, সারঙ্গীহার কানিপা ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাঁহারা নাথপন্থেরই পথিক। বাঙ্গালাদেশে নাথপন্থী সাধুরা এখন শৈবসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।...নাথপন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।...তবু একথা বলা চলে না যে নাথধর্ম বাঙ্গালাদেশেরই নিজস্ব জিনিস। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাঙ্গালাদেশে যে বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই আংশিক প্রকাশ নাথপন্থে।—বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ২২৯

তত্ত্বের সন্ধান পাই ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এবং অপরদিকে পালিনেশীর জনশ্রুতিতে। সুতরাং ভারতের সঙ্গে বাহির বিশ্বের এক মহামিলনের স্মৃতিচিহ্নও এখানে বর্তমান।[১]

নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়েরও এক যোগসূত্র বর্তমান আছে। যদিও গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা ও মীননাথের উৎপত্তি আদিদেব ধর্মের মৃতদেহ হতে, কিন্তু এদের সম্প্রদায়গত পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন। মীননাথ গোরক্ষ—নাথের সম্প্রদায়কে বলা যায় অবধূত সম্প্রদায় এবং এদের বৈশিষ্ট্য নারী সঙ্গহীন জ্ঞানযোগের পথিক শ্রেণীভুক্ত হওয়া। অপরপক্ষে হাড়িপা কানুপার সম্প্রদায়কে কাপালিক সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা যায়।

এদের সাধনা তান্ত্রিক পদ্ধতির ও তাতে স্থান পেয়েছিলেন নারী-সাধিকারাও। পরে অবধূত ও কাপালিকদের মিলনে উদ্ভব হল নাথপন্থের। ফলে কাপালিকেরা গৃহস্থ ও ভিক্ষুকে পরিণত হলেন এবং যোগী গুরুরা অবধূত মার্গের সাধুতে হলেন রূপান্তরিত। এই নূতন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কঠোর ব্রহ্মচর্যে—যার প্রকাশ নারী জাতির নিন্দায়, যার কবল থেকে নারী দেবতারাও রক্ষা পাননি।[২]

১। শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ ঐতিহ্যের নিরঞ্জন আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরানকথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা একই। এই কাহিনীর জড় গিয়া পৌঁছায় একদিকে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে অপরদিকে পলিনেশীয় জনশ্রুতিতে। ইহার মূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত কোন অনার্যজাতির ঐতিহ্য কল্পনা করিলে এই দুই ধারার ঐক্য হয়।—বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) সুকুমার সেন, পৃঃ ২৩১

২। মীননাথ গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারী সঙ্গ বিবর্জিত জ্ঞানাশ্রিত ও যোগমার্গাবলম্বী। হাড়িপা কানুপার সম্প্রদায়ও ছিল, কিন্তু তাহা পুরাপুরি জ্ঞানাশ্রিত ছিল না। তাহাতে তান্ত্রিক সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল। প্রথমকে বলিতে পারি অবধূত যোগী সম্প্রদায় ও. দ্বিতীয়কে কাপালিক যোগী সম্প্রদায়। অবধূত যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপালিক যোগী সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য এবং বিরোধ প্রকাশিত হইয়াছে নাথপন্থ কাহিনীতে।...তাহার পর অবধূত যোগী ও কাপালিক যোগী সম্প্রদায় মিলিয়া গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই নাথপন্থ।...যোগী গুরুরা অবধূত মার্গী সাধু হইলেন, কাপালিক যোগী ও সাধকেরা ভিক্ষুক ও গৃহস্থে পরিণত হইলেন।... ব্রহ্মচর্যের উপর জোর ছিল সব চেয়ে বেশী। নাথপন্থের ঐতিহ্যে ইহার পরিচয় রহিয়াছে পদে পদে—নারী ও নারীদেবতার নিন্দায়। গোরক্ষবিজয়ের উপক্রমণিকায় গোরক্ষনাথের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনায় ইহায় তীব্র অভিব্যক্তি।

—বিচিত্র সাহিত্য—(প্রথম খণ্ড) সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ২৪৪—২৪৬

চর্যাপদে প্রহেলিকা বিলাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এই প্রহেলিকা বিলাসের সূত্রপাত চর্যাপদ থেকেই হয়েছে এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। কারণ এই সময়ের বহু পূর্ব হতেই এই মনোভাব ভারতের সাধক কবিদের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। উপনিষদের সময় হতেই সাধক কবিরা অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে প্রহেলিকার আবরণে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছেন। নাথপন্থী ও বৌদ্ধ—চর্যাকারেরা সেই ধারাই বহন করে এসেছেন বলা যেতে পারে।[১]

চর্যাকারদের পরেও এই ধারা অব্যাহত থেকে গিয়েছে।

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাঁই

কাঁহা বৃন্দাবন মোকামঞ্জিল স্থান ভেস্ত নাই'— নয়ানচাঁদ

ফকীরের বালকানামার বালক বা শিষ্যের এই প্রশ্নের ফলে একথা জানা যায় যে কলন্দর ও দরবেশ ফকীরদের মধ্যেও হেঁয়ালী অজ্ঞাত ছিল না।[২]

জৈন সম্প্রদায়ে যে সমস্ত অপভ্রংশের দোঁহা আছে তার মধ্যেও প্রহেলিকার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।[৩]

কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হেঁয়ালীতে ভাবপ্রকাশের মনোবৃত্তি কমে এলেও তার প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায় নি। সেই কারণেই বর্তমান কাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের হেঁয়ালী ভরা যোগীকাচ বা যোগী যাত্রার শ্রোতা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ—সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

২। আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৮ দ্রষ্টব্য

৩। এর উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরটি উল্লেখ করা যায়,—

প্রশ্ন—কালহিঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ
চউ একট ঠই বাস্তু।
হউ তুহিঁ পুচ্ছউ জোইয়া
পহিলে কাসু বিণাসু॥

উত্তর—সসি পোষই রবি পজ্জলই
পবণ হলোলে লেই।
সত্ত রজ্জু তমু পিল্লি করি
কর্ম্মই কালু গিলেই॥

—পাহুর দোঁহা—ডাক্তার হীরালাল জৈন সম্পাদিত, পৃঃ ২১৯-২০

এর উৎপত্তি নাথ সম্প্রদায় থেকেই। এ ছাড়া চৈতন্যের প্রভাবে যখন চারিদিকে বৈষ্ণব মতবাদের জয়যাত্রা চলে তখনও তার মধ্যে প্রহেলিকা বিলাস নিজের স্থান করে নিয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত আচার্যের হেঁয়ালীময় তরজা রচনায় দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কিছু আগে তিনি অদ্বৈত আচার্যের একটি প্রহেলিকাময় ছড়া গেয়ে শিষ্যদের কাছে তার উল্লেখ করেছিলেন।[১] বাঙ্গালাদেশে প্রায় হাজার হাজার বছর থেকে চলিত এই ধরনের প্রহেলিকাময় প্রশ্নোত্তরের আদি যুগে অর্থাৎ প্রাকৃতভাষা যখন প্রচলিত ছিল তখন এগুলি 'আর্যা' ছন্দে লিখিত হওয়ায় 'আর্যা' নামে অভিহিত হয়। পরে নামটি আরবী তরজার সঙ্গে যুক্ত হয়।[২]

হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মীয়রাই শুধু নন, মুসলমানরাও যখন এদেশে প্রথমে আক্রমণকারীরূপে প্রবেশ করলেন ও পরে এদেশেই বসবাস শুরু করেছিলেন তখন তারাও ধর্ম প্রচারে তৎপর হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভারতের উদারনৈতিক মতবাদ

১। উত্তরবঙ্গের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ যোগী কাচ [রহিমউদ্দীন মুনসার বড় যুগী কাছ ১৩২১ দ্রষ্টব্য] বা যোগীযাত্রা আগ্রহের সহিত শুনিয়া আসিয়াছে সেদিন অবধি। ইহার মূল হইতেছে নাথপন্থী সাধকসিদ্ধদের প্রহেলিকা বিলাস। ষোড়শ শতাব্দীতেও যোগীদের অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা ছড়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে অদ্বৈত আচার্যের কাছে নিম্নলিখিত প্রহেলিকা ছড়াটি গাইয়া অন্তরঙ্গদের কাছে বলিয়াছিলেন,— মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ

আমিই বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অদ্বৈত আচার্যের প্রেরিত ছড়াটি এই,—

বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অদ্বৈত আচার্যের যোগীসুলভ প্রহেলিকা প্রিয়তার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে,
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।

—বিচিত্র সাহিত্য—প্রথম খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ২৫৫-৫৬

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১৩৬০)—সুকুমার সেন—পৃষ্ঠা ১১১ দ্রষ্টব্য।

এমনিই প্রবল যে তারাও এর সর্বগ্রাসী আলিঙ্গন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারলেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালেন মহামিলনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের নীচে এবং সর্ব জনের সৌভ্রাতৃবন্ধনে পড়লেন বাঁধা। এরই ধারা বহন করে ভারতে সুফীমতবাদ প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। মুইনালদিন বা মইনউদ্দিন চিস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে আগমন করেন।[১] তারই দ্বারা সর্বপ্রথম ভারতে সুফী মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়।[২] ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশেও এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরভারতে এই মতবাদের যে প্লাবন দেখা দিয়েছিল বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ঢেউয়ের মত তারই আঘাত অবশেষে এসে পৌঁছাল বাঙ্গালাদেশে। এখানে সুফীসম্প্রদায়ের মধ্যে সাতটি বিভিন্ন মতবাদের প্রচলন দেখা যায়।[৩] সুফী মতবাদের মূলসূত্র যদিও ইসলামের মধ্যেই রয়েছে তবুও উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিশিষ্ট অনেকের কাছেই এটি ইসলাম মতবাদে হিন্দু দর্শনতত্ত্বের বেদান্তের প্রভাবকে রূপান্তরিত রূপে গ্রহণের ফল বলে অনুভূত হয়।[৪] বাঙ্গালায় পরবর্তী কালের মুসলমান লেখকদের মধ্যে সুফী মতবাদের বহুল প্রচলন দেখা যায়, যার সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত হিসাবে রোসাঙ সাহিত্যের আলাওলের নাম উল্লেখযোগ্য। এর বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে এক এমন ভাবের জোয়ার দেখা দিল যাকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য চৈতন্যের পূর্বে বৈষ্ণব মতবাদ যে অজ্ঞাত ছিল এ ধারণা করা ভুল হবে, তবে শ্রীচৈতন্য যে তাকে এক অপরূপ রূপদান করেন এ সত্য অনস্বীকার্য। বলতে গেলে বহু শতাব্দী থেকে বাঙ্গালাদেশ তাঁর জন্য অপেক্ষা

১। বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯৩৫)—এনামুল হক, পৃষ্ঠা ৪০ দ্রষ্টব্য।

২। This is from Muinuddin Chisti founder of a Sufi brotherhood widely disseminated throughout India.—Encyclopaedia of Islam (Vol. IV) page 681.

৩। Sufism seems to have entered Bengal as an overflow, from Northern India, and as many as seven Sufistic orders are said to exist here.—Obscure Religious cult (1946) by Shashibhusan Dasgupta ; p. 192.

৪। Though the origin of Sufism is usually traced to Islam, to an unprejudiced student it will appear as a Muslim adaptation of the vedanta school of Hindu philosophers.—Dictionary of Islam by Thomas Patrick Hughes ; p. 609.

করেছিল। দামোদর পুরের চতুর্থ লিপি থেকে জানতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় ৪৪৭—৪৮ অব্দে গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের ব্যয় কার্য সম্পাদনের জন্য ভূমিদান করা হয়েছিল।[১] অনেকের বিশ্বাস যে পাহাড়পুরের পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময়ে যে যুগলমূর্তি পাওয়া যায় সেটি রাধাকৃষ্ণের।[২] পাল রাজাদের রাজত্বকালের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় এবং সমসাময়িক যুগের প্রাপ্ত অন্যান্য যে কোন দেবমূর্তির অপেক্ষা তাদের সংখ্যা বেশী।[৩] বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমধর্মের আদি প্রচারক হিসাবে মাধবেন্দ্রপুরীর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যের যে ভাববন্যায় কেবল বাঙ্গালা নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থান প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, তার দিয়ে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যেরা, বিশেষ করে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত।[৪]

১। Epigraphica India vol. xv p/133 and vol. XVII p/193, 345.

২। The Age of Imperial Guptas by Rakhal Das Banerjee P/121.

৩। Throughout the length of rhe dominions of the Palas i. e., throughout the modern provinces of Bengal and Behar and part of the U. P. images of the various forms of Vishnu have been found in very large numbers. In fact they outnumber any other class of images that have been found.—Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture by Rakhaldas Banerjee; P/101.

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে মাধবেন্দ্রপুরীকে আদি প্রচারক বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মাধবেন্দ্রপুরীর নিম্নলিখিত তেরজন শিষ্যের নাম করা হইয়াছে—ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী, বিষ্ণুপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী, অদ্বৈত, রঙ্গপুরী ও রামচন্দ্রপুরী (১।৯।৯—১২, ২।৪।১০৯—১০, ২।৯।২৫৮, ৩।৮।১৯)। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় এই তেরজন ছাড়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে মাধবেন্দ্রর শিষ্য বলা হইয়াছে। উক্ত ১৯ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যর সহিত ঈশ্বরপুরীর গয়ায় বা জয়ানন্দের মতে রাজগীরে, পরমানন্দপুরীর সহিত ঋষভ পর্বতে [মাদুরা জেলায়] (চৈঃ চঃ ।১।১৫২) এবং পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে [সোলাপুর জেলা] শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত [চৈ, চ, ২।৯।২৫৮] দেখা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরী ও পরমানন্দপুরীর ত্রিহুতে জন্ম, অদ্বৈতের শ্রীহট্টে এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চট্টোগ্রামে জন্ম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পরমানন্দ পুরী, পশ্চিম প্রান্তে শ্রীরঙ্গপুরী, পূর্ব প্রান্তে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত এবং উত্তরভারতে ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্র প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যও নিশ্চয়ই বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন।

—শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান (১৯৫৯)—বিমানবিহারী মজুমদার পৃঃ ৫৪০-৪১

শ্রীচৈতন্যের অমরজ্যোতি সেই রিক্ত ক্ষেত্রকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করে তুলল। শ্রীচৈতন্যের দান এমনি সাফল্য লাভ করেছিল এই কারণে যে তিনি ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি প্রচার করেছিলেন ভক্তিধর্ম যা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদকে বিলুপ্ত করে দেয়, জাতি ধর্মের বাধাকে উচ্চ ও বিশিষ্ট করে তোলে না। ভারতে নানা ধর্ম ও জাতির মিলন হয়ে থাকলেও সর্বধর্ম ও জাতিবর্ণের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস ও পন্থা নির্ণয় এই প্রথম বলা যায়। এইখানেই শ্রীচৈতন্যর শ্রেষ্ঠতা। তাঁর সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যার ফলে তিনি কেবল মাত্র বৈষ্ণব নয়, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সকল মতাবলম্বীরই পূজাবেদীতলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এমনকি মুসলমান ভক্তদেরও তিনি সমান ভাবেই কোল দিয়ে এসেছেন। যবন হরিদাসের প্রতি তাঁর প্রীতি অবস্মরণীয় হয়ে আছে।[১] বস্তুতঃ মহাপ্রভু পুরাতন ভাবধারাকে নূতন করে ঢেলে সাজলেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরও পরবর্তী যুগে তাঁর প্রভাব স্থায়ী হয়ে রইল বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের দ্বারা ও ভক্তমণ্ডলীর মাধ্যমে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই প্রভাব উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করল। কেবল হিন্দু নয় মুসলমানদের মধ্যেও তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়। এরই ফলে দেখতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালা সাহিত্যে নব ভাবধারার বহনকারী রোসাঙ্ সাহিত্যের বিখ্যাত কবি দৌলত কাজী ও আলাওলও অনেক বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন।[২] কেবল

১। শ্রীচৈতন্যচরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব। তিনি তীর্থ ভ্রমণকালে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল মন্দিরেই নির্বিচারে স্তুতি নতি করিয়াছেন। মুসলমান ভক্তদেরও তিনি প্রেমের সঙ্গে আশ্রয় দিয়াছেন। যতি ধর্মকে তিনি উল্লঙ্ঘন করিতেন না। তিনি যবন হরিদাসের তিরোধানের পর—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ চৈ, চ, ৩।১১

শুধু তাই নহে, সমুদ্রতীরে তাঁহার সমাধি দিবার সময়ে 'হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্ত গণ' এবং 'হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥,

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১৯৫৯)—বিমানবিহারী-মজুমদার, পৃঃ ৬০৪

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—১৯৬০—সুকুমার সেন, পৃঃ ১০১

এই দুইজনই নয়, অন্যান্য মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদ রচনায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ মর্তুজা, আলি রাজা ও নসীর মামুদের নাম।

এইসকল মুসলমান কবিরা কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি ও পুরাণকাব্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আলাওলের রচনা সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা যেতে পারে। আলাওল ছিলেন সুফী মতাবলম্বী। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী, মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী কাব্য অবলম্বনে লেখা হলেও অনুবাদ বলা যায় না।[১] দৌলতের কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[২] দৌলত ও আলাওল দু'জনের রচনাতেই রামায়ণ মহাভারতের অনেক ঘটনা, এমন কি গোরক্ষনাথ, গোপীচন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখও এতে পাওয়া যায়। আলাওলের পদ্মাবতীতে জটিল তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগক্রিয়া দ্বারা মনঃ সংযোগের উদাহরণ রয়েছে।[৩] রাণী নাগমতীর দুঃখের বর্ণনাকালে তিনি তুলনায় জন্য পলাশ ফুলের উল্লেখ করেছেন। মূল রামায়ণেও 'পুষ্পিতবিবি কিংশুক' ছত্রের মধ্যে প্রস্ফুট পলাশ ফুলের বর্ণাঢ্য সুষমার সঙ্গে তুলনা দেখা যায়।[৪] কাপালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ডম্বরুর উল্লেখও আলাওলের রচনায় পাওয়া যায়।[৫] তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সকল মতবাদের উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বৈষ্ণব মতবাদ, যার প্রতীক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন রচনায়। অন্যান্য মতবাদও যে আত্মরক্ষা করেছিল তার কারণ বাঙালার উদারনৈতিক মতবাদ সকলকেই গ্রহণ করেছিল।

১। Beginning of Secular Romance in Bengali Literature (1959) By Dr. S. N. Ghoshal P/189.

২। Beginning of Secular Romance in Bengali Literature (1959) by Dr. S. N. Ghoshal P/31.

৩। The Yogig process of mental concentration though described by Alaol succintly, is in fair accordance with the highly complicated standard tantric process of Yoga.—The Serpent Power (1924) by Arthur Avalon; P/105-83.

৪। Beginning of Secular Romance in Bengali Literature (1959) by Dr. S. N. Ghoshal P/245-49.

৫। বিচিত্র সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]—সুকুমার সেন; ২৪৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ।।

শতাব্দীর পদধ্বনি যতই সুস্পষ্ট হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মমতের আবর্তনও ততই বিভিন্নরূপে হয়েছে প্রতিভাত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাসের অনুশীলনে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ভারতে ও বাংলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। "উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর—স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব, সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।"[১] এই মহিমময় স্বভাব ত কোন বিশেষ মতবাদ বা নীতি মেনে চলতে পারে না, নানারূপে তাঁর প্রকাশ, রূপকে অতিক্রম করে অরূপের মধ্যে তাঁর বিকাশ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালার বিভিন্ন খ্যাতনামা ধর্মীয় নেতার আবির্ভাবে এই তত্ত্বই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলার ধর্মনীতি কোনদিক পরিবর্তন না করে প্রধানতঃ একমুখেই প্রবাহিত হয়েছিল। বহু ক্ষুদ্র ধর্মীয় মতবাদ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর থেকে তাঁর লোকাতীত প্রভাবে ধর্মের মূলধারা হয় একদেশদর্শী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারায় ভাঙন আসে। যে নবজাগরণ এই যুগ থেকে বঙ্গদেশকে অনুপ্রাণিত করে তোলে তার উৎস ছিল ধর্মচেতনায় নবরূপায়ণ।[২] যাঁরা এই ধর্মচেতনার রশ্মি আকর্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছোটবড় অনেক নেতা থাকলেও মুখ্যতঃ চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ধর্মের যে নবীনরূপ দান করেন তার

১। মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৭।

২। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের অভিমত এই যে,—ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র দেশে যে মহাভাবের প্লাবন জাগিয়াছিল উহার বেগে প্রচণ্ড ও দুর্বার হইলেও উহা বহুধারায় প্রবাহিত নহে। উহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে যে নবজাগৃতি দেখা দিয়াছিল, বাঙ্গালীর জীবনে যে বিচিত্র ও বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার গতি প্রকৃতি স্বতন্ত্র।—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য [২য় সংস্করণ] ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ২

ফলে বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনেও প্লাবন দেখা দেয়। এই চারজনের নাম যথাক্রমে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণ পরমহংস। এঁরা পুরাতন ধর্মসংস্কারকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করেন। এঁদের নেতৃত্ব অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ইতিহাসকে চারভাগে ভাগ করা যায় এবং এঁরাই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগকে পরিচালিত করেন।

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা সমাজকে এমনভাবে বেঁধেছিল যে সেই সূত্রে নানা সংস্কার ও রীতিনীতির ছদ্মবেশে অবিচার ও অত্যাচার সমাজজীবনকে করে তুলেছিল পঙ্কিল। হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিলুপ্ত হতে চলেছিল। ধর্মের আবরণে কতকগুলি গণ্ডীবদ্ধ অনুশাসনই হয়ে উঠেছিল প্রবল। ফলে ধর্ম ও সমাজবর্তী শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদি শান্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই যুদ্ধের শক্তি নিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহন রায় এসেছিলেন। অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল তার অন্তরগত। এই কারণেই গভীর শাস্ত্রবিচারের শক্তিহীন ষোল বছরের কিশোরের রচনা 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী' মূর্তিপূজার বিপক্ষে ব্যক্তিগত যুক্তিতর্কের প্রয়োগ মাত্র। কলকাতায় কর্মক্ষেত্রে অবতরণের আগেও রংপুরে কার্যোপলক্ষ্যে থাকার সময়ে ধর্মসংস্কারে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন এবং তার ফলে প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[১]

রংপুর থেকে যখন তিনি কলকাতায় আসেন [১৮১৪ খৃষ্টাব্দ] যুক্তিতর্কের সঙ্গে শাস্ত্রকেও তিনি করলেন অস্ত্ররূপে ব্যবহার। এরই ফলস্বরূপ পর বৎসর যখন তিনি 'আত্মীয় সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই সভায় বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার যেমন হত, তেমনই সেই সঙ্গে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদনের জন্য বহুবিধ গ্রন্থ ও

১। তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্বে রংপুরে থাকিতেই ধর্মসংস্কার বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে বিষয়কর্ম করিয়া যে কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের সহিত ধর্মালোচনাতে যাপন করিতেন।...এই সকল আন্দোলনের ফলস্বরূপ রংপুরেই তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছিলেন।—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৬০

প্রকাশিত হত।[১] প্রথমতঃ তাঁর আন্দোলন হিন্দুসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীদের বিদ্বেষের পরিমাপ পাওয়া যায় যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন কালে [১৮১৭ খৃষ্টাব্দ] সহরের ভদ্রলোকেরা তাঁর সঙ্গে এক কমিটিতে কাজ করতে সম্মত না হওয়ায় তাঁকে এ কমিটি থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

রামমোহনের মতবাদ ছিল বেদান্তধর্মী। কারণ তিনি নির্ভর করতেন শ্রুতি ও শঙ্করভাষ্যের উপর। শ্রুতি এবং শঙ্করভাষ্য বেদের আদি নয়, বেদের অন্ত। সুতরাং রামমোহনের বেদ প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত। শঙ্কর অদ্বৈতের অনুসরণকারী রামমোহনের সিদ্ধান্ত নিরাকার নির্গুণবাদ এবং বিবর্তবাদ। এই বিবর্তবাদের সূত্রেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে তিনি মায়াবাদে এসে পৌঁছান। তিনি মায়াবাদকে মূর্তি-পূজা ও দেবদেবী পূজার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। যদিও সমাজ বা রাষ্ট্রসংস্কারের সময় এই মায়াবাদকে তিনি অস্বীকার করেছেন। এই অদ্বৈতবাদকে নীতি, তত্ত্ব ও উপাসনার দিক দিয়ে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা যখন আক্রমণ করেন তখন তার বিরুদ্ধে The Brahmanical Magazine—এর চার সংখ্যায় রামমোহন রায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় পঁচিশ বছর পরে, যখন মহাত্মা ডফের অদ্বৈতবাদের আক্রমণের প্রতিবাদে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চার সংখ্যায় The vaidantic doctrines vindicated প্রকাশ করেন।[২]

একেশ্বরবাদ রামমোহনের অণুপরমাণুর মূল সুররূপে হয়েছিল প্রতিধ্বনিত। এই কারণেই যখন তাঁর বন্ধু প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক অ্যাডাম একেশ্বরবাদী সংঘের

১। ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন। বেদান্তদর্শনের অনুবাদ ১৮১৫, বেদান্তসার এবং কেন ও ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬ কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও বাংলাতে, ১৮১৭, সতীদাহ বিচার পুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ, ১৮১৮, সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ, ১৮১৯।—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৬১।

২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, পৃঃ—২০২—২০৩ দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন রামমোহন কিছুদিনের জন্য [১৮২৬ খৃঃ] তার সভ্য হন। অবশেষে তাঁর আদর্শ রূপ গ্রহণ করল ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। এই সময় তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হয়ে এক একেশ্বরবাদী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের নাম হল,—'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম', পরে যে নাম পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সংঘকে সকল সৃষ্টির মূল ব্রহ্মের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং সেই সঙ্গে স্থির হয় যে সকলের জন্য উন্মুক্তদ্বার এই সংঘে প্রচলিত সংস্কার বা রীতি অনুযায়ী বিশেষ দেবতা বা দেবতাদের পূজা করা চলবে না। শুধু তাই নয়, উদারনৈতিক রামমোহন তাঁর দানপত্রে লিখে যান যে এখানে কোন ধর্মের প্রতি কোনরকম অবজ্ঞাপ্রকাশ করা চলবে না।[১]

রামমোহন রায় ধর্মসংস্কারেই যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাই নয়। তাঁর বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে প্রচলিত সমাজ সংস্কৃতিও অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। কারণ তিনি ধর্মসংস্কারের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি। দুটিকেই অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত দেখেছিলেন। ফলে ধর্মজগতে আলোড়নের সঙ্গে এসেছিল সমাজজীবনে আন্দোলন। শতাব্দীর দীর্ঘপথে শ্লথস্রোত সমাজের সংস্কৃতির গতি পলিমাটিতে প্রায় রুদ্ধ হয়েছিল, যার অধিকাংশ অনিবার্য ফল ভোগ করতে হচ্ছিল নারী সমাজকে। যার জন্য নারী সমাজে একদিকে এসেছিল অনাচার, অপরদিকে অবিচার।

১। এই সমাজটিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা সনাতন অজ্ঞেয় অব্যয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। স্থির হয়, কোন মানুষ বা সম্প্রদায় যে বিশেষ নামে অভিষ্ট দেবতা বা দেবতাদিগকে ডাকেন, সেই নামে, সেই বিশেষণে বা সেই উপাধিতে তাঁহাকে এখানে পূজা করা চলিবে না। এই উপাসনা মন্দিরের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। রামমোহন রায় চাহিয়াছিলেন তাহার ব্রাহ্মসমাজ বর্ণ, জাতি, দেশ ও ধর্মনির্বিশেষে সার্বজনীন পূজাবেদীতে পরিণত হউক। তাঁহার দানপত্রে তিনি লিখিয়া যান যে, কোন ধর্মের "নিন্দা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা বা অবহেলাপূর্ণ উল্লেখ আলোচনা চলিবে না।" এই ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হইল "বিশ্বের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা সম্বন্ধে ধ্যান ও চিন্তায় মানুষকে উৎসাহিত করা। সকল ধর্মের, সকল বিশ্বাসের মানুষকে ঔদার্য, দয়া, করুণা ও নৈতিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া মানুষের মিলনের বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা"—রামকৃষ্ণের জীবন (১৯৪৯)—রোমাঁ, রোলাঁ অনুবাদ ঋষি দাস পৃঃ ৭৭

প্রচলিত প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হিন্দুদের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য অর্থাৎ পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত স্মৃতি। কিন্তু গার্হস্থ্যর বাইরেও নারীজাতির একটি স্থান ছিল। বাঙ্গালার লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের আত্মদানে নিঃশেষ হয়ে গেল। একশ্রেণীর নারী বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ে ভৈরবীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। অপরপক্ষে পরকীয়া সাধনার অঙ্গরূপে—বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ে আর একশ্রেণীর নারীর আবির্ভাব হল। এরা গৃহীদের নিকট অশ্রদ্ধার বদলে শ্রদ্ধাই লাভ করেছিলেন। কারণ তারা ছিলেন ধর্মের রঙে রঞ্জিত। বাঙ্গালা দেশে অবলুপ্ত বৌদ্ধধর্ম তার সমস্ত দোষগুণের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিল এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বীরাচারী শাক্ত ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে ধর্মের পক্ষপুটে স্বাধীনতার আস্বাদন নরনারীর সম্পর্ককে লালসার আবরণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। স্মৃতিদ্বারা অনুশাসিত গৃহস্থাশ্রমের বাইরে এই বন্ধনমুক্ত স্বাধীনতা নারীজাতিকে আকৃষ্ট করত। আধ্যাত্মিক অর্থে বৈষ্ণবের 'কান্তভাব' বা শাক্তের 'মাতৃভাব' উচ্চস্তরের হলেও তার অপলাপে এই স্বাধীনতা পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতি সম্পর্কে এক সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সংস্কারে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রামমোহন রায়।

অপরপক্ষে আর এক রীতি দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। প্রাচীন সতীদাহ প্রথাকে অজ্ঞ জনসাধারণ অন্ধভাবে অনুসরণ করায় মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। বহুক্ষেত্রে অনিচ্ছুক সদ্য বিধবাদের দৈহিক বলপ্রয়োগে স্বামীর চিতায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হত। অবশ্য অনেক সময় সম্পত্তির মোহও যে এর পিছনে কাজ করত না তাও নয়। জীবন তুচ্ছ করে এই প্রথার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করলেন রামমোহন। ধর্মের মুখোসে আবৃত এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সহজসাধ্য ছিল না। কারণ তখন সমাজ ছিল ধর্মান্ধ। তবু সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জয়যুক্ত হলেন যখন আইনদ্বারা সতীদাহ নিবারিত হল।[১]

১। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহপ্রথা নিবারণ করে আদেশ দিলেন "It is hereby declared, that, after the promulagation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall

সে সময়ে ধর্মের রঙ মাখা যে কোন প্রথা বা আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এক দুঃসাহসের বিষয় ছিল। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কেবলমাত্র অজ্ঞ জনসাধারণই নয়, শাসক ইংরাজেরাও নিজ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের প্রথাগুলিকে রক্ষা করে চলতেন। বড় মন্দিরগুলির রক্ষকরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বছরে প্রায় তিনলক্ষ টাকা যাত্রীকর উপার্জন কবতেন। শুধু তাই নয়, "যুদ্ধে জয়লাভ করলে কালীঘাট প্রভৃতি বড় বড় মন্দিরে সরকারের পক্ষ থেকে পূজা দেওয়া হত। লর্ড অকল্যাণ্ড এই নিয়ম বন্ধ করেন।"[১]

দিল্লীর সম্রাটের দূতরূপে ইংল্যাণ্ড যাত্রা পর্যন্ত (১৮৩০ খৃঃ) বাঙ্গলা দেশের ধর্মনীতির ইতিহাসে রামমোহনের অনুসৃত শঙ্কর অদ্বৈতবাদই প্রধান। কারণ তিনি ভারতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি, ইউরোপে বৃষ্টলেই রামমোহন রায়ের মহাপ্রয়াণ হয়। সংঘের আচার্য রূপে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮৩০ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত করেন। কিন্তু তিনি কোন নতুন মতবাদ প্রচার করেননি, রামমোহনের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেরই অনুসরণ করে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তৎত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। এর পরবর্তীকালকে এককথায় প্রকাশ করা যেতে পারে,

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

---

be deemed guilty of culpable homiside and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment (Regulation of 4th December, 1829)

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১০৩

১। তীর্থস্থানের বড় বড় মন্দিরের রক্ষকরূপে কোম্পানী তাহাদের আয়ের অংশী ছিলেন। এজন্য পিলগ্রিমস ট্যাক্স বা যাত্রীর কর নামে এক প্রকার শুল্ক আদায় করা হইত। ১৮৪০ সালে দেখা যায় এতদ্বারা বঙ্গদেশে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা উঠিত। একথা এখন অনেকের নিকট উপকথার মত লাগিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ ১৮৪০ পর্যন্ত এই সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্যবোধ করিবেন যে, যুদ্ধাদিতে জয়লাভ হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থের বড় বড় মন্দিরে পূজারীদের দ্বারা পূজা দেওয়া হইত। উক্ত সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর রাজবিধিদ্বারা ঐ সকল নিয়ম রহিত করেন।—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৭০—৭১।

অর্থাৎ একদিকে অস্ত যাচ্ছেন ওষধিপতি চন্দ্র, অন্যদিকে অরুণকে অগ্রগামী করে দেখা দিচ্ছেন দিবাকর। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এই সত্যই প্রকাশ করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে এক নবীন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার আগেও তিনি তাঁর ভাইবোন ও বন্ধুদের নিয়ে এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন [১৮৩৯ খৃঃ], যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা যে সত্যে বিশ্বাস করেন, তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। এর কয়েক বছর পরে তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১] অনতিবিলম্বেই তিনি সংঘের অবিসম্বাদী নেতারূপে পরিগণিত হন। রামমোহন যেমন ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের এক নিবিড় যোগ উপলব্ধি করেন, দেবেন্দ্রনাথের সে মনোভাব ছিল না। ধর্ম সংস্কারই তাঁর প্রধান অবলম্বিত পথ ছিল। রামমোহনের প্রেরণার উৎস বেদান্ত, দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের স্বাধীন ব্যাখ্যা করলেও এই দুইটির প্রকৃতি পৃথক। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিবর্তন আসে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত সংঘ বেদান্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ও বেদের অভ্রান্ততায় ছিল স্থিরবিশ্বাসী। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে এই মতবাদের প্রতিবাদ করে দেবেন্দ্রনাথের কাছে বিচার উপস্থিত করেন। গভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানুশীলনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের মত যুক্তিপূর্ণ বলে গ্রহণ করলেন। ফলে সংঘের নাম 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মে'র পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' হয় এবং বেদের অভ্রান্ততা ও বেদান্তবাদ পরিত্যক্ত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ের উপর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে এই মীমাংসাই করা হয়েছে।[২] তিনি 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' [১৮৫০-৫১ খৃঃ] গ্রন্থে কার্থেজিয়ান-দর্শনের সাহায্যে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন যে

১। এই দীক্ষা গ্রহণ ঘটে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ। দেবেন্দ্রনাথের সংগে অক্ষয়কুমার দত্তও দীক্ষালাভ করেন।

২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, পৃঃ ৬৯,২০০, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৮১, ২৮২ দ্রষ্টব্য ; আত্মজীবনী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬২] পরিশিষ্ট ২৪, পৃঃ ৩২০।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় একান্ত ভেদ আছে। খৃষ্টধর্ম, পৌত্তলিকতা ও বৈদান্তিক মত এই তিনটি বিপদ থেকে—ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করার অভিমত দিয়ে তিনি বলেন যে, 'বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।' সেইসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মধর্মের চারটি মূলনীতি নির্দেশ করে দেন। এই চারটি নীতি যথাক্রমে, (১) আদিতে একমাত্র পরমপুরুষ ছাড়া কেউই ছিল না, তিনিই সৃষ্টি করেন এই বিশ্বের, (২) তিনিই সীমাহীন জ্ঞানের, সত্যের ও শক্তির ভগবান, অদ্বিতীয়, সনাতন, সর্বব্যাপী, (৩) তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও পূজার ফলেই ইহ-পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল, এবং তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর আকাঙ্ক্ষা সাধন করাই হচ্ছে ধর্ম।[১] এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে বেদ, স্মৃতি ও মূর্তিপূজা সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মই শুধুমাত্র বিলুপ্ত হল না, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার ও আলোচনার যে স্থান রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মে' ছিল, সেই স্থানও লোপ পেল।

মহর্ষির নিকট কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সমাজের কাজে তিনি যেমন একজন উৎসাহী কর্মী পেলেন তেমনই অল্পদিনের মধ্যেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। এর পরের ইতিহাস সংঘাতের ইতিহাস বলা যেতে পারে। কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রগতিশীল উদারনৈতিক মতাবলম্বী অর্থাৎ মহর্ষির রক্ষণশীল মতের ঠিক বিপরীত। নবীন ব্রাহ্মদল তাঁর মধ্যে তাদের নেতাকে খুঁজে পেল। এই নবীন সংঘশক্তি তখন প্রাচীন মতবাদকে চূর্ণ করে সংস্কার কাজে এগিয়ে এল। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে তাদের সহযোগিতা করলেও শেষ পর্যন্ত সমান তালে চলতে পারলেন না। এতদিন উপাচার্য পদে উপবীতত্যাগীদের স্থান ছিল না। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে নবীনশক্তির আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিয়োগে অগ্রসর হলেও সেই নবীনশক্তি যখন অসবর্ণ বিবাহস্থাপনে অগ্রসর হলেন এবং কেশবচন্দ্র নিউ টেষ্টামেণ্টের উপর ভিত্তি করে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন, তখন রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে নবীনদলের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ নবীন ও প্রবীন-দলের মধ্যে বিচ্ছেদ হল সংঘটিত। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল। প্রথম ব্রাহ্ম সমাজ মহর্ষির নেতৃত্বে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হল। নবীনদল কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে'র পত্তন করল (১৮৬৬ খৃঃ)

১। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমা রোলাঁ, অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য

দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী ব্রাহ্মপ্রচারকদের সংস্কার কাজে নিরপেক্ষ যুক্তির স্থানই বেশী। যে অসবর্ণ বিবাহের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয় সেই আন্দোলনে কেশবচন্দ্র জয়যুক্ত হলেন অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়ায় [১৮৭২ খৃঃ]। ব্রহ্মানন্দের উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 'ভাবীধর্ম' সম্পর্কিত বক্তৃতায় সর্বধর্মসমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, যার মধ্যে সকল ধর্মই বিশেষত্ব বজায় রেখে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বানে সম্মিলিত হবে।[১]

ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু কেশবচন্দ্রের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব স্থায়ী হতে পারল না। অধিকতর প্রগতিশীল 'সমদর্শী' দল যখন ব্রাহ্মসমাজের কর্মপদ্ধতিতে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠনের জন্য উৎসুক হন তখন [১৮৭৭ খৃঃ] ব্রহ্মানন্দ তাঁদের সহযোগিতাই করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই একটি ঘটনার ফলে সমাজের ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করল। এক নির্ধারিত বয়সের আগে কন্যার বিবাহদান ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। কুচবিহারের নাবালক রাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ সংঘটিত হওয়ায় [মার্চ ১৮৭৮ খৃঃ] ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিল এক তীব্র মতভেদ। কেশবচন্দ্রের শিষ্যেরাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে ব্রাহ্মসমাজের মূলনীতিগুলির মর্যাদা তিনি রক্ষা করেন নি। ব্রহ্মানন্দকে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদ থেকে অপসারিত করার চেষ্টাও হল, যদিও সে প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ আবার ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বিবাহের প্রতিবাদকারীদল' স্ত্রী স্বাধীনতার ও নিয়মতন্ত্রের দল সম্মিলিত ভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'[২] নামে পৃথক সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। কিছুদিন পরেই কেশবচন্দ্র নিজের বিভাগের ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ করলেন 'নববিধান' এবং সেইসঙ্গে নূতন আইন, লক্ষণ, প্রণালী,

---

১। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'ভাবীধর্ম' (Future Church) সম্পর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সকল ধর্মের একটি বিপুল সমন্বয় কল্পনা করেন। এই সমন্বয়ের মধ্যে সকল ধর্ম তাহার স্ব স্ব পার্থক্য, সংগীত যন্ত্রের স্বতন্ত্র সুর ও ধ্বনি বজায় রাখিয়া পিতা ভগবান ও ভ্রাতা মানবের বিশ্বব্যাপী জয়গানে একত্রিত হইবে।—রামকৃষ্ণের জীবন-রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক—ঋষি দাস—পৃঃ ১৩৫।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৪৭-৪৮, ২৭৫ এবং রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ৯৮ দ্রষ্টব্য।

সাধন প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করলেন। সুতরাং দেখতে পাওয়া যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশের হিন্দুধর্ম যেখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দেখা দিল তিনটি সম্প্রদায়,—বৈষ্ণব, শাক্ত ও ব্রাহ্ম। এই ব্রাহ্মসমাজও আবার তিনভাগে হল বিভক্ত,—আদি, নব বিধান, ও সাধারণ।

ধর্মসংস্কারসূত্রে আর একজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, যিনি কোন ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত না করলেও সমাজসংস্কার সূত্রে এক প্রবল আলোড়ন এনেছিলেন বাঙ্গালার ধর্মজগতে। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর ধর্মজগতে আলোড়ন আনয়নের উপাদান 'বিধবা বিবাহ'। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যরা বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর পত্রিকায় বিধবা বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে বিতর্ক আনেন [১৮৪২ খৃঃ]।[১] অবশ্য এর পিছনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন কিনা সে প্রশ্ন চিরকাল জিজ্ঞাস্যই রয়ে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা দেশের নারী জাতি যে অজস্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা দুর্ভোগ সহ্য করেছিল সে বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অসম বয়সে বিবাহের ফলে অনেক সময় অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় সমসাময়িক যুগে নারী জাতিকে ব্রহ্মচর্যের কঠোর ব্রত ও অন্যান্য সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীজাতির এই নির্যাতন সহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু ধর্মের মুখোসে এই সকল প্রথা তখন এমন সুদূরে মূল প্রসারিত করেছিল যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল। বাহ্যতঃ নারীজাতিকে এমন এক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল যে দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা কল্পনাতীত ছিল।[২] শাস্ত্রের বচন নিয়েই বিদ্যাসাগর এই ধর্মীয় প্রথার সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন। প্রমাণ প্রয়োগরূপে 'পরাশর' থেকে তিনি উল্লেখ করলেন,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে। [৪।৩০]

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

২। এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—"In India the sanctity and sweetness of family life have been

অবশ্য 'নারদ' [স্ত্রী পুং সপ্রকরণ ৫।৯৭] এবং অগ্নি পুরাণেও [১৫৪।৫] এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা এর কদর্থ করে বললেন যে, যে পাত্রের সংগে বিবাহ স্থির হয়েছে কিন্তু সম্পন্ন হয়নি, সেই পাত্র যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়, মৃত্যু ঘটে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, ক্লীব অথবা পতিত হয়, তবে এই পাঁচস্থলে কন্যাকে অন্য পাত্রে দান বিহিত। যাই হোক না কেন, সকল বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধক অবশেষে জয় করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনসম্মত বিধানরূপে ঘোষিত হল।[২] বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে যাঁরা বিধবাবিবাহের সমর্থনে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।[৩]

আর একজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় নেতাদের তালিকা মোটামুটী সম্পূর্ণ হয়। বাংলা দেশে ইতিপূর্বে বা পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি ধর্মজগতে এমন আলোড়ন আনতে পারেন নি। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও যাঁর বাণী শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আকর্ষণ

raised to the rank of a great culture. Wifehood is a religion, motherhood a dream of perfection...The woman of the East is already embraced on a course of self transformation which can only end by endowing her with a full measure of civic and intellectual personality. It is too much to hope that as she has been content to quaff from our wells in this matter of the extension of personal scope, so we might be glad to refresh ourselves at hers and gained therefrom a renewed sense of sanctity of the family, and particularly of the inviobility of marriage"—The present position of women (a paper communicated to the First Universal Races Congress in 1911) by Sister Nivedita

১। History of Dharmashastra (1941)—Vol II, Part I by P. V. Kane ; Chapter XIV, P. 611 এবং অগ্নিপুরাণম্ [১৩১৪] পঞ্চাননতর্করত্ন সম্পাদিত, পৃঃ ৩১২ দ্রষ্টব্য।

২। হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই।

৩। যাঁহারা বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নামও আছে। —স্বামী-বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃঃ—২৫১

করে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে তথাকথিত শিক্ষিত তিনি ছিলেন না। তথাপি বহু শিক্ষিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে মাথা নত করে ছিলেন। তাঁর প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রাধান্য খর্ব হয়ে পড়েছিল। রামমোহন প্রভৃতি ধর্মীয় নেতাদের মত কোন ধর্মসংস্কারে তিনি ব্রতী হননি, অথবা আপন মতপ্রচারে মুখর হয়ে ওঠেননি। তাঁর বাণী তাঁর 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে কেবল ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং রামকৃষ্ণের আলোচনা করতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের কথা অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে পড়ে। শুধু তাই নয়। বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতির আলোচনাতেই রামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। যতদূর জানা যায় গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে[১] রামকৃষ্ণ নাম দেন তাঁর গুরু তোতাপুরী।[২]

রাণী রাসমণির মন্দিরের পূজারী নীরব সাধক সকলের দৃষ্টির অগোচরেই ছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর [১৮৭৫ খৃঃ] কেশবচন্দ্রের রচনার মাধ্যমেই তিনি জনসমক্ষে প্রথমে পরিচিত হন। কেশবচন্দ্র দুইজনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এক, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও দ্বিতীয় এ্যাংলিকান সন্ন্যাসী লিউক রিভিংটন, যিনি পরে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ব্রহ্মানন্দের উপর পরমহংসের প্রভাবের ফলে এমন রটনাও ঘটে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করবেন। কেবলমাত্র কেশবচন্দ্রই নয়, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক বিপর্যয় দেখা যায় রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে। উগ্র ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁরই প্রভাবে অমূর্তিপূজারী ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করে ঢাকার গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে বৈষ্ণবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। "মূর্তিপূজক রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের

১। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর আবির্ভাব এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিরোধান ঘটে। কামারপুকুর গ্রামে খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁর জন্ম। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ [অনুবাদক ঋষিদাস] দ্রষ্টব্য।

২। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি সময়ে তোতাপুরী প্রস্থান করেন। আজ খুদিরামের পুত্র যে রামকৃষ্ণ নামে সুবিখ্যাত হইয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ তোতাপুরীই সন্ন্যাস গ্রহণকালে তাহাকে দিয়াছিলেন।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদ ঋষি দাস, পৃঃ ৪২ টিকা ১ এবং সাধকভাব—স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ২৮৫ টিকা ১ দ্রষ্টব্য।

ধর্মজীবন পৌরাণিকযুগের অবতারবাদের পুনরভ্যুত্থান। সংস্কারযুগের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।[১] অক্লান্ত কর্মী নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন ও বিশ্বের দরবারে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে।

চিকাগোর ধর্মসম্মেলনে [১৮৯৩ খৃঃ] স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিভূরূপে হিন্দুধর্মকে অবিনশ্বর ও অবিস্মরণীয়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজীর বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগীন' পত্রিকায় [১৯০৯ খৃঃ] লিখেছিলেন "বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা এই সর্ব প্রথম সুস্পষ্ট সূচিত হয় যে, ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জাগে নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও ভারতকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।" স্বামী বিবেকানন্দও সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন **"I go forth to preach a religion of which Buddhimsm is nothing but a rebel child, and cristianity, only distant Echo."**

যে রামকৃষ্ণও মতবাদকে স্বামীজী প্রথমে পাশ্চাত্যে ও পরে ভারতে প্রচার করেছিলেন তাতে মুখ্যস্থান গ্রহণ করেছিল বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ। অর্থাৎ রাজা রামমোহনের মতবাদের সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। নৈনিতালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে রাজা রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেও তিনি বলেছিলেন যে তিনটি বিষয়ে তিনি রামমোহনকে অনুসরণ করেছেন। এই তিনটি যথাক্রমে রামমোহনের বেদান্তবাদ, স্বদেশপ্রীতি এবং স্বদেশ প্রেমের হিন্দু মুসলমানকে সমানভাবে আলিংগনকারী উদারতা।[২] অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং শেষে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই প্রধান। মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের কালে তার সাময়িক অবলুপ্তিমাত্র ঘটেছিল।

১। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃঃ ১৬৭।

২। It was here too that we heard a long talk on Rammohon Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love of country that embrased the Musulman equally with the Hindu. In all these things, he (Swamiji) claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan had mapped out—Notes on some wanderings, by Sister Nivedita ; P. 9.

পাশ্চাত্যের অনুশীলনে স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে সংহত শক্তি ব্যতীত কোন বড়কাজ সম্ভব নয়। সেই কারণে তাঁর আহ্বানে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে সকল গৃহী ও আশ্রমিক শিষ্যেরা একত্রিত হলেন [১৮৯৭ খৃ:, ১লা মে]। সর্বসম্মতিক্রমে স্বামীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল এবং ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী ও আইনকানুনের বিশদ আলোচনার পর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হল :

১। এ সঙ্ঘ রামকৃষ্ণ মিশন নামে পরিচিত হবে।

২। এর উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণ দেব মানবজাতির জন্য যে সকল সত্য প্রচার ও নিজের জীবনে অনুষ্ঠান করেছিলেন, তা প্রচার করা এবং সর্বসাধারণের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য ঐ সকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে সকলকে সাহায্য করা।

৩। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ জনসাধারণের সেবা ও আত্মিক কল্যাণসাধন। রাজনীতির সঙ্গে এ সংঘের কোন সম্বন্ধ নেই।[১]

পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বেলুড় মিশনের পত্তন হল স্বামীজীর বিদেশী শিষ্যা মিস মূলার ও মিসেস ওলিবুলের অর্থানুকূল্যে। মিস মূলার, মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড ও মিস মার্গারেট নোবল, যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে বিখ্যাত হন, এখানে বাস করে রামকৃষ্ণ কৃষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। বিদেশী শিষ্যার আত্মোৎসর্গের এই ইতিহাস অভূতপূর্ব।

সকল দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় যত ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়েছিল এমন আর পূর্বে এবং সম্ভবতঃ পরেও দেখা যায় নি। ধর্মের এত বহুমুখী চিন্তাধারা ও বিচিত্র দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মতবাদের প্রকাশও ইতিপূর্বে অদৃষ্টপূর্ব ছিল।

১। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ।—১ম সংস্করণ।—পৃঃ ২২৭-২৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়

[রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ]

তুষারমৌলির গহনকন্দর থেকে নির্ঝর যখন উৎসারিত হয় তখন তার গতি থাকে স্বচ্ছন্দ, মুক্ত, অবাধ; সকল বাধা অতিক্রম করে তখন সে আপনার প্রাণবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু সমতলভূমিতে নেমে সেই উদ্দাম গতি হয়ে পড়ে শ্লথ, পলিমাটির আবর্জনা তার পূর্বের প্রাণচাঞ্চল্যকে করে ব্যাহত। সেই দ্বিধাগ্রস্ত কম্পিত স্রোতধারায় যখন বন্যার দুর্বার বেগ জেগে ওঠে তখন সেই বেগের মুখে সকল বাধা, মালিন্য ও আবর্জনা ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়। পৃথিবীতে ধর্মের ইতিহাসও এই একই রূপ গ্রহণ করে চলেছে। যখনই কোন ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, তখনই সকল বাধাবিপত্তি হয়েছে অপসৃত। এই কারণেই প্রাথমিক কালে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, ইসলাম ইত্যাদির প্রতিকূল সকল শক্তিই পরাভূত হয়েছে। সমতলভূমিতে ক্লান্তগতি নদীস্রোতের মত কালক্রমে সকল ধর্মের গতিই মন্দীভূত হয়ে পড়েছে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে। বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ আপন মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রতি ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট-ক্যাথলিক; ইসলামের মধ্যে শিয়া, সুন্নী; বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান, হীনযান; হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি।

'সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধি বিচারহীন অন্ধ সংস্কারের প্রবর্তন হয় মানুষের জীবনে আর কোন বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।'[১] কিন্তু সেই মন্দীভূত ধর্মস্রোতে যখন কোন প্রকৃত ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয় তখন তার প্রতিভা ও জ্ঞানের আলোকের বন্যায় সকল আবর্জনা দূর হয়ে ধর্ম এক সংহত গতিতে নিজের পথে বয়ে চলে।

ভারতের ধর্মের ইতিহাস এইতত্ত্বেরই পুনরাবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, ভারতের ধর্মীয় স্রোতধারা মূলতঃ একই পথে প্রবাহিত

১। মানুষের ধর্ম [১৯৪৬]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৪২-৪৩

হয়েছে। এই ধারা হিন্দুধর্মের ধারা। নদী থেকে যেমন বহু শাখা নদী বার হয় কিন্তু মূল নদীস্রোতের তার ফলে কোন বিশেষ পরিবর্তন আসে না, তেমনই ইসলাম, খৃষ্ট, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম ভারতের বুকে শাখানদীরূপে প্রবাহিত হয়েছে সত্য, তবুও তার ফলে হিন্দুধর্মের ধারা দিক পরিবর্তন করেনি। যার ফলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণই হিন্দুধর্মীয়। যে বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণের কাছে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত তার মধ্যে কালস্রোতে সৃষ্টি হল নানা সম্প্রদায়ের। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে এক বন্যায় সাময়িকভাবে সম্প্রদায়গত আবর্জনা দূর হয়েছিল, এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে।[১] এর পরে কয়েক শতাব্দী ধর্মের গতি আবার শ্লথপদে চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাবে পুনরায় ভারতের ও বিশেষরূপে বাঙ্গালার ধর্মীয় স্রোতধারায় এক বিপুল বন্যার আবির্ভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় যেমন অসংখ্য ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল, অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তেমন ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম আন্দোলনের বিষয় আলোচনাকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ভারতে হিন্দু ধর্ম প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত,— বিষ্ণু, শক্তি, শিব, সূর্য ও গণেশের উপাসক বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য।[২] বাঙ্গলায় কিছু পরিমাণে শৈব ও মুখ্যতঃ বৈষ্ণব ও শাক্তেরই প্রাধান্য। এরাও আবার নানাভাগে বিভক্ত। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য এই চারটিই বৈষ্ণবদের প্রধান সম্প্রদায়। এগুলির প্রত্যেকটিরই আবার অনেকগুলি করে শাখা সম্প্রদায় আছে, যাদের সঙ্গে মূল সম্প্রদায়ের বহুবিভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলিকে মূল সম্প্রদায় হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। বাংলার ন্যাড়া, বাউল

১। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গলার অবস্থা] দ্রষ্টব্য।

২। ইদানীং এ দেশে পাঁচপ্রকার উপাসক সর্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য। বিষ্ণু পূজকেরা বৈষ্ণব, শক্তি সেবকেরা শাক্ত, শিবার্চকেরা শৈব, সূর্যোপাসকেরা সৌর ও গণেশোপাসকেরা গাণপত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [১ম ভাগ, ১৩১৮] অক্ষয়কুমার দত্ত—পৃঃ ১১৩

প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।[১] স্পষ্টদায়ক, কর্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনী, সহজী, খুশী—বিশ্বাসী, গৌরবাদী, বলরামী, রাধাবল্লভী ও সখীভাবক বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা বা ভাগ।[২]

শাক্তেরা শক্তি অর্থাৎ কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন শিবশক্তির উপাসক। পশ্বাচারী ও বীরাচারী এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে শাক্তেরা বিভক্ত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে পশ্বাচারে নিষিদ্ধ মদমাংসের ব্যবহার বীরাচারে প্রচলিত আছে। তবে দুইটি আচারেই পশুবলির বিধান রয়েছে।[৩] কুলার্ণব পঞ্চম খণ্ড অনুসারে এই দুইটি আচারকে সাতটি বিভিন্ন আচারে ভাগ করা হয়েছে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। তবে সাধারণতঃ বামাচারী ও দক্ষিণাচারী ও শাক্ত সম্প্রদায়ই

১। বৈষ্ণবদের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে;—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য এবং নিম্বাদিত্য। অপরাপর সমুদায় সম্প্রদায় ঐ চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপ। ঐ সমস্ত প্রধান অর্থাৎ মূল সম্প্রদায়ের সহিত এক একটি শাখা সম্প্রদায়ের অতিমাত্র বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা-দেশীয় ন্যাড়া, বাউল প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৈষ্ণবেরাই আপনাদিগকে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, কিন্তু উহাদের সহিত মূল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে এরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, উহারা মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয় না।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [১ম ভাগ, ১৩১৮] অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ২৫৪।

২। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [১ম ভাগ, ১৩১৮] অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ২০৩-৪৭ দ্রষ্টব্য।

৩। শক্তি অর্থাৎ কালী, তারা প্রভৃতি শিবশক্তিই শাক্ত সম্প্রদায়ের উপাস্য। কিন্তু সকলেরই ইষ্টদেবতা এক নয়। গুরু শিষ্য প্রণালীক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইষ্টদেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হন। কেহ কালী, কেহ বা তারা, কেহ বা জগদ্ধাত্রীর, কেহ বা অন্য দেবতার থাকেন [পৃঃ ১৫৫]... শক্তি উপাসকেরা পশুভাব ও বীরভাব ক্রমে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, পশ্বাচারী ও বীরাচারী। পশুভাব ও পশ্বাচারের সহিত বীরভাব বা বীরাচারের বিশেষ এই যে, বীরভাব বা বীরাচারে মদ্যমাংসের ব্যবহার আছে। পশুভাব ও পশ্বাচারে তাহা নিষিদ্ধ [পৃঃ ১৬০]...কিন্তু উভয় আচারেই পশুবলির বিধান আছে। [পৃঃ ১৬৩]—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [২য় ভাগ, ১৩১৪] অক্ষয়কুমার দত্ত।

দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে মুখ্যতঃই এই দুই শাক্ত সম্প্রদায়ের আবাসস্থল।[১]

শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায় ছাড়াও আরও বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙ্গলায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার প্রবর্তিত কিশোর ভজনী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রবর্তিত রাতাভখারী, ব্রহ্মোপাসক নরেশপন্থী, কেউরদাস, হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় সাধনে ফকীর সম্প্রদায় ইত্যাদি।[২] প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শন রয়েছে। কিন্তু এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ও বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। ম্যাক্সমুলারের মতে,—সকল দর্শনকেই শব্দের পুরাতন ও নতুন অর্থের দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করা যায়।[৩] দর্শনতত্ত্বের এই দ্বন্দ্বের ফলেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কারণ হ্যামিলটনের মতানুযায়ী,—'জ্ঞানময় অজ্ঞতাতেই দর্শনের সমাপ্তি ও ধর্মের

১। কুলার্ণবে এই দুই প্রকারের আচারকে বিভক্ত করিয়া সাত প্রকার আচার নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারের পর আর নাই [পৃঃ ১৬০-৬১]...যদিও তন্ত্রে উল্লিখিত সাতপ্রকার আচারের লক্ষণ ও ব্যবস্থা নিরূপিত আছে, কিন্তু শাক্তদিগের সচরাচর দুইটিমাত্র সম্প্রদায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় দক্ষিণাচারী ও বামাচারী, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে বেদাচারের নিয়মক্রমে ভগবতীর অর্চনা করেন ও বামাচারীদের অনুষ্ঠেয় মদ্যব্যবহার ও শক্তিসাধনাদি না করেন, তাঁহাদের নাম দক্ষিণাচারী। তাঁহারা সুরাপান করেন না বটে, কিন্তু ইতিপূর্বে পশ্বাচারের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে ইচ্ছাক্রমে অল্প বা বহুসংখ্যক বলিদান করিয়া থাকেন [পৃঃ ১৬৫]...ফলতঃ বঙ্গভূমি বামাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় প্রকার শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান [পৃঃ ১৭৯]—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [২য় ভাগ, ১৩১৪] অক্ষয়কুমার দত্ত।

২। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [২য় ভাগ ১৩১৪] অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২০২-০৩ দ্রষ্টব্য।

৩। All philosophy can be called a war between the old and the new meanings of words.—Das Denken im Lichte der sprache, Leipzing 1888 p. 557 & The Religion of the world vol II by the Ramkrishna Mission Institute of Culture (1938) p. 631.

সূত্রপাত।[১] এই সকল ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়েছে, সাম্প্রদায়িকতা হয়ে উঠেছে মুখ্য, যেহেতু সাধারণতঃই অনুগামীদের পক্ষে মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে।[২]

এইভাবে সম্প্রদায়ের বেড়াজালে দেশ যখন মুমূর্ষু হয়ে নাভিশ্বাস ফেলছে তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অন্ধ সংস্কারের বাঁধন অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়ে গেল বিভিন্ন ধর্মসংস্কারকের বিশিষ্ট দানের ফলে। এই সময় পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আরও এক নূতন আবেগ জাগল। এই আবেগের সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধলোকে প্রদীপ্ত সংস্কারমুক্তির তুলনা করা যেতে পারে। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন থেকে এর সূত্রপাত। তারই সূত্র অনুসরণ করে আর্য সমাজ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি, বৈদিক হিন্দুধর্মের সংস্কার ও এমন কি ওহাবি আন্দোলনেরও পত্তন হয়।[৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেবলমাত্র ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমকালীন ইতিহাসেই নানা আন্দোলনের আভাষ দেখতে পাওয়া যায়। এই আন্দোলনই এ যুগের বিশেষত্ব। ধর্মীয় আন্দোলন ও ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি নানা

১। A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of Religion—

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত [১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬]—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ১২৮।

২। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'জগতে যে সকল মহাপুরুষ ধর্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা নিতে পারি নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়ত আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।...মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না, কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিষটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা করিয়া লইবার জো নাই।—চারিত্রপূজা—রবীন্দ্র-রচনাবলী [পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত]—১১শ খণ্ড পঃ ৩৭৩-৭৪।

৩। The eighteenth century is similarly marked by the impact with the Western thoughts which led to the religious reforms of the nineteenth century. It brought back the rationalism of the fifth century B. C. and Raja Rammohun Roy

রাজনৈতিক আন্দোলনও একই সঙ্গে সংঘটিত হয়।[১] ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে রাজা রামমোহন রায় এদেশে এইযুগের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ডাঃ ফরকুহর দাবী করেন যে হিন্দু, মুসলমান বা পার্সী যে কোন ধর্মেরই সংস্কারগত আন্দোলনের মূলে খৃষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।[২] অপর পক্ষে জওহরলাল নেহেরুর মতে ইংরাজী শিক্ষা ভারতের দিগন্তকে বিস্তৃত করে তোলে। যার ফলে ভারতের জীবনধারা ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং রাজনৈতিক দাবী বর্ধিত হতে থাকে।[৩] অবশ্য খৃষ্টধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে নানা বিতর্কের ও মতদ্বৈধের কারণ আছে। কারণ এর পরে ধর্মসংস্কারকদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে মূলতঃ সকলেই বৈদিকধর্মকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন, খৃষ্টধর্মকে নয়।

'দর্শন' শব্দের অর্থ—যাহা অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা যায় বা দৃষ্ট হয়। সাধারণের কাছে ঈশ্বর পার্থিব লব্ধ বস্তু নয়। দর্শনের অর্থাৎ অন্তরের উপলব্ধির ফলেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং 'লভ্য'কে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করা

was its great exponent. The new spirit led to the foundation of the Brahma Samaj (including Prarthana Samaj), the Arya Samaj and the Theosophical Society on the one hand and all round reform in the orthodox Hindu religion and Society on the other. The spirit of reform also inspired the Muslim community. It led to the Wahhabi movement, early in the nineteenth century, which originally aimed at internal reform, but was gradually deflected into a political move against the British.—The Cultural Heritage of India (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 62.

১। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য (১৩৬৫) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—পৃঃ ৬—৮ এবং The Cultural Heritage of India (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 613-14. দ্রষ্টব্য।

২। Modern Religious Movements in India (1943) by J. N. Farquhar—p. 433 & The Cultural Heritage of India (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p, 569 দ্রষ্টব্য।

৩। English education brought widening of Indian horizon, an administration for English literature and institutions, a revolt against some customs and aspects of Indian life and a growing demand for political life.—The Discovery of India (Second Edition, 1946) by Jawaharlal Neheru—p. 337.

যায়। একই প্রাঙ্গনের তেত্রিশ কোটি প্রাচীরের খণ্ড ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও এই অন্তর্দৃষ্টির ফলে রামমোহন প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধি করেছিলেন। বিস্তীর্ণ ভ্রমণ তাঁর সেই উপলব্ধিকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। এই কারণেই নবযুগের উদ্গাতা রামমোহন তাঁর তুহাফ-তুল-মুহায়দিনে ব্যক্ত করেছেন যে, পৃথিবীর বহু দূরতম পার্বত্য ও সমতল প্রদেশে ভ্রমণ করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংযোগের ফলে ঈশ্বরের একেশ্বরবাদে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে দৃঢ়। সেই একেশ্বর সকলের পক্ষেই সমান, কারণ তিনিই সকল সৃষ্টির মূল। সুতরাং নিষেধ ও বিধিসম্বন্ধীয় অনুশাসন এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন।[১]

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মবাদীদের সংস্থা। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিশেষণ এই 'ব্রাহ্ম'। বেদান্তের মতে ব্যক্তিহীন ঈশ্বর অথবা রামানুজপন্থীদের মতে ব্যক্তিগত ভগবান, উভয় অর্থেই 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ভারতের অতীত ঐতিহ্যের উপরেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।[২] রাজা রামমোহন রায় নিজেও তাঁর আত্মজীবনীতে

১। Very characteristically Rammohun inaugurates the new century with those significant lines in his Tufat-tul Muwahhidin.

'I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands and found the inhabitants thereof agreeing generally in the personality of one Being, who is the source of all that exists and its governer, and disagreeing in giving peculiar attributes to that Being and in holding different creeds consisting of the doctrines of religion and precepts of haram (forbidden) and halal (lawful). From this induction it has been known to me that turning generally towards one eternal Being is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind itself." The Cultural Heritage of India (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya-p. 615-16.

২। The name 'Brahma Samaj' is a Bengali phrase which translated 'Society of Brahmas', Brahma being an adjective ormed from Brahman, a neuter substantive used in Hindu philosophical language for 'God' whether conceived as the impersonal Divine Being of the stricter Vedanta or the personal God of Ramanuja's system. Samaj usually means a

বলেছেন,—'আমার সমস্ত বিতর্ককালে আমি যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীত নয়, ভিন্ন পথমাত্র এবং আমি কেবলমাত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতা তাদের পূর্বপুরুষদের কার্যাবলীর, প্রাচীন পুঁথির মতবাদের এবং যে সকল প্রামাণ্যকে তারা শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করেন বলে প্রচার করেন, সেগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত।'[১] রামমোহনের সংগ্রামকে যুক্তি-হীনতার বিরুদ্ধে যুক্তির সংগ্রাম এবং হিন্দুত্ব হতে স্বীয় দর্শনানুযায়ী হিন্দু ঈশ্বরবাদ ও ক্রমে বিবাদহীন একেশ্বর খৃষ্টধর্মের নীতির অনুগমন বলা যায়।[২] ম্যাকসমূলার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে হিন্দুরা প্রথমে একেশ্বরবাদীই ছিলেন, পরে নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। পিকৃতেও একই মত প্রকাশ করে বলেন যে আর্যদের আদিম ধর্ম ছিল কেবলমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা, পরে বহু দেবদেবীর উৎপত্তি হয়। থিওডোর গোল্ড্‌ষ্টুকার অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করে এই সকল মতবাদের প্রতিবাদ করেন।[৩] প্রকৃত কথা এই যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজনীয় সারতত্ত্বের সংগ্রহ করে নিরাকার ঈশ্বরের যে অরূপ রূপদান করেন, বৈদেশিক একেশ্বরবাদের সঙ্গে তার বহুলাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। ম্যাকসমূলারের মতে জনসাধারণ দর্শন ও ধর্মকে ভিন্ন গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু রামমোহনের

Society that is an organism rather than a mere association. The name shows that movement has close connexions with the religious past of India.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II, 1953) edited by James Hastings-p. 813.

১। The ground which I took in all my controversies, was not that of opposition to Brahminism, but to a perversion to it, and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of their ancient books and anthorities which they profess to revere and obey.—Raja Rammohan Roy (1911) by R. N. Samaddar-Appendix D. Autobiography p. 201.

২। Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol II, 1953) edited by James Hastins-p. 344 দ্রষ্টব্য।

৩। Ancient Sanscrit Literature (1859) by Max Muller-p. 559-68 ; R.A.S Journal, New Series, Vol I, Part II p. 353-88 ; Panini, His place in Sanscrit literature by Theodor Goldstucker ; (1861)-p. 144 ; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [১ম ভাগ, ১৩১৮]—অক্ষয়কুমার দত্ত পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য।

প্রতিভা উভয়ের সমন্বয় সাধন করার ফলে বৈদিক ধর্ম বৈদান্তিক দর্শনে মুক্তিলাভ করল যা উদার বৈদান্তিক দর্শন জ্ঞান ও ভক্তিরূপী ভিন্নমুখী হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের যুক্ত লীলাস্থলরূপে পরিণত হতে পারে।[১] রামমোহন রায়ের মত এই ছিল যে সকল ধর্মেরই বিশ্লেষণ করলে যে মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় তারই উপর প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। সুতরাং কেবলমাত্র বেদান্ত বা খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদকে লীন করে দিলে ভুল হবে। নিরাকার ব্রহ্ম এবং যুক্তির উপর অর্থাৎ বেদান্তের অব্যয়ের সঙ্গে আঠারো শতকের বিশ্বকৌশিক চিন্তার উপর তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।[২]

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে রামমোহন ছিলেন শাঙ্কর—অদ্বৈতের মতানুবর্তী ও সেই সূত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল নিরাকার নিগুর্ণবাদ ও বিবর্তবাদ এবং এই বিবর্তবাদসূত্রে তিনি মায়াবাদে এসে পৌছান।[৩] শঙ্কর প্রাত্যাহিক জীবনে ছিলেন বৈষ্ণব। সুতরাং বেদান্তসূত্রে তাঁর মতবাদ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর মতবাদে ভক্তিরসের প্রাবল্য পাওয়া যায়। এই বিশেষত্ব পরবর্তী যুগে কবীর, তুলসীদাস, চৈতন্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে দৃষ্ট হয়। বেদান্তের সর্বাধুনিক প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিবেকানন্দের মধ্যে ভক্তি-মার্গের সঙ্গে প্রাচীন উপনিষদের ভাষ্যেরও মিলন সাধিত হয়।[৪] এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে শাঙ্কর অদ্বৈতে মায়ার কোন প্রকার সূত্র দেওয়া নেই। শঙ্কর কেবল-মাত্র বলেছেন যে, মায়াকে ধ্বংস করাই অদ্বৈতদর্শনের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে আপেক্ষিক

১। We keep religion and philosophy in different compartments, which with men such as Rammohan Roy, the two were one and the religion of the Veda led naturally to the philosophy of the Vedanta, which becomes in turn the firm foundation of their religion. The Vedanta philosophy was so broad that it could well have served as a common ground for religions so different as Hinduism and Christianity undoubtedly are both in the form of Gnana (knowledge) and Bhakti (devotion).—Rammohan to Ramkrishna (1952) —by F. Max Muller.-p. 59-60.

২। রামকৃষ্ণের জীবন [১৯৪৯] রোমাঁ রোলাঁ-অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য।

৩। তৃতীয় পরিচ্ছেদ [ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ] দ্রষ্টব্য।

৪। Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol XII) edited by James Hastings-p. 312 দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদী রামানুজেরম তে ব্যক্তিগত আত্মার উৎবর্তনের কাজে মায়াকে কোনপ্রকারে ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।[১] রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈত মতানুবলম্বন সম্বন্ধে নানা মতভেদও রয়েছে। একদল যেমন রামমোহনের শাঙ্করঅদ্বৈত প্রচার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অপরদলের মতে তেমনই তিনি শঙ্করভাষ্যের অনুগামী হলেও শঙ্করের কেবল প্রতিলিপিই নন। কারণ বহুবিষয়ে তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে তিনি শঙ্করের ন্যায় অগ্রগামী নন। কারণ তাঁর মতানুযায়ী জীব মুক্ত হলেও জীবের কাছে ব্রহ্ম চিরদিনই সাধনীয় ও পূজ্য। তেমনই লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা চিঠিতে তিনি মায়াবাদকে মিথ্যা বিদ্যা এবং কালের অনুপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষের মতে শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় তিনি মায়াবাদ, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববাদ এবং নির্গুণবাদ গ্রহণ করেছেন। বিতর্ককালেও তিনি মায়া এবং নির্গুণবাদের আশ্রয়ে নিম্নঅধিকারীর জন্য ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে মূর্তিপূজা, দেবদেবীর পূজা ও প্রতীক উপাসনা স্বীকার করেও পরমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্বীকার করেছেন সম্পূর্ণরূপে। পুনশ্চ 'পঞ্চভূত জড়ময়, কভু আছে কভু নয়, সকলি অনিত্য হয় দারাসুত ধনজন, রামমোহনের এই ব্রহ্মসঙ্গীতে মায়াবাদকে স্বীকার করার মধ্যে স্ববিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।[২]

রামমোহনের মধ্যে যেমন বেদান্ত ও উপনিষদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই দেখতে পাওয়া যায় তন্ত্রের প্রভাব। আচার, অনুষ্ঠান ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙ্গলার অস্থিমজ্জায় তন্ত্রের ভাবধারা ছড়িয়ে রয়েছে। কেবমাত্র বাঙ্গলা নয় এই তন্ত্রশক্তির প্রভাব সুদূরপর্যন্ত, এমন কি তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মণ্য তন্ত্রের বিভিন্ন নারীশক্তি ব্যতীতও আর একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'লামা'র মধ্যে, যাঁর সংশ্লিষ্ট দেবতা হচ্ছেন লামেশ্বর। ডাকিনী, শাকিনী ইত্যাদি শব্দের মত 'লামা' শব্দটিও বিচিত্র। এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে তিব্বতীয় 'লা—মো' অর্থাৎ দেবী [শক্তি] হতে 'লামা'র উৎপত্তি।[৩]

১। রামকৃষ্ণের জীবন [১৯৪৭] রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য।

২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—পৃঃ ১৯৫-৯৭ দ্রষ্টব্য।

৩। Besides the enumeration of various female energies (yogini) in the Brahmanical Tantras, we find a type called

সংসার ত্যাগ করে নয়, সংসারে অবস্থান করে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই কাম্য বলে মনে করতেন রামমোহন। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ তিনি মহানির্বান তন্ত্র থেকে লাভ করেছিলেন।[১] তাঁর 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচারে, তান্ত্রিক আচারের সমর্থন পাওয়া যায়। বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখা গিয়েছে যে তিনি শঙ্করের মায়াবাদকে সমর্থন না করলেও মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন। অদ্বৈতসম্বন্ধে এই উপলব্ধিই তন্ত্রশাস্ত্রের শেষ কথা বলা যায়। প্রভেদ এই যে, তান্ত্রিক উপাসকেরা যন্ত্রপ্রতীক উপাসনা ইত্যাদি বিশেষ উপাসনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের ঐক্য উপলব্ধি করেন। তন্ত্রশাস্ত্র মানুষকে গুণানুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তম তিনভাগে বিভক্ত করে দেবাচার, বীরাচার ও পশ্বাচারের নির্দেশ দান করেছেন। তেমনই সাধকদের মঙ্গলানুযায়ী তন্ত্র, ধ্যান, জপ ও বহিঃ পূজারও বিধান আছে।

"উত্তমো ব্রহ্মাসদ্‌ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥"

'আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই ভাবটি উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম, এবং বাহ্যপূজা অধমের চেয়েও অধম।' রামমোহনেরও বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনার পর যে উপলব্ধি হয় তারই ফলে মূর্তিপূজা ও প্রতীক উপাসনাকে নিম্নস্থানীয় বলে নির্দেশ করেন। তিনি ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি মাত্রও বর্ণ পরিবর্তিত না করে মহানির্বাণতন্ত্র হতে স্তবপঞ্চক গ্রহণ করেছিলেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য তাতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তন্ত্রধারার থেকে মুক্ত ছিলেন এ ধারণা করা ভুল হবে। কারণ তিনি ব্রাহ্মসমাজের অবিসম্বাদী নেতারূপে পরিগণিত

Lama (Rupika cumbika, Lama), The corresponding God is called Lamesvara. The word Lama, like a few others, such as Dakini, Sakini. Lakini and Hakini, in spite of their late explanation, seems to be exotic. Lama is certainly Tibetan word 'Lha-mo', which means Devi (Sakti)—The Cultural Heritage of India (Vol. IV) edited by Haridas Bhattacharya p. 225-26.

১। মহানির্বাণ তন্ত্রের মধ্যেই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।—বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় তন্ত্রের প্রভাব [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৪—পৃঃ ২৫৯]—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

হওয়ার পরেও দেখা যায় যে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠান মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুসারেই হত। এমনও শুনতে পাওয়া যায় যে, দীক্ষার্থীদের তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র অনুসারে মন্ত্রদান করতেন।[১]

রামমোহনের তত্ত্বদর্শনে খৃষ্টধর্মের প্রভাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত সাপ্তাহিক উপাসনা পদ্ধতি ইতিপূর্বে হিন্দুধর্মে দেখতে পাওয়া যায় না।[২] পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত রীতি কেবলমাত্র হিন্দু বা খৃষ্টধর্ম হতে নয়, কিন্তু উভয় ধর্ম হতেই গৃহীত। তবুও একথা বলা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হিন্দু বা খৃষ্টধর্মের কোন রীতিনীতি একটি অপরটিকে প্রভাবিত বা পরি-চালিত করেনি। সেগুলি পাশাপাশি অবস্থান করে সমাজের মধ্য দিয়ে উভয়-ধর্মের যুক্তিসম্মত আদর্শগুলিকে সত্যরূপে করেছে উদ্ভাসিত। একমাত্র জটিল-তার সৃষ্টি হয়েছে তখনই যখন নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কালের সঙ্গে সমাজের আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে। এইভাবেই রামমোহনের অদ্বৈতবাদ দেবেন্দ্রনাথের রামানুজপন্থী আপেক্ষিক অদ্বৈতবাদে ও ক্রমে কেশবচন্দ্রের প্রথম যুগের একেশ্বরবাদ ও পরবর্তীযুগের খৃষ্টমতানুবলম্বনে পরিবর্তিত হয়েছে।[৩] রামমোহন যে মূলগত দর্শনের উপর বারবার জোর দিয়েছেন তা এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানবতার ঐক্য সাধনের মূলনীতি হচ্ছে সমাজের

১। ব্রাহ্মসমাজে ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল।...শোনা যায় যে মহানির্বাণতন্ত্র অনুসরণে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীদিগকে মন্ত্রদানও করিতেন।—আত্মজীবনী [১৯৬২]—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিশিষ্ট ২৫, পৃঃ ৩২২।

২। It is plain on the very surface that the movement was largely inspired by christanity. The weekly congregational worship (now first introduced into Hinduism) consisting of the reading of the sculptures, a sermon and a singing of hymns is quite a sufficient prayers seems to have had a very subordinate place, if it had any place at all in the service, but that is sufficiently explained by Ram Mohan's deistical turn of mind and by the absence of prayer from the Hindu philosophical system :—Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol II) Edited by James Hastings.—p. 814.

৩। Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol II) edited by James Hastings—p. 823 দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলসাধন ও জ্ঞানমার্গে বিচরণ।[১] সকলদিক বিচার করেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে বলেছেন যে,—"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী, কি স্বদেশী স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কারও স্থান সঙ্কীর্ণতা নেই। তাই সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।"[২]

প্রসঙ্গত ভারতের অন্তরের সঙ্গে জড়িত একটি মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত হচ্ছে গুরুর দেশ, অর্থাৎ গুরুবাদ ভারতের অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে আদিকাল থেকে যাঁর যত কিছু দানই থাকুক না কেন, গুরুবাদের অলংঘ্য আকর্ষণ থেকে কেউই মুক্ত হতে পারেননি। সর্বাধুনিক কালেও রামমোহন তাঁর তুহাফতুল মোহায়দ্দীনে গুরুবাদ অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে গুরুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তন্ত্রের সাধনায় তিনি হরিহরানন্দতীর্থ স্বামীকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন।[৩] এমনও শোনা যায় যে তান্ত্রিক সাধনায় তিনি বহুবার পুরশ্চরণ করেছিলেন। মহানির্বাণ তন্ত্র অনুযায়ী দীক্ষার্থীদের মন্ত্রদানের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথেও সেই গুরুবাদের আভাস পরিস্ফুট। দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞানের আধাররূপে ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং অন্তরোপ-

---

১। The fundamental principles or laws have been discovered and repeatedly emphasized by Rammohan, the basic unity of mankind as the goal of human research on the intellectual plane and the welfare of society as the dominant consideration and the ultimate goal of our moral endeavour. —The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 616.

২। চারিত্রপূজা—রবীন্দ্র রচনাবলী [পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত] ১১শ খণ্ড ; পৃঃ ৩৬০—৩৮৭।

৩। রামমোহন তুহাফতুল মোহায়দ্দীন গ্রন্থ রচনাকালে গুরুবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি গুরুর সহায়তার প্রয়োজনবোধ করিয়াছিলেন।...তবে তিনি তন্ত্রের সাধনায় হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী [১৩৩৪] —গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ১৪৫।

লব্ধির প্রাধান্য দেন। কেশবচন্দ্র তার সঙ্গে একটি তৃতীয় পন্থার নির্দেশ দেন—মহাপুরুষদের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী। কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি নিজেকেও ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষরূপে জ্ঞান করতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি নিজের নির্দেশকে 'আদেশ' বলে প্রচার করতেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী বহু শিষ্য তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেন বলা যায়। তাঁর এই গুরুপূজার প্রতিবাদেই ব্রাহ্মসমাজে আর একবার ভাঙ্গন ধরে। তিনি এই পদ্ধতি আকাঙ্ক্ষা করেন না বললেও কখনও এই প্রথাপালনে প্রতিবাদ করেননি।[১] রামকৃষ্ণ পরমহংসও হিন্দুধর্মের গুরু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। এই কারণেই তিনি নির্দেশ দেন যে শিষ্যের পক্ষে গুরুর সমালোচনা করা উচিত নয় এবং সকল ক্ষেত্রেই বিনা প্রতিবাদে গুরুর নির্দেশ পালন করা উচিত।[২] পরমহংস সংসারীদের এই বলে অভয় দিয়েছিলেন যে—'গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।'[৩] সুতরাং দেখা যায় যে

১। Devendra recognized two sources of knowledge of God-Nature and Intuition ;—Keshub added a third—God in history speaking through great men. It was surmised that he regarded himself as one of the great men he had spoken of. One sent by God on a special mission, and therefore to be followed, honoured and obeyed. Here some of his followers began, in accordance with the supposed ideas of his lecture on 'Great men' to prostrate themselves before him and treat with special honour. Other protested vigorously against this 'guruworship' ; and a serious divison began to show itself in Keshub's Samaj. The leader said he did not wish for those demonstration ; yet he did not rebuked those who practised them...By 'adesh' Keshub meant the direct command of God laid upon him by special revealation at certain definite moments in his career. To his opponents this special revealations were both blasphemous and dangerous.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol 11) edited by James Hastings—P. 818-19.

২। He (Ramkrishna) further shared the ordinary Hindu idea of the 'guru' or spiritual teacher, declaring that the disciple should never criticize his own guru and must unquestioningly obey his behests.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol X) edited by James Hastings—P. 569.

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত [২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬]—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃঃ ৭১ দ্রষ্টব্য।

কেউই গুরুবাদের মোহ হতে মুক্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এই গুরুবাদের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে এসেছেন। সেই কারণেই বহুক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি থেকে তাঁর মতবাদ ভিন্ন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে গুরুবাদের বিরোধী মতবাদ পোষণ করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন 'গুরুদেব' নামে অভিহিত হতে আপত্তি করেন নি। অনেকে এইজন্য গুরুবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-নাথের মতবাদের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' নামে অভিহিত হওয়ার পিছনে কোন গুরুবাদ নেই। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের বাসস্থান 'গুরুপল্লী' নামে পরিচিত ছিল এবং শিক্ষকদের সেখানে গুরুনামে অভিহিত করা হত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রধান গুরু বলেই সম্ভত তাঁকে বলা হত গুরুদেব।

রামমোহনের মৃত্যুর পর হতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ বলা যেতে পারে। তারপর ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য মহর্ষির সূত্রেই যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগসাধিত হয় এ ধারণা করা ভুল। বহুপূর্ব হতেই সমাজের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেইকারণেই রামমোহন রায়ের ট্রাষ্টডীডের নিয়মানুসারের ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী নিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল কেবলমাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের।[১] দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহনের নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে দ্বারকানাথই বৃষ্টলে রামমোহনের সমাধিমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।[২] রামমোহনের ইংলণ্ডে যাত্রার পর তিনি নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজকে মাসিক সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত রামমোহনের মৃত্যুর পর নয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বরক্ষা সম্ভব হতনা।[৩]

১। আত্মজীবনী-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পৃঃ ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

২। When in England, Dwarakanath fulfilled a sacred duty to the memory of Rammohan Roy, the great religious reformer of India, by erecting a tomb over his ashes in the cemetary at Bristol, little thinking that he would soon share his fate, and die like him in a foreign land.—Rammohan to Ramkrishna (1952) by F. Max Muller-P.24.

৩। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুকাল মাসিক ৬০ টাকা ও পরে মাসিক ৮০ টাকা হিসাবে নিয়মিত

তিনি নানাভাবে সমাজকে সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত এবিষয়ে প্রাণমন সমর্পন করেননি। বরং দেবেন্দ্রনাথ যাতে সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়েন সেই আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতেন। মুখ্যতঃ তাঁরই ভয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁর বাড়ীতে আসতে সাহস করতেন না। যার ফলে হেদুয়ার বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশের কাছে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত ও উপনিষদ শিক্ষা করতেন।[১] রামমোহনের একেশ্বরবাদে তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল ও সেই মতবাদকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা সত্ত্বেও পরিবারে প্রচলিত পূজাপার্বন বন্ধ করেননি। কলকাতায় ঠাকুরবাড়ির সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিখ্যাত ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি গায়ত্রীমন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করে এসেছেন। এমনকি ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে ডাচেস অফ সাদারল্যাণ্ড (Duchess of Sutherland) তাঁর বাড়ীতে এসে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি জপ শেষ না করে ওঠেননি।[২] অর্থাৎ কখনই সনাতন হিন্দুধর্মের আচারনিয়ম প্রতিপালনে তাঁর বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা যায় নি।

প্রাচীন সংস্কার ঠাকুর পরিবারে কিরূপ সুদূরপ্রসারী ছিল তার উদাহরণ দেখতে পাওয়া দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য স্মৃতিপ্রসঙ্গে স্বীকারোক্তিতে। তিনি বলেছেন,—'অল্প বয়স থেকেই মূর্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজীতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম

অর্থ সাহায্য করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের রক্ষা করিতেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থ সাহায্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদান্তজ্ঞান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ—এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্যন্ত নয় বৎসরকাল ১৮৩৩-১৮৪২ ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত না।—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিশিষ্ট ২০, পৃঃ ৩০৬।

১। আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না, যেহেতুক আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম। কিন্তু এখন দেখি যে তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।"—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৩৯।

২। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিশিষ্ট ৯৩, পৃঃ ২৭৬—৭৭ দ্রষ্টব্য।

গর কারণ পৈতৃক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময় আমাদের বাড়ি
বতী পূজা হত, মনে আছে একবার সরস্বতী প্রতিমার অর্চনায় গিয়েছি, শেষে
র আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপর
জোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট। তাতে দেবীর মুকুট ভেঙ্গে পড়ল। এই
পরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলুম কিনা মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে
জা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বুঝতে পারছি। বাঁশীতে ছিদ্র দেখা
য়েছে। আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতি ভ্রংশ হতে আরম্ভ হয়েছে।
ামি যে আমার সর্বিসের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারিনি সেও ঐ কারণে।
রস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে
রতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হল না।'[১] অর্থাৎ প্রাচীন বিশ্বাসের
রুদ্ধাচরণকেই তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করেছেন এবং এর মধ্যে
র্তিপূজার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজতরীর কর্ণধাররূপে দেবেন্দ্রনাথের আগমনের পর
মাজের ধারার বহু পরিবর্তন সাধিত হল নেতার দৃষ্টিভঙ্গির অনুযায়ী। কারণ
থম হতেই কয়েকটি বিষয়ে রামমোহন হতে তাঁর মতবাদ ছিল ভিন্ন। তত্ত্ব-
বাধিনী সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্রের মূল তত্ত্বের ও সেইসঙ্গে উপনিষদের
ধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। তিনি মনে করতেন যে শঙ্করের মায়াবাদই বেদান্ত-
র্শনের একমাত্র সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্যের জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বিধান তাঁর মনঃপূত
ছিল না। কারণ তিনি আকাঙ্ক্ষা করতেন ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ
াপনে, যাতে ঈশ্বরকে উপাসনা করা যায়। জীব ও ব্রহ্ম এক হলে এই উপাসনার
ভিত্তি থাকে না।[২] অতএব সন্দেহ থাকে না যে তিনি অদ্বৈতবাদের বিরোধী

১। আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—৩য় বর্ষ, ১ম
ংখ্যা বৈশাখ, ১৩৭১—সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর]; পৃঃ ৩২।

২। ১৭৬১ শকের ২১ শে আশ্বিন তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার
উদ্দেশ্য আমাদিগকে সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার
প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম, বেদান্তদর্শনের
সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।...টীকা ১—দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্যের
মায়াবাদকেই বেদান্তদর্শনের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। [পৃঃ
২৬]...আমরা ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম।
বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যেহেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর

ছিলেন প্রথম হতেই। এমনও মনে করা যেতে পারে যে উপনিষদের আংশিক অধ্যয়নের ফলে উপনিষদসমূহের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতে উপনিষদই বেদান্ত এবং এই বেদান্ত অভ্রান্ত কিনা সে বিষয় সম্ভবতঃ তাঁর মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। তিনি মনে করেছিলেন যে উপনিষদ ঈশ্বরের একেশ্বরবাদ ও স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে বলে আদরের বস্তু এবং অদ্বৈতবাদের শিক্ষা বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায় বলে সেটি ত্যাগ করা উচিত।[১] সুতরাং দেখা যায় যে তিনি রামমোহনের পথ হতে অন্য পথে গমন করেছেন; রামমোহনের ধর্ম ও মীমাংসার মত গ্রহণ করেন নি; শঙ্করের বেদান্তব্যাখ্যার স্থানে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং রামমোহনের মহানির্বাণতন্ত্র হতে গৃহীত ব্রহ্মোপাসনার স্তবপঞ্চক পদ্ধতিকেও পরিবর্তিত করেছেন। তাঁর মতে বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করে ফেলেন। এই কারণে পৌত্তলিকতা, খৃষ্টধর্ম এবং বৈদান্তিক মত এই তিনটি বিপদ হতে ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করার কথা তিনি বলেছেন।[২] এই পৌত্তলিকতা সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট বিদ্রোহী রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণেব

ব্রহ্মকে এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে [পৃঃ ৩১]...কিন্তু 'আমি স্বয়ং পরমেশ্বর' এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়, ইহাতে জিব কাটিতে হয়, বিষয়ের শতপাশে বদ্ধ হইয়া, জরা-শোকে পাপে তাপে মত্ত হইয়া আপনাকে নিত্য মুক্ত স্বভাববান মনে করার চেয়ে আর আশ্চর্য কি হইতে পারে [পৃঃ ১৬৫]—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১। উপনিষদের অসমগ্র অধ্যয়নের ফলে তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়াছিল যে বেদান্তসূত্রের ন্যায় উপনিষদও আত্যন্ত একভাবাপন্ন (homogenous) ও সুসম্বদ্ধ (systematic) রচনাবলীর সমাবেশ। তাই তিনি মনে করিলেন, বেদান্তসূত্র অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, অতএব তাহা ত্যাজ্য; এবং উপনিষদ কেবল বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, অতএব তাহা আদরনীয়। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকেই বেদান্ত বলিতেন। এই 'বেদান্ত' অভ্রান্ত কিনা, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। —আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিশিষ্ট ৪৫, পৃঃ ৩১০।

২। তিনি ব্রহ্মসমাজকে তিনটি আপদ হইতে রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন, যথা—১। পৌত্তলিকতা, ২। খৃষ্টানধর্ম, ৩। বৈদান্তিক মত। বৈদান্তিক মত অর্থে তিনি অদ্বৈতবাদই বুঝিতেছেন, এবং তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, "বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।"—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—পৃঃ ২০২।

সময় শপথগ্রহণের প্রথা তিনি প্রচলিত করেন। ইতিপূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না। শপথের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্যসমূহ সম্পাদিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হত।[১]

ইতিপূর্বে বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগেনি এবং বেদকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হত। কিন্তু অবশেষে অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু বেদের মতবাদের অভ্রান্ততাবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচার উপস্থিত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে অনিচ্ছুক থাকলেও অবশেষে এ সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হলেন। বাঙলায় প্রকৃত বেদ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি চারজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠালেন ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ অধ্যয়নের জন্য। পরে তিনি নিজেও কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন। পর্যালোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে দেবতাদের যাগযজ্ঞই বেদে অপরা বিদ্যার বিষয়। কালী, দুর্গা, শালগ্রাম শিলা ইত্যাদির পূজা ত্যাগ করেই ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছেন মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব আধুনিক দেবতা ছাড়াও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এমন অনেক দেবতা আছেন যাদের পুতুলপূজা না হলেও অনুরূপ পূজার ব্যবস্থা আছে। যেমন সকল ক্রিয়াকর্মে, শ্রাদ্ধ ও বিবাহে দেবতারূপে অগ্নির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যে বেদ কর্মকাণ্ডের পোষক বলা যায়, সেই বেদকেও ব্রহ্মোপাসনার জন্য গ্রহণ করা আর সম্ভব রইল না।[২] বেদান্ত ত্যাগ করে যে উপনিষদের উপর দেবেন্দ্রনাথ নির্ভর করেছিলেন সেই উপনিষদও আর নির্ভরযোগ্য রইল না। কারণ যে উপনিষদের উৎপত্তি

১। **By the end of 1843 he had drawn up what is known as Brahma covenant, a short series of solemn vows to be taken by all who wished to become member of the Samaj. The most important of these vows were promise to abstain from idolatry and to worship God by loving him and by doing such deeds as He loves.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol II) edited by James Hastings, pp. 815—16.**

২। কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ ইহারা সব তন্ত্রপুরাণের আধুনিক দেবতা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য ইহারা বেদের পুরাতন দেবতা, এবং ইহাদের লইয়াই যাগযজ্ঞের মহাআড়ম্বর। অতএব কর্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃঃ ৯৮।

অরণ্যে তাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিহীন।[১] সুতরাং এখন জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠল ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি তবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়? মহর্ষির মনে প্রশ্ন জাগল,—"ব্রাহ্ম ধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।"[২] নীতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হতে ব্রাহ্ম সমাজের অনুসৃত 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম,' রূপ বদল করে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে অভিহিত হয়।[৩] সম্ভবতঃ 'ব্রাহ্মধর্ম' শব্দটির সৃষ্টিও দেবেন্দ্রনাথের দ্বারাই হয়েছিল।[৪] সুতরাং অপরাবিদ্যার অন্তে অন্তর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মহর্ষির পরাবিদ্যা অধীত হল,—যে পরাবিদ্যার বিষয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥[৫]

১। উপনিষদ সেই অরণ্যের উপনিষদ। অরণ্যেতেই তাহার প্রণয়ন, অরণ্যেতেই তাহার উপদেশ, অরণ্যেতেই তাহার শিক্ষা, গৃহেতে ইহার পাঠ পর্যন্ত নিষেধ। আমরা প্রথমেই এই উপনিষদ পাইয়াছিলাম।—আত্মজীবনী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃঃ ৯৯।

২। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃঃ ১২৪।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী; পৃঃ ৬৯ এবং রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, —পৃঃ ২৮২ দ্রষ্টব্য।

৪। সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ যোগদানের পরে, যে সময় ব্রাহ্ম কথাটি প্রবল হইয়া উঠিল তখন হইতে 'ব্রাহ্ম ধর্ম' এই নামটিও ঐ ধর্মের সংক্ষিপ্ত নামরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে। ইহাও অসম্ভব নয় যে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথ-এর সৃষ্টি।—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পরিশিষ্ট ২৩; পৃঃ ৩১৭।

৫। শ্বেতাশ্বতারোপনিষৎ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ [৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৩৬৬] স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত; পৃঃ ৩৯০

'আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি, সাধক কেবল তাহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; তদ্‌ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর কোন পথ নাই,।[১]

শাঙ্কর অদ্বৈত মতবাদ প্রথমেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। এখন বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকৃত হয়ে আত্মপ্রত্যয় আসন গ্রহণ করল।[২] বেদত্যাগের পর সমাজের বিশ্বাস ছয়টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হল :—

১। ঈশ্বর মানুষের ব্যক্তিগত ও মহান নৈতিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। ঈশ্বর কখনও অবতাররূপে অবতীর্ণ হননি।

৩। ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করেন ও উত্তর দান করেন।

৪। ঈশ্বরকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়ে পূজা করা উচিত। হিন্দুদের তপস্যা, মন্দির বা পূজার বিশিষ্ট রীতি অনাবশ্যক। জাতিনির্বিশেষে সকল মানুষই ঈশ্বরকে পূজা করার অধিকারী।

৫। অনুতাপ এবং পাপ হতে বিরতিই ক্ষমা ও মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

৬। প্রকৃতি ও সংজ্ঞা দ্বারাই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। কোন, পুস্তকই প্রামান্য নয়।[৩]

১। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃ: ১০২।

২। About 1850, however Devendra and most of his followers denied the infallibility of the Vedas, and redefined its creed as faith based on nature and intuition, though religious truth contained in any book was to be respected, man's beliefs being evolutionary.—Encyclopaedia Britanica (vol, III, 1961)—p. 1015.

৩। The faith of Samaj at this time may be summed up in the following six propositions :—

1) God is personal being with sublime moral attributes.

2) God has never become incarnate.

3) God hears and answers prayers.

4) God is to be worshipped only in spiritual ways. Hindu asceticism, temples and fixed form of worship are unnecessary. Men of each caste and race may worship God acceptibly.

5) Repentence and cessation from sin is the only way to forgiveness and salvation.

পুরাতন সংস্কার বিসর্জনের পর মহর্ষি উপলব্ধি করলেন যে সাধকদের তিনস্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা আবশ্যক,—অন্তরে, বাইরে ও ব্রহ্মপুরে। যিনি এই ত্রি-ত্ব উপলব্ধি করেন তিনিই পরম যোগী।[১]

দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি উদারপন্থী ছিলেন। ইতিপূর্বে সমাজ মন্দিরে তেলেগু ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ পঠিত হত একটি স্বতন্ত্র কক্ষে, কারণ প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই বেদপাঠ শ্রবণের অধিকার অব্রাহ্মণদের ছিল না[২]। মহর্ষির দৃঢ়তাতেই এই প্রথা দূর হয়ে প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা হয়।[৩] আবার স্ববিরোধী মনোভাবও তাঁর মধ্যে কখনও কখনও দেখা যায়। যেমন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মনোভাববশতঃ সুখানন্দনাথের কলকাতার কালীঘাটের অনুকরণে নির্মিত কালীঘাট দেখবার নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কামাখ্যার মন্দির, পুরীর জগন্নাথের মন্দির ইত্যাদি ও বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনে অসম্মত হননি।[৪] প্রকৃতকথা তিনি ছিলেন

6) Nature and Intuition are the sources of knowledge of God. No book is authoritative.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (vol II) edited by James Hastings, p. 816.

১। সাধকদের এই তিনস্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। [পৃঃ ১১৩]…যে যোগী একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান—দেখিতে পান যে তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম যোগী। [পৃঃ ১১৪]—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। Two Telegu Brahmins used to recite the Vedas, in a side room, screened from the view of the congregation, where non-Brahmins would not be admitted.—The Cultural Heritage of India. (vol. IV) edited by Haridas Bhattacharya —p. 623 and History of Brahma Samaj [I] by Shivnath Shastri.

৩। ১৮৪২ সালে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন।—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিশিষ্ট ১৭, পৃঃ ৩০৫।

৪। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ১৪৮, ১৫৮, ১৮০ ও ২২৬ দ্রষ্টব্য।

বহুলাংশে হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত এবং মতবাদে রামানুজপন্থী। বৈদিক ভারতের সকল কিছুই ছিল তাঁর আদর্শস্বরূপ। এই কারণেই তাঁর রচনাসমূহে কখনও খৃষ্ট বা বাইবেলের উল্লেখ বা উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। তিনি জন্মান্তর-বাদের নীতি পরিত্যাগ করেছেন এমন কথা কখনও বলেননি। যদিও প্রায় সকল ব্রাহ্মেরা সেদিন একথা বলতেন। ব্রহ্মের সঙ্গে মানবাত্মার মিলনই ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু।[১] এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করেছে। বহুক্ষেত্রে আত্মীয়, বন্ধু বা সহকর্মীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বা শাস্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও ব্রহ্মের প্রতি স্থির বিশ্বাস ও আকুলতাই তাঁকে দিয়েছে শক্তি, তাঁকে করেছে পথপ্রদর্শন।[২]

দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাব সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের মনঃপূত হচ্ছিল না। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর তারা নেতার সন্ধান পেলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আকর্ষণীয় চাকরীর মায়া ত্যাগ করে তাঁর আদর্শবাদী বন্ধু ও সহযোগীদের সঙ্গে 'সঙ্গত সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] তাঁর একাগ্রতা দেবেন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। এরই ফলে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে

১। He was almost exclusively under Hindu influence, his master being Ramanuja. To him ancient India was the cradle of all that was pure in moral and religious. So powerful was Hindu thought in his life that upto the very end he never definitely told his disciples that he had given up the doctrine of trans-migration, as pratically all Brahmas have done. He was never known to quote the Bible and in his printed sermons no reference to the teaching of Christ is to be found. The direct communion of the human soul with the supreme spirit was the most salient point in his teachings.—Encyclopaedia of Religion aud Ethics (vol II) edited by James Hastings—p. 822.

২। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজায়' বলেছেন,—মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কি উত্তর পাই; তিনি তাঁহার পূর্বতন সমস্ত সংস্কার সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।—রবীন্দ্ররচনাবলী [পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত]—একাদশ খণ্ড—পৃ: ৩১৬।

৩। The Cultural Heritage of India (vol. IV) edited by Haridas Bhattacharya, p.62 দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য পদ দেন। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই আচার্যপদে অভিষিক্ত হতে পারতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল মতবাদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্যবিধান হতে পারল না। এরই ফলে উভয়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।[১]

ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর ব্রহ্মানন্দ এমন বহু প্রথার প্রচলন করলেন যা সমাজে প্রবেশ করতে পারে বলে ইতিপূর্বে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সনাতন হিন্দুধর্মের এবং খৃষ্টধর্মের এমন বহু অনুষ্ঠান তিনি প্রবর্তন করলেন মূর্তিপূজা বিরোধী ব্রাহ্মসমাজে যার প্রচলন আশ্চর্যজনক। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'যীশাস ক্রাইষ্ট', 'এশিয়া য়্যাণ্ড ইয়োরোপ' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বক্তৃতার পর মিশনারীদের সঙ্গে মেলামেশা, বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা, যীশুর জন্মদিবস উদযাপন ইত্যাদির মধ্যে তাঁর খৃষ্টপ্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।[২] অপরপক্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নগর সংকীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংকীর্তন সম্পূর্ণ বৈষ্ণবপন্থী। সম্ভবতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারাই সমাজে এই প্রথার প্রথম প্রচলন হয়।[৩] এই সংকীর্তন অভূতপূর্ব সাড়ার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে তাঁর মধ্যে শাক্তপ্রভাবের উল্লেখ করা যায়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সংগ্রহের এক প্রার্থনায় তাঁর মাতৃভাবনা ও অনুকম্পা লাভের বাণী ধ্বনিত হয়।[৪]

১। রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথশাস্ত্রী—পৃঃ ২২৪ দ্রষ্টব্য।

২। আত্মচরিত [১৩৫৯]—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১০১ দ্রষ্টব্য।

৩। বোধ হয় ১৮৬৭ সালে গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকাইয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্তন শোনান। তদবধি সংকীর্তনপ্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে।—আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১০১।

৪। His introducing devotional exercise through sankirtan branded him in the eyes of radical Brahmos, as a backsider to Vaisnavism, as a result of the influence of his devoted friend Vijoy Krishna Goswami. With the same curious logic some may consider him to be a Sakta, because in a prayer included in his Siksa-Sangraha (1866) Keshub cries out passionately, 'Oh Thou Mother—Divine.' bind me with thy mercies.'—The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya, p. 629.

কেশবচন্দ্র উদারমতাবলম্বী হলেও প্রগতিবাদী যুবকদলের সঙ্গে তিনি সমতালে চলতে পারলেন না। বহুবিষয়ে মতান্তর ঘটতে থাকে। ব্রহ্মানন্দের 'আদেশ'ও গুরুবাদ বা নরপূজার সম্বন্ধে অসন্তোষ ক্রমে হয়ে ওঠে ধূমায়মান। তাঁর 'বৈরাগ্য' প্রচার ও 'বৈরাগ্য পালন'-ও যুবক ব্রাহ্মদলে হাস্য পরিহাসের ব্যাপার হয়ে ওঠে।[১] ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহের পর উভয়পক্ষের সহঅবস্থান আর সম্ভব রইল না। ফলে ব্রাহ্মসমাজে আর একদলের সৃষ্টি হল এবং এটি পরিচিত হল 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে, কারণ এরা সর্বসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের প্রচার করলেন।[২] বেদের অপৌরুষেয়তা ত্যাগের পর আদি ব্রাহ্মসমাজ যে ছয়টি মূলনীতি গ্রহণ করেছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই ছয়টি মূলনীতির সঙ্গে আরও তিনটি নীতিকে গ্রহণ করলেন :—

৭। ঈশ্বর সর্বমানবের পিতা ও মানবেরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ।

৮। আত্মা অবিনশ্বর ও তার অগ্রগতি শাশ্বত।

৯। ঈশ্বর ধর্মের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দান করেন। তাঁর দেওয়া শাস্তি প্রতিকারমূলক ও চিরন্তন নয়।[৩]

১। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১১৫ ও ১৩৩ দ্রষ্টব্য।

২। প্রথম বক্তব্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামকরণ কিরূপে হইল? আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি। কেশববাবু সর্বেসর্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কাজ হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্ম সমাজ সকলের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না। এখানে সভ্যগণের ও সমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য করিবে।—আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১৫২।

৩। The creed of the Sadharan Samaj is the same as the creed of the original Samaj with the addition of the three following :—

7. God is the Father of men and all men are brothers.
8. The soul is immortal and its progress is eternal.
9. God rewards virtue and punishes sin. His punishment is remedial and not eternal.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings, p. 820.

কেশবচন্দ্রের মধ্যে হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের সমন্বয়সাধন হয়েছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। য়্যাংলিকান সন্ন্যাসী লিউক রিভিংটন ও জেসুইট সন্ন্যাসী ফাদার ল্যাফন্টের অন্তরঙ্গতায় তার মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ জাগে।[১] অপরপক্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্টতার ফলে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাব তাঁর উপর লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরকে পিতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। হয়ত এর পিছনে খৃষ্টধর্মের অলক্ষ্য প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[২] পরমহংসের অসাধারণ মহিমার প্রভাবে কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবনার উদয় হয়। হিন্দু আদর্শের যে শক্তি মাতৃরূপে পরিচিত তিনি ঈশ্বরের রূপে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মানন্দের ঈশ্বরভাবনা মাতৃভাবনার মধ্যে নবরূপে রূপান্বিত হয়ে উঠে।[৩] তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মতবাদ অন্যান্যদের অপেক্ষা পৃথক ছিল। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই ধারণা একটা সুসংহত রূপ

১। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ৯৭ এবং The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (3rd Edition, 1931) by P. C. Mazoomdar—p. 229-30 দ্রষ্টব্য।

২। The Christian doctrine of the love of God, which is a necessary element in the Fatherhood, passed into the teachings of Brahmo Samaj and the Prarthana Samaj, and has deeply influenced most of the other movements—Modern Religious Movements in India—Dr. J. N. Farquhar—p. 436 and The Cultural Heritage of India. (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 569.

৩। The acquaintance of this devotee which soon matured into intimate friendship, had a powerful effect upon Keshub's catholic mind. The very first thing observable in the Paramhansa was the intense tenderness with which he cherished the conception of God as Mother. To him the female principle in the Hindu idea of God-head, Shakti, the incarnation of force, popularly called Kali was the Mother Supreme. In his devotional colloquies he often addressed the Deity in various forms of the word Mother. And now the sympathy, friendship and example of the Paramhansa converted the Motherhood of God into a subject of special culture with him.—The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen by P. C. Mazoomdar—P. 227-29.

গ্রহণ করল। ম্যাক্সমুলারের মতে 'নববিধানে' ধর্মসম্বন্ধে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় সেটি প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের নিকট তিনি দীর্ঘদিন ধরে যে সত্য উপলব্ধি ও শিক্ষালাভ করেন তারই আংশিক প্রকাশমাত্র।[১] মতান্তরে 'নববিধানে' কেন্দ্রীয় ভাবধারা তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :—কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিরন্তন প্রেরণা, খৃষ্টধর্মের তত্ত্ববিধান সম্বন্ধীয় মতবাদ এবং সকল ধর্মই সত্য, রামকৃষ্ণের এই মতবাদ।[২] অবশ্য এ বিষয়ে বহু মতবিরোধ আছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে 'নববিধান' ঘোষণার মধ্যে কেশবচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ ব্যক্ত হয়। এই মতবাদ ব্রাহ্ম সমাজের পূর্বতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ। নববিধানের প্রতীকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলাম এই চারটি মুখ্য ধর্মের সমন্বয় কল্পনা করা হয়েছে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে ঈশ্বরের শেষ বিধানরূপে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে তিনি ও তাঁর দ্বাদশজন অনুগামী ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ঈশ্বরের সর্বধর্ম মিলনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।[৩] নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত হিসাবে ঘোষণার মধ্যে

১। A strong and deep love grew up between the two, and Keshub's whole life became changed, till a few years later he proclaimed his views of religion as the New Dispensation, which was nothing but a partial representation of the truths which Ramkrishna had taught for a long time.—Rammohan to Ramkrishna by F. Max Muller—p. 128.

২। (ক) The central conception of the New Dispensation has three sources—Keshub's belief in his own perpetual inspiration, the Christian doctrine of dispensations and Ramkrishna Paramhansa's doctrine that all religions are true. —Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol IX) edited by James Hasting—p. 339.

(খ) The fact is that the deep sentiment of 'bhakti' serged him in his soul and he evolved a new mysticism of his own based on the reconciliation of all faiths, which found its culmination in January, 188I, in his own announcement of the New Dispensation (Nava-Vidhan).—The Cultural Heritige of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 630.

৩। Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol. II) edited by James Hastngs—p. 820

পূর্বতন 'আদেশে'র প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। নিজের এই মতবাদ পরিপুষ্ট করার জন্য 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' 'আদি ব্রাহ্মসমাজে'র ছয়টি মূলনীতির সঙ্গে আরও যে তিনটি নীতির যোগ করেন, 'নববিধানে' কেশবচন্দ্র সেই সঙ্গে আরও তিনটি নীতির যোগসাধন করেন :—

১০। ঈশ্বর একাধারে তিনটির প্রতিভূ—পিতা, পুত্র এবং আত্মা, ঈশ্বর মাতা এবং পিতা উভয়ই।

১১। ব্রাহ্মধর্ম কোন নূতন ধর্ম নয়, কিন্তু সকল ধর্মের চুম্বক ও এক বিশ্বজনীন বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের শেষ বিধান, এবং প্রচারকেরা নবীন বাণী প্রচারের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত দূতস্বরূপ।

১২। প্রকৃতি, সংজ্ঞা এবং অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়, ঈশ্বর তাঁর সেবকদের নিকট 'আদেশে'র মাধ্যমে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১]

ব্রহ্মানন্দ এমন সব আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের অনুষ্ঠানসমূহের সূত্রপাত করেন, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অনুষ্ঠান ছিল কল্পনাতীত। কয়েকটি সর্বজনবিদিত হিন্দু অনুষ্ঠান মন্দিরে সম্পন্ন করা হয়। দীক্ষা ও যীশুর ভোজন অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপিত হয় এবং নববিধানের সঙ্গে সংযুক্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠানের আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্র করেন।[২] ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর

১। In order to complete the creed of the New Dispensation church three articles required to be added to the nine of the Sadharan Samaj :—

(10) God is Trinity in unity—Father, Son and Spirit. God is mother as well as father.

(11) Brahmaism is not a new religion, but the essence of all religions, the One Universal faith, the Brahma Samaj is God's latest Dispensation and the missionaries are the God-appointed apostles of the new gospels.

(12) Knowledge of God comes through Inspired Men as well as through Nature and Intuition. He reveals His will on occasion to his servants by command, Adesh.

—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings, p. 821.

২। Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings—p. 820 দ্রষ্টব্য।

অনুগামীদের দ্বারা তাঁর মৃত্যুদিবস প্রতিবৎসর 'প্রভুর উদয়ন' দিবসরূপে পালিত হয়ে থাকে।[১]

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ব গ্রহণ করেন ও 'India asks, who is Christ'—বক্তৃতায় খৃষ্টের প্রতি দেবত্ব আরোপ করেন। অনুরূপভাবে তিনি একেশ্বরবাদের স্থলে ব্রাহ্ম বিশ্বাসে হিন্দুধর্মের বহু ঈশ্বরবাদকেও গ্রহণ করে বলেন যে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মূর্তিপূজার বহু ঈশ্বরবাদ একেশ্বরবাদে উপস্থিতির সোপান নামে অভিহিত করা যায়।[২] সংক্ষেপে বলা যায় যে, সকল ধর্মের যে শুভ চিন্তাটুকু মানবের পক্ষে মঙ্গলকর এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বলে তিনি মনে করতেন তারই গ্রহণ ও প্রচারে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন,—"প্রভু যীশু আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেতিস আমার মস্তিষ্ক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষিরা আমার আত্মা, মানবপ্রেমিক হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।"[৩] এইজন্য তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে খৃষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন, খৃষ্টানদের চোখে খৃষ্ট যে ভাবে প্রতিভাত হন সেভাবে নয়। মৃত্যুর পূর্বে 'ইউরোপের নিকট এশিয়ার বাণী'তে (Asia's Message to Europe, 1883) এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন,—খৃষ্টান ইউরোপ

১। The death of Keshab is celebrated annually as the day of the 'Ascention of the Master.'—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings—p 822 এবং আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ২০০।

২। In 1882 his doctrine underwent a further extension or at least an unfolding Christ had been declared 'divine' in his lecture on 'India asks, who is Christ ?' He now taught the Christian doctrine of the Trinity, declaring that the one God existed as the Father, the son and the Blessed spirit···He similarly adopted Hindu polytheism to Brahma belief, speaking of the analytic process by which the idolator selects an attribute or attributes to the Eternal for his particular use, and the synthetic process whereby the theist reaches the one God of the whole earth.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings—p. 820.

৩। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টের বাণীর অর্ধেকখানিই বোঝে নাই। ইউরোপ বুঝিয়াছে খৃষ্ট এবং ভগবান এক; কিন্তু বোঝে নাই যে, খৃষ্ট এবং মানবহৃদয় অভিন্ন। এই দুর্বোধ্য বিরাট প্রহেলিকাকেই 'নববিধান' বিশ্বের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছে; কেবল ভগবানের সহিত মানুষের পুনর্মিলন নহে, মানুষের সহিত মানুষের-ও।...শিব, সত্য, সুন্দর, —হিন্দু এশিয়ার বিনয়, ইসলামের সততা, বৌদ্ধ ধর্মীর ত্যাগ, তিতিক্ষা—সমস্তই, যাহা কিছু পবিত্র তাহাই, তাহাই খৃষ্টের মধ্যে রহিয়াছে।[১]

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজ জনসাধারণের মধ্যে নিজের স্থান কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কারণ পরিসংখ্যা অনুযায়ী দেখা যায় যে, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যাহ্নকালে সমগ্রভারতে সমাজের সংখ্যা ছিল ১৭৩ এবং ব্রাহ্মধর্মী ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা ছিল ৯৫০০।[২] ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর মধ্যে এই সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এমন কি কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশেও এই সংখ্যা উৎসাহজনক নয়। তবুও ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে দেশব্যাপী এত উৎসাহ, উত্তেজনা ও আলোড়নের কারণ 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে' কেবলমাত্র ধর্মসম্পর্কেই নয়, সাংস্কৃতির ঐক্য বিধানের প্রচেষ্টাতেও নবযুগের সূত্রপাত সমাজের দীপ্ত প্রচারকদের দ্বারাই হয়। রামমোহনের ট্রাস্ট ডীডেই এই নবীন চেতনার বাণী প্রথম ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

যখন ব্রাহ্মসমাজের দীপ্তি মধ্যাহ্ন আকাশে এবং পাশ্চাত্য সংস্পর্শে এসে দেশবাসীরা এই প্রদীপ্ত আলোই একমাত্র বরণীয় বলে মনে করতে সুরু করেছেন, তখন এমন একজনের আবির্ভাব হল, যার ফলে পূর্বেকার নূতন আলোও আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণের চক্ষুতে অকস্মাৎ ম্লান বোধ হল। উনবিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবে কেবল জনসাধারণই নয়, ব্রাহ্মসমাজের বহু নেতা দলত্যাগ করে সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন অথবা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মনেতা

১। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ১০৪-০৫ দ্রষ্টব্য।

২। Statistics :—When Keshub passed away, the number of samajas all told was 173. There are said to be about 1500 covenanted members and about 8000 adherents.—Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol II) edited by James Hastings—p. 821.

কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। কেশবচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমেই তিনি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সর্বপ্রধান শিষ্য বিবেকানন্দে পরিণত হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর প্রভাবে সমাজ পরিত্যাগ করে গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে সাধনায় সিদ্ধ হন। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজপন্থীর উপরেও তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

ইতিপূর্বে ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও সংস্কারক নিজ মত প্রচারে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন ও শিষ্যেরা সেই ধ্বজা বহন করে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে প্রাচীরের ব্যবধানে খণ্ড ক্ষুদ্র করে ফেলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরবণে এই সত্য পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, এই সময় দেশে এমন একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়েছিল যিনি একই কালে সকল ধর্মের সত্যতা প্রতিপাদন করতে পারেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে এই প্রয়োজনই সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মের বিভিন্ন মার্গের অনুশীলনে তিনি এই সত্য লাভ করেন যে, মতবাদগুলির বহিঃপ্রকৃতি নামে ও পন্থায় ভিন্নধর্মী হলেও মূলতত্ত্বে একই লক্ষ্যে উপনীত হয়। তাঁর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফলে এ বিষয়ে তাঁর সকল সন্দেহের নিরসন হয় যে, যে কোন ধর্মমার্গেরই বিশ্বস্ত অনুসরণে আত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ব্যক্তিগত ভগবান বিভিন্নরূপে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, আল্লা, জিহোবা ইত্যাদি অথবা নিরাকারবাদীর ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সহস্রনামের অন্তরালে একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই লক্ষ্যস্থল— এই ঐক্যপ্রচারই রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন।

রামমোহনের সঙ্গে রামকৃষ্ণের তুলনামূলক আলোচনাতে উভয়ের মধ্যে এক নীতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। পরমহংস রামমোহনের মত জ্ঞানমার্গের যাত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভক্তি মার্গের পথিক। রামমোহনের বিভিন্ন ধর্মের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল সকল ধর্মের সার সংগ্রহ করা, সকল ধর্মের নিম্নস্তরের পন্থাগুলি পরিত্যাগ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর মতে,— 'প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই মিথ্যার স্থান আছে।' অপরপক্ষে ভক্তিমার্গের পথিক রামকৃষ্ণ কেবল হিন্দু নয়, খৃস্ট, ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সাধনায় সর্বশেষে একই চরম লক্ষ্য সর্বশক্তিমানের উপলব্ধিতে এই তথ্যই প্রমাণ করলে. ন যে,—'সকল ধর্মই সত্য।' অথবা পরমহংসের ভাষায়, 'যত মত তত পথ।' তাঁর এই তত্ত্বের

সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 'সকল ধর্মেই সত্য নিহিত আছে,' তথ্যের পার্থক্য, সহজেই অনুমেয়। এই কারণেই শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসুর অভিমত এই যে,—যদি রামমোহন ধর্মবিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে প্রতি ধর্মের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরোপলব্ধির শিল্প শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।[১]

বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখতে পাওয়া যায় যে, যেখানে মানবসেবা ধর্মের মাত্র একটি অঙ্গ হিসাবে কল্পনা করা হয়, সেখানে রামকৃষ্ণ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর মতে ক্লিষ্ট মানবজাতির সেবাও ঈশ্বরসাধনার একটি পথ। উপাসনা বা আরাধনা নয়, কেবল সেবাধর্মের মৌলিক সাধনার মাধ্যমেও ঈশ্বরের উপলব্ধি হতে পারে। ধর্মজগতে এমন উদাহরণ বা মতবাদ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।[২] সুতরাং দেখা যায় যে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধনই নয়, তার চেয়েও এক বড় আদর্শের স্থান রামকৃষ্ণের দর্শনে রয়েছে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মধুর সম্বন্ধ, প্রেম ও অনুভূতির উপলব্ধিতে প্রত্যেকে যেন সমগ্র মানবজীবনের সঙ্গে নিজের একাত্ম সাধন করতে পারে। ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থিত। সুতরাং মানুষের মধ্যেও তিনি অবস্থিত এবং সেই কারণেই মানবসেবাই সার্বজনীন ধর্ম হওয়া উচিত।[৩] অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

১। If Rammohan taught us the science of religion, Sri Ramkrishna taught us the art of God realization in and through the multifarious practices of each religion.—The Religion of the World (Vol 11) published by the Ramkrishna Institute of Culture, Calcutta—p. 527.

২। Any way, humanitarian service according to either of these two religions (Buddhism and Christanity) is a part of complete programme of spiritual practice and is endowed only with a moral value. But Ramkrishna presents altogether different ideal. The service of suffering humanity with the subjective outlook and attitude of worshipping Divinity is by itself entire programme of a new form of spiritual practice that can independently lead an aspirant upto the goal of God realization—The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya, p. 681.

৩। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ বলেন,—'যুদ্ধমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন সাধনের অপেক্ষা তিনি বহুগুণে মহত্তর কিছু চাহিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, মানুষ মানুষকে বুঝিবে, তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে,

সংসারীদের মনে সর্বদাই এই বোধ থাকে যে যেহেতু তারা সংসারের নাগপাশে বদ্ধ ও মায়ার অধীন, অতএব তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। পরমহংস তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে বলেন যে, "কেবল পাগলেই বলে,- "আমি শিকলে বাঁধা আছি।" বারবার এই চিন্তার ফলে তারা বদ্ধ হয়। মন মুক্ত থাকলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। যার মন মুক্ত, তার পক্ষে সংসার বা বনবাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[১] সংসারীদের সংসারে বিমুখ না হওয়া সম্বন্ধে এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়,— "ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুইহাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা ও সেবা করবে।"[২] অর্থাৎ যতদিন প্রয়োজন সংসারে থাকতে হবে এবং তার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরলাভ হবে সুদূরপরাহত। মায়া কেবল সংসারীদের মধ্যেই নয়, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অবস্থিত। অনেক সময়ে অহং-এর ফলে তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন না। এই সত্য দর্শনের মধ্য দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গুরুরও গুরুর কাজ করেছিলেন। তাঁর গুরু ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরী একথা বুঝতে পারেন নি যে কেবল জ্ঞান নয়, যে সব পথে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় প্রেমও তার অন্যতম।[৩] একদিন তাঁর ভৃত্য ধুনী থেকে

তাহাকে ভালবাসিবে, সমগ্র মানব জীবনের সহিত নিজকে এক করিয়া তুলিবে, কারণ ভগবান যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকেন, তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনই তাহার ধর্ম। এবং তাহা সকলের ধর্ম হওয়া উচিত।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ; পৃঃ ১৫৮।

১। কেবল পাগলেই বলে, "আমি শিকলে বাঁধা আছি।" এবং এইরূপ বলিয়া অবশেষে সত্যই সে শিকলে বাঁধা পড়ে···মনই সব। মন যদি মুক্ত থাকে তবে তুমিও মুক্ত, বনেই থাকি, আর সংসারেই থাকি, আমি শিকলে বাঁধা নই। রাজার রাজা যে ভগবান, আমি ত তারই ছেলে।"—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ১৬৫।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত [১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬] মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ১৯৭ দ্রষ্টব্য।

৩। অতুলনীয় বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তোতাপুরী বুঝিতে পারিলেন না যে সকল পথে ভগবানের সাক্ষাৎ মিলে, প্রেমও তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ৪১।

কাঠ সরানোয় তার অশ্রদ্ধাভাবের জন্য তোতাপুরী তাকে তিরস্কার করলেন। তখন রামকৃষ্ণ হাসির সঙ্গে মায়ার কাছে তাঁর গুরুর পরাভবের তথ্য ব্যক্ত করলেন। এই ভাবে সত্যের উপলব্ধি তোতাপুরীকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে। শুধু তাই নয়। তোতাপুরী মনে করেছিলেন যে তাঁর কাছে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য,' ইচ্ছামত আত্মবিসর্জন করার ক্ষমতা তাঁর আছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নদীতে ডুবে আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি যখন অগ্রসর হলেন, তখন তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হল। মায়ার অসীম শক্তি তাঁর হৃদয়ঙ্গম হল। তিনি বুঝতে পারলেন মায়া সর্বব্যাপী। যে কোন অবস্থাতেই মায়াকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সারারাত গভীর চিন্তার ফলে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি তাঁর শিষ্য গুরু পরমহংসের কাছে স্বীকার করলেন যে,— 'ব্রহ্ম এবং শক্তি বা মায়া এক, অদ্বিতীয়'।[১] অর্থাৎ মায়াকে ত্যাগ করে নয়, মায়াকে গ্রহণ করেও ঈশ্বরোপলব্ধি হতে পারে, কারণ সেই এক সর্বশক্তিমানই বিভিন্ন রূপে বিরাজিত। রামকৃষ্ণ দর্শনের এই তত্ত্বও এক নূতন দিক দর্শন করায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবে ও তাঁর প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে বহু পরিবর্তন হয়েছিল এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব খর্ব হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মকে তিনি অবজ্ঞা করেছিলেন। ব্রহ্মের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় যখন তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেন, যে 'একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে

১। একদিন একজন ভৃত্য ধুনী হইতে কয়েকটি কাঠ সরাইতে গেলে, তিনি ভৃত্যের এইরূপ অশ্রদ্ধাচরণের প্রতিবাদ করিলেন। তাহা দেখিয়া রামকৃষ্ণ শিশুসুলভ উচ্চহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "দেখুন। দেখুন। আপনিও মহামায়ার দুর্ধর্ষ শক্তির কাছে হার মানিলেন।" তোতাপুরী স্তম্ভিত হইলেন। [পৃঃ ৪১]—তিনি নদীতে নামিয়া দেখিলেন ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার মত ইচ্ছা বা শক্তি তাঁহার নাই। তিনি অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মায়ার শক্তি বুঝিলেন, কি জীবন, কি মৃত্যুতে, কি গভীরতম ব্যথায়, কি দেবীর মধ্যে—মায়া সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে। তিনি সমস্ত রাত্রি একাকী চিন্তায় কাটাইলেন। প্রত্যুষে তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্রহ্ম এবং শক্তি বা মায়া এক অদ্বিতীয়। পৃঃ ৪২।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস ।

পারে নাই।'[১] জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে যে পরম শক্তি 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত তিনি ভক্তের হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্ময়রূপে অবস্থান করছেন। "জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাকেই ভগবান বলে।...ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না, তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নেই।"[২] রামানুজ ও শঙ্করাচার্যের দর্শন সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের (যিনি পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন) সঙ্গে আলোচনাকালে পরমহংস এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করেন যে কালী এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আদিম শক্তি যখন সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কাজ করেন, তখন তিনি শক্তি বা কালী নামে অভিহিত হন। আর যখন তিনি এইসব কর্ম হতে বিরত থাকেন তখন তাকে বলা হয় ব্রহ্ম। যেমন আগুন আর তার দহন শক্তির মধ্যে কোন বিভেদ নেই, তেমনই কোন বিভেদ নেই কালী বা শক্তি ও ব্রহ্মের মধ্যে। তাঁরা অচ্ছেদ্য। এককে বাদ দিয়ে অপরকে চিন্তা করা যায় না।[৩] সুতরাং সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর আরাধ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান।'[৪] এই কারণেই

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ, নবম সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬-মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৫০।

৩। তোমরা যাহাকে ব্রহ্ম বল কালীর সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। কালী হইলেন আদিম শক্তি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন তখন আমরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, কিন্তু যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কাজ করেন, তখন বলি শক্তি, বা কালী। তোমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলো, এবং আমি যাহাকে কালী বলি তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেমন কোন পার্থক্য নাই অগ্নি এবং তাহার দহনশক্তির মধ্যে। একের কথা ভাবিলে আপনা হইতেই অন্যের কথা ভাবিতে হয়। কালীকে গ্রহণ করাই ব্রহ্মকে গ্রহণ করা। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি পৃথক নহে। এবং তাঁহাকেই আমি শক্তি বা কালী বলি।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোলাঁ রোমাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ৪৩, দি বেদান্ত কেশরী, নভেম্বর, ১৯১৬।

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৫১ দ্রষ্টব্য।

পরমহংস ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্রকে বলেন,—'এই আদ্যাশক্তি এবং পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নেই। যেমন জ্যোতিঃ আর মনি।'[১] একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র তাঁর 'নববিধান' ঘোষণা করেন। এই সত্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সুরেন্দ্রের অঙ্কিত তৈলচিত্রে, যাতে পশ্চাৎ পটে দেখানো হয়েছে গির্জা, মসজিদ ও মন্দির এবং সামনে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে চৈতন্য ও খৃষ্টের যুগল নৃত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছেন ও চারিদিকে ঘিরে আছেন মুসলমান, কনফুসিয়ান, শিখ, পার্শী, এ্যাংলিকান এবং হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা।[২] কেবল কেশবচন্দ্রই নন, ব্রাহ্ম সমাজের বহু অনুগামীর উপরও তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে, পরমহংসের উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মমত তাঁদের এমনই অনুপ্রাণিত করতো যে তাঁদের বোধ হত,—'ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র।[৩]

পরমহংসদেব সকল ধর্মকে যেমন সত্য বলে স্বীকার করেছেন, ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও তেমনই বীতরাগ দেখিয়েছেন। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বা শাক্ত কেউই তাঁর সেই সমদৃষ্টি থেকে বাদ যায় নি। সেইজন্যেই তিনি বলেছিলেন,—'ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বলছে, তা হলেই বা, আন্তরিকভাবে তাকে ডাকলেই হলো। যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত অন্তর্যামী তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি। তবে এটা ভাল না—এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বলছে, সব ভুল। আমরা নিরাকার বলছি অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন, আমরা সাকার বলছি অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ, একাদশ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃঃ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

২। Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol X) edited by James Hastings—p. 569;

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ৬৬—৬৭ দ্রষ্টব্য।

৩। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।—আত্মচরিত—১ম সংস্করণ, ১৩৫৯, শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ১২৮।

নন। মানুষ কি তার ইতি করতে পারে। এই রকম বৈষ্ণব-শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে আমার কেশব, শাক্ত বলে আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধার কর্তা।'[১] সুতরাং প্রত্যেক ধর্মের গোঁড়ামিই পরিত্যাজ্য। কারণ যে কোন পথেই সাধনা হোক না কেন আন্তরিকতা থাকলে সর্বশক্তিমানের সন্ধান লাভ অবশ্যম্ভাবী। 'আন্তরিকতা থাকলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে। আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না,' 'আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।'[২] সকলের সার কথা এই যে ঈশ্বর অন্তরের উপলব্ধির বস্তু। কোন যুক্তি তর্ক বা বাদবিসম্বাদে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হতে পারে না—'আমি তর্ক ভালবাসি না, ভগবান যুক্তির উর্ধ্বে। আমি দেখি যাহাই রহিয়াছে তাহাই ভগবান।...তবে যুক্তি তর্কে লাভ কি?...তবে অবতার, পৌত্তলিকতা, এইসব বিবাদ বচসা লইয়া সময় নষ্ট করা কেন?'[৩] বাদবিসম্বাদের বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করলেও সব কিছু পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে বলেছেন।[৪] শুধু তাই নয়। সমাজ সংস্কারের কাজে তারই অবতীর্ণ হওয়া উচিত যিনি সাধনাদ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন ও প্রত্যাদেশ পেয়েছেন।[৫] কারণ ক্ষমতা ও সাধনার মিলন না ঘটলে

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ,—১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

৩। রামকৃষ্ণের জীবন—রোঁমা রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৪। রামকৃষ্ণ সহাস্যে নরেনকে সমর্থন করিলেন এবং শিষ্যদিগকে বলিলেন. "আমি বলিয়াছি বলিয়াই কিছু গ্রহণ করিও না। নিজেরা সব কিছুকে পরীক্ষা করিয়া দেখ।" —রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ২০৬।

৫। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই। দু' চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার। লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ১৩।

সাফল্য আসা সম্ভব নয়। এইজন্যেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট সমাধিলাভের দিনে তিনি শিষ্যমণ্ডলীর ভার মানসপুত্র বিবেকানন্দের উপর অর্পণ করে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান করতে বলেছিলেন।[১] নিজের যত কিছু সম্পদ সমস্তই প্রিয় শিষ্যের উপর অর্পণ করে তিনি মনস্কামনা জানিয়েছিলেন,—'আজ থেকে তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম। আমার আর কিছুই রইল না। আমি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র। এই শক্তি নিয়ে তুই জগতে অশেষ মঙ্গল করতে পারবি। সে মঙ্গলসাধনা না হলে তুই ফিরতে পারবি না।'[২] ইতিপূর্বেই যখন বিবেকানন্দের ঈশ্বরোপলব্ধি হয়, রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, 'মা' তাঁকে সব দেখিয়ে দিলেও তিনি যা দেখেছেন সব তালাচাবি দিয়ে তুলে রাখতে হবে ও সেই চাবি গচ্ছিত থাকবে পরমহংসের কাছে। 'মা'র কাজ শেষ হলে তিনি আবার চাবি ফিরে পাবেন।[৩]

রামকৃষ্ণ দর্শনের মূল প্রচারক বিবেকানন্দের জীবনের পরম তত্ত্ব ছিল Sic vos non vobis—কাজ করো, তবে নিজের জন্য নয়। রামকৃষ্ণের ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা তাঁর ধর্মতত্ত্বে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। বিশেষত্ব এই ছিল যে বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণীকে এক বিশেষ স্থান দান করেছিলেন। রামমোহনে যে বেদান্তের সূত্রপাত বিবেকানন্দে তারই পুনরাবির্ভাব ঘটে। সুতরাং ঊনবিংশ-শতাব্দীর আদিতে ও অন্তে একই ভাবধারার বন্যা এসেছিল বলা চলে, তবে আদিতে নিরাকারবাদী ও অন্তে সাকারবাদীর মাধ্যমে। মধ্যে কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে সাময়িক অবলুপ্তি ঘটেছিল মাত্র। স্বামীজী হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বলতেন 'বেদান্তধর্ম'। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন—"সমগ্র ধর্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে।"[৪] স্বামীজীর মতে বেদান্তের

১। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস; পৃঃ ২৩৮, The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 687.

২। রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ২৪৩ দ্রষ্টব্য।

৩। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ-১ম সংস্করণ—স্বামী অপূর্বানন্দ, পৃঃ ৫ এবং রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস, পৃঃ ২৩৭ দ্রষ্টব্য।

৪। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ—১ম সংস্করণ—স্বামী অপূর্বানন্দ—পৃঃ ১৩৭

মধ্যে সকল ধর্মের মূল নীতি বর্তমান। সেই কারণেই বেদান্তের আশ্রয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মের ঐক্য অনুভব করে বিশ্বজনীন ধর্মের বিকাশ সম্ভব হতে পারে।[১] যদি হিন্দুরা তাদের প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী বেদান্তের আদর্শের উপর নির্ভর করতে পারে, তবে মানুষে মানুষে এই বিভেদ দূর হয়ে ঐক্যের বন্ধনে ভারত জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে। বেদান্তের আদর্শ—আত্মার অমরতা, নিখিলবিশ্বের ঐক্য এবং নির্ভয়তার আদর্শ; সুতরাং এই আদর্শ অনু-সরণে ভারতের সকল বিভেদেরই অবসান মাত্র হবে না, অধিকন্তু জাতিকে অসীম শক্তির অধিকারী করে হতাশা ও অবসাদের পঙ্কজগৎ হতে উদ্ধার করবে।[২] হিন্দুধর্মকে তার সমস্ত সংস্কার হতে মুক্ত করে স্বামীজী বেদান্তের যে আদর্শ পাশ্চাত্যজগতে প্রচার করেছিলেন ও তার যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল, ভগিনী নিবেদিতা তাকে 'আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই 'আক্রমণশীল' অর্থ এই নয় যে অপরধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। এর প্রকৃত তাৎপর্য প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ীর স্বীয় ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।[৩] সুতরাং দেখা যায় যে রামমোহনের বেদান্তদর্শন বিবেকানন্দের মধ্যে নূতন রূপ গ্রহণ করে।

১। Above all he laid special emphasis on the fact that the broad and liberal message of Vedanta contained the science of all religions that might enable the world to realize the essential unity underlying all religions and to stand united on the magnificient pedestal of Universal Religion—The Cultural Heritage of India (vol. IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 711

২। The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya, p. 717 দ্রষ্টব্য।

৩। With Swami Vivekananda's preaching of the universal doctrines of the Vedanta in the Western countries, the ancient religion of the Hindus has been released from the stigma of a crude and Superstitious creed, and it has positively stepped on to a new phase of evangelism that has been termed 'aggressive Hindiusm' by Sister Nivedita. Hinduism has become aggressive not in the sense of seeking converts from any particular fold, but as confirming the faiths of all people in their respective churches by furnishing them with the under-lying rational of all creed.—The Cultural Heritage of India (vol IV) edited by Haridas Bhattacharya—p. 725.

অবশ্য স্বামীজী রামমোহনকে তাঁর পথ প্রদর্শকরূপে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।[১]

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত এই যে অন্তরের অন্তঃস্থলে ধর্মের উৎপত্তি। মানুষের মধ্যে পূর্ণতালাভের কল্পনাই স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে ও অবশেষে চরম পরিণতিতে উপনীত করে। ধর্ম কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বস্তুই নয়। মানবজীবনে দয়া, জ্ঞান ও পূর্ণ পরিণত জীবন লাভের এক বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন আছে। এই কারণে তিনি বলেছিলেন,—'আমার বিশ্বাস ধর্মচিন্তা মানুষের প্রাকৃতিক গঠনের এরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ যে, যতক্ষণ না মানুষের মন, দেহ এবং জীবনের বিনাশ হয় ততক্ষণ ধর্মত্যাগ করা অসম্ভব।[২] ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধকেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে, যখন তিনি সর্বপ্রথম শাস্ত্রের দুইটি উদ্ধৃতি দিলেন,—'আমার কাছে যে যেরূপেই আসে, আমি তার কাছে যাই,' এবং 'মানুষ নানাপথে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সকল পথের শেষেই আছি আমি,' তারপর হিন্দুধর্মকে সকল ধর্মের মাতারূপে উপস্থিত করে বললেন যে, হিন্দুধর্ম দুইটি শিক্ষা দেয়,—পরস্পরকে বোঝ, পরস্পরকে গ্রহণ ক'র।[৩] একে রামকৃষ্ণদর্শনের প্রতিধ্বনি বলা যায়।

জগতের কল্যাণসাধনের যে বিপুল দায়িত্ব রামকৃষ্ণ তাঁর উপর অর্পণ করে গিয়েছিলেন সেই দায়িত্বভার তিনি বহন করেছিলেন সবলভাবে। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' এই কারণে বিবেকানন্দের ধর্মের সঙ্গে কর্ম অঙ্গে অঙ্গে মিশে গিয়েছে; তাঁর কর্মে,

১। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে তিনি বেদান্ত, স্বদেশহিতৈষণা এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি এই তিন বিষয়ে রাজা রামমোহনকে পথপ্রদর্শকরূপে মান্য করিয়া রাজার প্রদর্শিত পথেই পর্যটন করিয়াছেন।—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—পৃঃ ১১৮।

২। The Cultural Heritage of India (Vol IV) edited by Haridas Bhattacharya, p. 712 দ্রষ্টব্য।

৩। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববানী—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস পৃঃ, ৩২ দ্রষ্টব্য।

চিন্তায় ও বাণীতে ধর্মের একাগ্রতার সঙ্গে ক্লিষ্ট মানবের জন্য ব্যাকুল বেদনা জেগে উঠেছে। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,—'যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাস করি, তাহা হইল বিশ্বের সমস্ত আত্মার সমষ্টি। এবং সর্বোপরি আমি বিশ্বাস করি, সকল দেশের সকল জাতির পাপী ভগবানে, পতিত ভগবানে, দুঃস্থ দরিদ্র ভগবানে।'[১] মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য সকলকে ঈশ্বর লাভের পন্থারূপে মানবসেবার উপদেশ দিয়ে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এমন এক ধর্মের, যে ধর্ম সকল দুঃখ বেদনাকে দূর করে দিতে পারে। 'আমি এমন একটি ধর্ম চাই, যা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদা বোধ জাগাবার এবং দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চারিপাশের সকল দুঃখবেদনাকে দূর করবার শক্তি এনে দেবে।...যদি ভগবান লাভ করতে চাও, তাহলে মানুষের সেবা কর।'[২] অর্থাৎ 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' বিবেকানন্দের উক্তির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জাতির পুনর্জন্মের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণার তুলনা করা যায়।[৩] সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান কর্ম এবং কর্ম হতেই জ্ঞানের উপলব্ধি। 'ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল, কর্ম—ফুল।...এইরকম জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।'[৪]

বিশ্বমঙ্গলের জন্য বিপুল জগতের সঙ্গে বিবেকানন্দের যে বাস্তব সম্বন্ধ তার মূল উদ্দেশ্য বাস্তববাদী পাশ্চাত্য জগৎ যে অর্থ ও সামগ্রী অর্জন করেছে, এবং ভারত যে আধ্যাত্মিক সম্পদে বলীয়ান, সেই দুটির পারস্পরিক বিনিময়।[৫]

১। রামকৃষ্ণেরজীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ২১৬

২। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ—১ম সংস্করণ—স্বামী অপূর্বানন্দ, পৃঃ ১২৩ দ্রষ্টব্য।

৩। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের মতই তিনি মনে করিতেন যে জাতির পুনর্জন্মের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ৯০।

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৃঃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

৫। বিবেকানন্দের সম্মুখে কাজ ছিল দুইটি: পাশ্চাত্য সভ্যতা যে অর্থ ও সামগ্রী অর্জন করিয়াছে তাহা ভারতে লইয়া আসা, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদকে পাশ্চাত্য জগতে লইয়া যাওয়া। একটি বিশ্বস্ত বিনিময়, একটি ভ্রাতৃত্ব-পূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা।—বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী (১৩৬০) রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষিদাস—পৃঃ ৬৫।

বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সর্বোচ্চ জ্ঞানমার্গের অনুসন্ধানের সঙ্গে ভক্তি ও সাধনা এবং শঙ্কর ও উপনিষদের দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরবাদীর বিশ্বাস মিলিত হয়েছে। এখানে পৌরাণিক ধর্মের সকল অনুষ্ঠানই যথাযথ সম্পন্ন হয়, কিন্তু জাতি বর্ণ অথবা খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য বা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে কোন বিভেদের স্থান নেই। কারণ চরম লক্ষ্য ঈশ্বরের উপাসনা। সুতরাং নামে বা সাকার নিরাকারে সেখানে কোন পার্থক্য নেই। এই সত্যজ্ঞানই আলোয়ারের মহারাজাকে দান করেছিলেন স্বামীজী। মানুষ যখন মূর্তি পূজা করে তখন সে প্রস্তর অথবা মাটিকে পূজা করে না, সর্বভূতে অবস্থিত যে ঈশ্বর, মূর্তির প্রতীকের মধ্যে সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করে। অতএব লক্ষ্য যেখানে এক, সেখানে সাকার নিরাকার পার্থক্য কল্পনা বুদ্ধি হীনতার পরিচয়।[১]

রামকৃষ্ণ মিশন কেবল ধর্ম বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক নয়, ধর্মের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধনের প্রতীক। ধর্মানুশীলনের সঙ্গে ক্লিষ্ট মানবের পার্থিব ক্লেশহরণের প্রচেষ্টাও এই সংঘের প্রধান নীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শ বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর মনেপ্রাণে যে প্রবল অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তারই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[২]

১। ভগবদ্‌ভক্ত প্রস্তরাদিনির্মিত মূর্তিকে ভগবানের প্রতীক জ্ঞানে পূজা করেন। ঐ পূজা ভগবানেরই পূজা, মূর্তির পূজা নয়। এই হল প্রতীকোপাসনার সার তত্ত্ব। মূর্তিপূজক কখনো বলে না, হে প্রস্তর আমি তোমার উপাসনা করি। ব্রহ্ম চিন্ময় ও বিভু। তিনি মূর্তিতেও বর্তমান। মূর্তি সেই চিন্ময় ভগবানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ভক্ত মূর্তিকে অবলম্বন করে শ্রীভগবানকেই পূজা করে এবং সে পূজা ভগবান গ্রহণ করেন।—যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ (১ম সংস্করণ), স্বামী অপূর্বানন্দ—পৃঃ ১১৬—১৭।

২। তবে এই বইটি (আনন্দমঠ) পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালীর সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত চিন্তাকে অসামান্যভাবে গঠিত ও পরিবর্তিত করিয়াছে, একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে কয়েক বৎসর পরে অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রচেষ্টা— উভয়েই যে সর্বাংশে না হউক কতক অংশে আনন্দমঠের প্রতিক্রিয়ার ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ)—সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৬৩।

আলোচনা করলে দেখা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের মতের সঙ্গে সেণ্ট ম্যাথুর বাণীর কোন পার্থক্য নেই—'ঈশ্বরের রাজত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার সন্ধান কর, সেগুলি তোমার সঙ্গেই সংযুক্ত হবে।'[১] পরমহংস এবং স্বামীজীর দর্শন এইভাবে ধর্মকে যেমন কর্মের মধ্যে মুক্তি দিয়ে জনসেবার আদর্শ স্থাপন করেছে ও মানুষকে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। এরই ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি হয়েছে খর্ব। শুধু বাঙ্গলা বা ভারতে নয় সমগ্র পৃথিবীতে এমন চিন্তাধারার বিকাশ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। মনে হয় এঁদের অবতার না বলে ক্লিষ্ট মানবের প্রতিনিধি বলাই সংগত। এই মূর্তিতেই এঁরা ধর্মকে প্রকৃত মানবধর্মের মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন।

১। There is no difference between the doctrines of Ramkrishna and Vivekananda and the words of St. Mathew- "Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness and all those things will be added to you."—The Religions of the World (Vol. 11) published by the Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta—p. 602.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। সাহিত্যের এই বহুমুখী বিকাশের মধ্যে তৎকালীন ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদও বিশেষ স্থান পেয়েছিল। যে কোন দেশেরই ইতিহাসের প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধর্মভাব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ইতিপূর্বে সাহিত্য কিভাবে তার পথপরিক্রমা করেছিল তার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে নদী যতই কেন না অগ্রবর্তী হোক, তার স্রোতের বেগ নির্ভর করে উৎসের উপর।

বস্তুতঃ ধর্মের উপর নির্ভর করে এতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য পথ পরিভ্রমণ করে এসেছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার ধর্ম মনোবৃত্তিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক সময় জ্ঞানাশ্রিত বৌদ্ধ দর্শন বাঙ্গালায় প্রবল হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবের বন্যায় সেইভাব হয় প্রতিহত। এছাড়া জনগণের জীবনকেন্দ্রিক লৌকিক বিশ্বাস ও বোধাতীত মরমীতত্ত্ব ত ছিলই। প্রাচীনকাল হতে যে সমস্ত কল্পনা, ভয়ভাবনা ও ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল, নানাপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেগুলিই লৌকিক বিশ্বাসে পরিণত হয়।[১] অপর-পক্ষে মরমীতত্ত্ব সিদ্ধাচার্য ও সহজিয়া সাধকদের মধ্য দিয়ে অবশেষে আউলবাউল গানে ও অন্যান্য সহজিয়াতত্ত্বে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এগুলি অলিখিত লোকগীতিরূপে কেবলমাত্র বর্তমান ছিল মনে করা যায়। পরে এগুলি মঙ্গলকাব্য, ছড়া, ব্রতকথা ইত্যাদিতে স্থান খুঁজে পেল। দশম শতাব্দী থেকে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সূত্রপাত হল তাকে প্রধানতঃ ধর্মের সাম্প্রদায়িকতার ফলে উদ্ভূত শ্রেণীবিভাগের ফল বলা যেতে পারে। কারণ তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা

১। প্রথম পরিচ্ছেদ [প্রথম প্রত্যূষে মানবের মধ্যে ধর্ম মনোভাবের বিকাশ] দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত ছাড়া অপরভাষায় কাব্যরচনা ও মতবাদ ব্যক্ত করতেন না। অপরপক্ষে অব্রাহ্মণেরা লৌকিক বাঙ্গালাভাষাকেই সাহিত্যের ও মতবাদ প্রকাশের মাধ্যমরূপে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন।[১] বহু মঙ্গলকাব্যের ব্রাহ্মণ কবি আত্মপরিচয়ে বলেছেন যে সমাজে পতিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা প্রথমে মঙ্গলকাব্য রচনা করতে সম্মত হননি। কারণ এই কাব্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হত। অবশেষে বহু দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে তাঁরা মঙ্গলকাব্য লিখতে বাধ্য হন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে এই ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙ্গালাসাহিত্যে যে যুগান্তরের সূত্রপাত হয়, কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ ক্রমেই মন্দীভূত হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে যে বাঙ্গালাসাহিত্য আর একবার দিক পরিবর্তন করে। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে একমাত্র রামপ্রসাদ সেন ছাড়া আর কোন কবির মধ্যেই কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির আবেগ আকুলতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' আদিরস পরিবেশনই লক্ষ্য, দেবদেবীকীর্তন উপলক্ষ্যমাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই যুগের শ্রেষ্ঠ মরমীয়া কবি রামপ্রসাদও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেছিলেন। সাময়িক কালে এমন কোন পদাবলীর সৃষ্টি হয়নি যার বিশেষত্বের জন্য মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। বরং এই যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে পদকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।[২] এর মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান ভাবধারার সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। মোটকথা বাঙ্গালার ধর্মীয়মণ্ডলে তখন পূর্বতন রীতির ভাঙ্গনের সূত্রপাত দেখা যায় এবং সাধারণের রুচি অনুযায়ী সাহিত্যরচনা হতে থাকে। অবশ্য ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত রেখে সাহিত্যমণ্ডল গড়ে তোলার মনোবৃত্তি তখন পর্যন্ত সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

১। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় অবস্থা] দ্রষ্টব্য।

২। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কোন নূতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদাবলী প্রায় সৃষ্টি হয় নাই। তবে পুরাতন ধারানুসারে অনেকগুলি পদাবলী রচিত হইয়াছিল। একটি কথা এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।—হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা [১৯৫০]—ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৬৩।

কবিগানের মধ্য দিয়েও ধর্মসম্বন্ধে এই ক্ষয়িষ্ণু মনোভাবেরই বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কবিগানে স্থূলরসপ্রিয়তার আধিক্য থাকলেও ধর্মমনোভাব যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও ভবানী বিষয়ক এই দুইটিই কবিগানের প্রধান দুটি ভাগ। ভবানীবিষয়ক গানের মধ্যেও আবার দুটি বিভাগ আছে—ঐশ্বর্যভাব ও মাধুর্যভাব। আগমনীগানের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব এক সমন্বয়লাভ করেছে। রামপ্রসাদ, হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতির আগমনী ও বিজয়া গান আকুলতার সৃষ্টি করে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ব্যতীত ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালা সাহিত্যের পাদপ্রদীপ এই কবিগানই জ্বালিয়ে রেখেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ পর্যন্ত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হয়। সাহিত্যের বাহনরূপে পদ্যের যে স্থান ছিল তাকে সেই স্থানচ্যুত করে গদ্য সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্যভাষাবিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। অপরপক্ষে খৃষ্টান মিশনারীগণ ধর্ম-প্রচারের আগ্রহে নানা পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশে মনোযোগী হন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মকে আক্রমণ। কিন্তু পাশ্চাত্যজগতের সংস্পর্শে এসে দেশবাসীদের মনে জাতীয় চেতনা জাগরিত হয়ে ওঠে। তার ফলে প্রচলিত ধর্মকে অবজ্ঞা করে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বাদ প্রতিবাদে বহু পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে এমন আর দেখা যায়নি। বাঙ্গালাসাহিত্যের এই ঘুমভাঙ্গার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার, তেমনই অপরদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেবল বাঙ্গালা বা ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই নানা আন্দোলনের সূত্রপাত দেখা যায়।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে যে প্রচলিত ধর্মবিরোধী নব্যদর্শনের সূত্রপাত হয়, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালায়ও তার ঢেউ এসে লাগে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ [ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়—রামকৃষ্ণ ও তাহার শিষ্যবর্গ] দ্রষ্টব্য।

বিষয়ে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই নবীন আলোকে বাঙ্গালার ধর্মে ও সাহিত্যে যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। প্রতি দেশেই ধর্মকে অবলম্বন করে সাহিত্য গড়ে উঠেছে এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।[১] সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম গৌণস্থান অবলম্বন করে পিছনে পড়ে যায়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনার মধ্যে ধর্মকে কেবল সাক্ষীগোপালের মত সামনে দাঁড় করিয়ে সাধারণের রুচিকে চরিতার্থ করা হয়েছিল। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সাহিত্য ধর্মের নির্মোক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হল। বাঙ্গালায় এর সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কে সাধারণতঃ প্রথম বাঙ্গালা মৌলিক গদ্যগ্রন্থ হিসাবেই সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু এর আর একটি দিক দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকেই বাঙ্গালায় জীবনচরিত রচনার সূত্রপাত। ইতিপূর্বে যত জীবনচরিত রচিত হয়েছে, প্রত্যেকটিই কোন ধর্মনেতার জীবন অবলম্বনে ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে রচিত। সেদিক দিয়ে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে মৌলিক পুস্তক বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। অধিকাংশই ছিল সংকলন বা অনুবাদ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের নামই এযুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তবে অতিরিক্ত উদ্দেশ্যমূলক বলে এঁদের রচনায় সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ দেখা যায় না। সুতরাং সাহিত্যে ধর্মমনোভাব সম্বন্ধে এঁদের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ রামমোহন রায় প্রভৃতির ধর্মমত সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।[২]

প্রাচীন জার্মান প্রবাদ,—'Stadtluft mach freit' অর্থাৎ সহরের হাওয়ায় মানুষের মন মুক্তি পায়'[৩]—এই প্রবাদটিও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে খাটে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানতঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে

১। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় অবস্থা] ।

২। চতুর্থ পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়—রামকৃষ্ণ ও তাহার শিষ্যবর্গ] দ্রষ্টব্য।

৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ ; ১ম সংস্করণ (১৩৬৪)—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১০৫ হতে প্রবাদটি উদ্ধৃত।

উঠেছিল। ইংরাজদের আগমনের পর গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা সহর কেন্দ্রিকে রূপান্তরিত হল। ফলে সহরের মুক্ত হাওয়ায় পূর্বতন সংস্কারকে দূর করে নতুন দিনের বাণী ধর্মে ও সাহিত্যে যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা সাহিত্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছায়নি। তিনি সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন। তবু সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই তাঁর নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ তিনিই বাঙ্গালাভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে তুলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধর্মসম্পর্কে বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। সাময়িককালে ধর্মের আলোড়ন দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী হয়ে এবং তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকেও ধর্মসম্বন্ধে এই নিস্পৃহতা বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজের চিন্তাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নীরবতার অর্থ এই নয় যে তিনি নাস্তিক অথবা গোঁড়া ছিলেন। মূলকথা তিনি বুঝেছিলেন যে ধর্মের আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজের কোন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এর অর্থ শুধু এক সংস্কারকে ত্যাগ করে আর এক সংস্কারকে আঁকড়ে ধরা।[১] রামমোহনের পর ক্রমবিবর্তনের ফলে কেশব সেনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ যে রূপান্তর লাভ করে হিন্দুধর্মের অবতারবাদ ইত্যাদিকে প্রধান করে তুলেছিল সেই দৃষ্টান্তের মধ্যে ধর্মের পরিণতি উপলব্ধি করেই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বদ্ধ থাকলেও ধর্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তাঁর রচনায় হয়ত এই কারণেই শিশুপাঠ্য 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ ছাড়া আর কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া

১। তিনি জানতেন ধর্মের বিপক্ষে বা পক্ষে আন্দোলন করে কোনদিন সমাজের স্থায়ী কল্যাণ কিছু করা সম্ভব হবে না। শক্তি এবং সামর্থ্যের অপচয় ছাড়া ধর্ম আন্দোলন আর কিছু নয়। এক গোঁড়ামি ছেড়ে আর এক গোঁড়ামির গোড়া পত্তন করতে তাঁর নির্মল পরিচ্ছন্ন মন সায় দেয়নি কোনদিন। কোন সমাজের ব্যাধির চিকিৎসা না করলে, কোন সম্প্রদায়ের 'ঈশ্বরে'র পক্ষেই তার **saviour** হওয়া সম্ভব হবে না, এরকম একটা যুক্তিযুক্ত নির্ভর বিশ্বাস মনে মনে পোষণ না করলে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই পরিবেশের মধ্যে বাস করলেও ধর্মসম্বন্ধে এমন নির্বিকার থাকা সম্ভব হত না।—বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালীসমাজ, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ [১৩৬৪]—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৬২।

যায় না।[১] প্রধান কথা ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের মত সর্বজ্ঞের ভান করে হাল্‌কা করে দিয়ে আপনার মত ও সেইসঙ্গে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে চান্‌নি। এই কারণেই তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, 'ধর্ম যে কি তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।'[২] সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের ক্ষোভ তবুও মাঝে মাঝে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রভাব এর পিছনে ছিল না। যেমন দেখতে পাওয়া যায় 'স্যার জন লরেন্স' জাহাজ ডুবির পর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাঁর অভিযোগ তীব্র হয়ে ওঠে।[৩] আবার শিক্ষা পরিষদের কাছে বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্ত বলতে তিনি দ্বিধা করেননি।[৪]

১। বিদ্যাসাগরের জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ pragmatist, তাঁহার দর্শনের নাম জীবনবাদ। পরলোক অপেক্ষা ব্যাবহারিক জীবনকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। বালকপাঠ্য বোধোদয়ে তিনি যে ঈশ্বর বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছিলেন তাহাও হয়ত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নয়, বন্ধুজনের অনুরোধে।—উনিশশতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ৮৪।

২। কাহিনীটি শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' থেকে সংগৃহীত। বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, 'এক দিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় দুইজন ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলুস্থুল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাই বলিতেছে, এ বিষয়ে কিছুই ঠিকানা নাই, আপনি ভিন্ন এবিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'ধর্ম যে কি তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।,—বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ [১৩৬৬]—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩১১।

৩। দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানাদেশের নানাস্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া এই সাতশত আটশত লোককে একত্র একসময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ। এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছে বলিয়া সহসা বোধ হয় না।—৺চণ্ডীচরণ লিখিত বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৪১ এবং উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ৭৯

৪। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল যে সমাজ ধর্মের বিষয়ে শাস্ত্রকে অনুসরণ করে চলে। সেইজন্য বিধবাবিবাহকে তিনি শাস্ত্রসম্মত করে এবিষয়ে সকলের স্বীকৃতিলাভ আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূলতা তাঁর ধারণা ভঙ্গ করেছিল। সেইজন্য 'সমাজে' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এদেশে শাস্ত্র এবং আচার ভিন্নমার্গী।[১] মোট কথা ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর গোঁড়ামি ছিল না, ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেইসঙ্গে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্য দিয়ে যে একেশ্বর বাদ প্রতিষ্ঠা করেন, শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ থাকলেও বাঙ্গালায় একেশ্বরবাদের প্রভাব ইতিপূর্বে কখনও এত গভীরভাবে অনুভূত হয়নি। পুরাতন সংস্কারকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রামমোহনের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে এসে যোগ দেয় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এর ফলে দেশের ধর্মআন্দোলন ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায়,— রাজা রামমোহনের সংগঠন ধারা, রাজা রাধাকান্তদেবের সংরক্ষণ ধারা এবং ডিরোজিও ও আলেকজাণ্ডার ডাফের বিপ্লবধারা, যার প্রধান অবলম্বন ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল'। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক লেখকের মধ্যে এই তিন ধারার কোন না কোন একটির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ডিরোজিওর ছাত্রেরা প্রাচীন স্মারঅন্ধসং ও পৌত্তলিকতা ভাঙ্গবার মোহে এমনই মত্ত হয়েছিলেন যে, মদ খাওয়াকে তাঁরা পুরাতন সংস্কারের উপর বিজয়লাভের উপায়স্বরূপ বলে মনে করতেন।[২] ইংরাজিশিক্ষিত ছাত্রেরা যে কেবল উপবীতই ত্যাগ করেছিলেন তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে তাঁরা ইলিয়াডের পংক্তি উচ্চারণ

১। আমি আশা করিয়াছিলাম কোন সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই এ দেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন— কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার একপথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্নপথে চলিয়াছে।—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত [১৩৩৮] পৃঃ ১৮৫।

২। তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনই সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।—সেকাল আর একাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ [১৯৫১] রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৩২।

করতেন।[১] হিন্দুধর্মের নানাবিভাগ ও বিস্তার দর্শনে আশ্চর্য হলেও আলেকজাণ্ডার ডাফ এই ধর্মকে খৃষ্টধর্মের অসম্পন্ন রূপ বলে মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[২] 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সুযোগ্য অধিকারী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর খৃষ্টধর্মের ত্রিদেবের রূপান্তরিত নামকরণ এবং বাইবেল থেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম ও যজ্ঞেশ্বররূপ কল্পিত হয়েছে।[৩]

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেকাংশে ছিলেন সংরক্ষণপন্থী। সেইজন্য 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিরুদ্ধে তাঁর শ্লেষ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। গোমাংস আহারের বিরুদ্ধে, তিনি বলেছেন,—

> 'খাবার দ্রব্য অনেক আছে, তাই দিয়ে মা চলুক খানা।
> ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না।'[৪]

আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি মিশনারীদের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন,—

১। The junior students caught from the senior students the infection of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter the mantras or prayers, they repeated lines from the Iliad. There were some who flung the Brahmanical thread instead of putting it on.—David Hare, Basumati Sahitya Mandir Edition (1949) by Peary Chand Mitra; pages 17-18.

২। Hinduism is surely the most stupendous—whether we consider the boundless extent of its range, or the boundless multiplicity of its component parts. Of all systems of false religion it is that which seems to embody the largest amount and variety of semblances and counterfeits of divinely revealed facts and doctrines. In this respect it appears to hold the same relation to the primitive patriarchal faith, that Roman Catholicism does to the primitive apostolic faith. It is in fact the Popery of primitive patriarchal Christianity.—India and India Missions by Alexander Duff, page 204.

৩। যে কৃষ্ণাবতারের বিশেষ সম্প্রদায় রামানুজ ভট্টাচার্যের দ্বারা দক্ষিণদেশে সংস্থাপিত হয় কাঞ্চীপুরে অদ্যাপি তাহার গদি আছে। বাইবেলোক্ত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পূর্ণপরিচয় দক্ষিণদেশীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজের পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম, এবং যজ্ঞেশ্বর কল্পনা করা খৃষ্টীয় উপদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে এমত অনুমান করা যাইতে পারে।—ষড়দর্শন সংবাদ [১৮৬৭]—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২০।

৪। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে—বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১৩৫।

'বিদ্যাদান ছল করি মিশনারী ভব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব ॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥
শিশুসবে ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে ভবে।
বিপরীত লবে পড়ে ডুব দেয় টবে ॥'[১]

প্রাচীন সংস্কারপন্থী ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীন ধারার বিপরীত কোন রীতিকেই গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। এই কারণেই স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন—

'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রতধর্ম করত সবে
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।'[২]

আবার বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের বিপক্ষে, এই কারণেই তাঁর তীব্র শ্লেষ ধ্বনিত হয়েছে,—

'পরাশর' প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি সাগরের ঢেউ ॥
* * *
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥'[৩]

প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে একমাত্র কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ দেখা যায়। অবশ্য এমন মনে করা অসঙ্গত নয় যে, রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রভাব এ বিষয়ে তাঁর উপরে পড়েছিল,—

'কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে ॥'[৪]

১। ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে—বসুমতী সাহিত্যমন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১১৮।
২। " " " পৃঃ ১৩৩।
৩। " " " পৃঃ ১১৬-১৭।
৪। " " " পৃঃ ১২৯।

ঈশ্বরগুপ্ত অনেকগুলি ভক্তিরসাত্মক ও পারমার্থিক কাব্যরচনা করে দৈহিক নশ্বরতা ও বৈরাগ্যমহিমা ব্যক্ত করার চেষ্টা করলেও ভক্তের ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। কারণ শক্তিসাধক বা পদকর্তাদের ভাবগম্ভীরতা তাঁর মধ্যে ছিল না।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি,—তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন। যেন মুখামুখি হইয়া কথা কহিতেন,[১] কিছু অত্যুক্তি ও কিছু গুরুর প্রতি অন্ধ অনুরাগের নিদর্শন বলে প্রতিভাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের সাধনায় পার্থক্য শুধু এইমাত্র যে, রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখেছিলেন ও ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। ঈশ্বরগুপ্ত এইভাবের বশবর্তী হয়ে লিখেছেন,—

তুমি যে ঈশ্বরগুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে ছল কেন কর?
গুপ্তকায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥[২]

এর সঙ্গে রামপ্রসাদের আকুল করা মাতৃপ্রেমের ব্যবধান গগনস্পর্শী। ঈশ্বরগুপ্ত যদিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি তথাপি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হৃদ্যতা, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যপদ গ্রহণ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগই সম্ভবতঃ কবির মনে ঈশ্বরকে পিতৃরূপে কল্পনা করার মনোভাব এনে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে তাঁর রচিত 'নির্গুণ 'ঈশ্বরে' ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে 'নির্গুণ ব্রহ্মে'র সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও 'নির্গুণ ঈশ্বরে'র খোঁজ পাওয়া যায় না। 'নির্গুণ 'ঈশ্বর অর্থে কবি নিরাকার সগুন ব্রহ্মকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য মহানির্বাণ

১। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ [১৩৬৫]—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য।

২। ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে—বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১৩।

তন্ত্রের স্তোত্রের ভাষাগত পরিবর্তন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কারণেই করেছিলেন যে 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম' ছিল তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। ঈশ্বরগুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকা', 'শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন' প্রভৃতিতে কবিগানের প্রভাব বহুল পরিমাণে থাকলেও, মহাজন পদাবলীর প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর মতে ঈশ্বর ভক্তিতেই প্রকৃত ধর্ম। এজন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মনকে পবিত্র করা একান্ত আবশ্যক,—

'ঠক্ ঠক্ ঠোকে যাবে আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি মালা ঘুরাইলে ॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রসে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে ॥,'[১]

সাময়িক কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের অবদান অনস্বীকার্য। কবি রজনীকান্তের মতে বিদ্যাসাগরের কোমলতা ও অক্ষয়কুমারের ওজস্বিতা বঙ্গ সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।[২] ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর অক্ষয়-কুমার দত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।[৩] কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মধর্মের দর্শন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাম-মোহনের যুক্তিবাদকেই তিনি ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। তাঁর লেখনীশক্তির ক্ষমতা অনুভব করেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। মহর্ষি মনে করেছিলেন যে সংশোধনের দ্বারা তিনি অক্ষয়কুমারের লেখনীকে সংযত করতে পারবেন। কিন্তু কার্যকালে তাঁর সেই আশা সম্পূর্ণ সফল হল না। ফলে উৎপত্তি হল বিরোধের। কারণ দুইজনের অনুসন্ধান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমার্গী। মহর্ষি খুঁজছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে

১। আধুনিক বাংলা কাব্য, ১ম পর্ব [১৩৬১]—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১ হইতে উদ্ধৃত।

২। বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।— প্রতিভা, ১৭শ সংস্করণ—রজনীকান্ত গুপ্ত, পৃঃ ৪৪।

৩। আত্মজীবনী, ৪র্থ সংস্করণ [১৯৬২]—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪৪-৪৬ দ্রষ্টব্য।

নিজের কি সম্বন্ধ ও অক্ষয়কুমার খুঁজছিলেন বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ।[১] তখনকার যুগে এই দর্শন সত্যই অভিনব।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইটির প্রথম খণ্ড ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমারের নব্য ধর্মদর্শনে এক আলোড়ন পড়ে যায়। যদিও বইটি জর্জ কুম্বের The Constitution of Man—এর অনুসরণে লেখা ও স্থানে স্থানে অনুবাদ হলেও এর ভাবধারা এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার একমাত্র উপায় মানবপ্রকৃতি ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।[২] এই কারণে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মনোবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিব সংযোগস্থাপন করাই সঙ্গত।[৩]

জর্জ কুম্বের Moral Philosophy-র অনুসরণে অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' প্রকাশের সঙ্গেও এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কুম্বের মতে অন্যান্য নৈসর্গিক বিধান মেনে চলার ফলেই ঈশ্বরভক্তির উৎপত্তি হয়েছে। কারণ তিনি ভগবৎ সত্তাকে পৃথিবীর ঘটনাপুঞ্জ থেকে মুক্ত স্বাধীন শক্তি হিসাবে স্বীকার করেন নি।

১। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ—আকাশপাতাল প্রভেদ। —আত্মজীবনী, ৪র্থ সংস্করণ [১৯৬২] —দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৭।

২। যৎপরিমাণে আমাদের মানবপ্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, তৎ পরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি সমুদয়ের সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধস্বরূপ অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব।—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ, ৭ম সংস্করণ [১৮৭১]—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ১৮১।

৩। সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য।—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ২য় ভাগ—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ৩-৪।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এই ঈশ্বর চিন্তাই ছিল অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতির' বিষয়বস্তু। এর ফলে তিনি তৎকালীন দেশাচারের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিদ্রোহ ঘোষণাই করেননি, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই সকল বিষয়বস্তুর অবতারণায় তিনি 'ধর্মনীতি'তে বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি যদি একযোগে কাজ না করে তবে সকল স্থানে মঙ্গল হয় না। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে ভক্তিবৃত্তি মাত্র অলীক কল্পনার উপাসনা করবে।[১] তাঁর মতে হিন্দু স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র-মূল্যহীন ও জ্যোতিষশাস্ত্রও ভ্রান্ত, কারণ পুরাণ পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও নিশ্চলরূপে বর্ণনা করে।[২] যদিও তাঁর এই মতামত বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে ঈশ্বর নির্দেশিত নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মছাড়া আর কিছুই নয়। সেইকারণে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করা যুক্তিহীন। অক্ষয়কুমারের 'মানবকুলের হিতসাধনই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা'র[৩] মধ্যে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী,—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'-এর সূচনা খুঁজে পাওয়া যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন সংরক্ষণপন্থী। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে হিন্দু। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ধারার সমর্থনই করেছে আত্মপ্রকাশ। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর রচনায় গোঁড়ামি কখনই উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।[৪]

১। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।...বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হইলে ভক্তিবৃত্তি সৃষ্ট ও মনকল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।—ধর্মনীতি, ১ম ভাগ, ১১শ সংস্করণ [১৮৯৪] অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ১২।

২। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৫—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য।

৩। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগের উপক্রমণিকা, ২য় সংস্করণ [১৯০৭] অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ৪০।

৪। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—ভূদেবের অধিকাংশ লেখার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই নৈষ্ঠিক সদাচারী 'হিন্দু'টি [পৃঃ ৬৮]...ভূদেবের রচনায় সাহিত্যের দিক হইতে আর কিছু অসৌষ্ঠব

মুসলমানদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা আর্যমত সম্পন্ন এই ধারণাই তিনি পোষণ করতেন।[১] 'সামাজিক প্রবন্ধে' দেখতে পাওয়া যায় যে জৈন ও শিখদের মত মুসলমানেরাও পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজে কেবলমাত্র এক বর্ণবিশেষরূপেই পরিণত হবে এই আশা তিনি ব্যক্ত করেছেন।[২] হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি হিন্দু বা মুসলমানের উপর দোষারোপ না করে দায়ী করেছেন ইংরাজদের। ইংরাজদের বিভেদ সৃষ্টির এই প্ররোচনায় বিচলিত না হতে এবং মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষাভাব না রেখে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিষ্পত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।[৩] তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্নে'

ঘটাইয়াছে তাঁহার আষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে অঙ্কিত হিঁদুয়ানি। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি এই হিঁদুয়ানির ভিতরে রক্ষণশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতা খুব বেশী ছিল না। [পৃঃ ৬৯-৭০]—বাঙ্গলা সাহিত্যের একদিক, ৩য় সংস্করণ [১৩৬৭]—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য মতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম 'উ ও ইয়ে হ্যায়' আমার বোধ হইল যেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে নির্গত হইল।—সামাজিক প্রবন্ধ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ [১৯৩৭]—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬।

২। জৈন ও শিখদিগের যেমন সাধারণ হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কালে এখনকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।—ভূদেব রচনা সম্ভার, ১ম প্রকাশ ১৩৬৪—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ১২।

৩। কিন্তু হিন্দু মুসলমান ভেদরক্ষা করিবার এবং তাহা বর্ধিত করিবার অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার, কখন স্পষ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষবীজ বপন করিয়া দিতেছেন। [পৃঃ ১৩]···কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করে এবং হিন্দু যখন সেই আদরে ভুলিয়া যায় তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। এইরূপে ঐ সকল ইংরাজদিগের কখন এদিকে কখন ওদিকে ঝোঁক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িতে পারে।···ঐ সকল ইংরাজ, মুসলমানের আদর যতই করুন, মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা

তিনি সবক্তগীনকে উন্নত মহান আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন। পুনশ্চ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী শিবাজী আওরঙ্গজেব কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে অঙ্গুরীয় বিনিময় করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন লেখকের রচনায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এমন উদারতা লক্ষ্য করা যায় না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন ও ধর্মপ্রণালীর মূল ও শ্রেণী বিভাগ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগতের প্রশ্ন সমূহের সমাধান যাতে পাওয়া যায় তাকেই ধর্মশাস্ত্র বলে। এই কারণেই দেশ-ভেদে ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন।[১] পৃথিবীর ধর্মপ্রণালীসমূহ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রাকৃতিক পর্যালোচনার উপর ভিত্তিশীল প্রাকৃতিক ধর্মে পরব্রহ্ম নির্গুণ ও জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়। এই ধর্মের উদাহরণ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম। অপরপক্ষে, ভাব পর্যালোচনা হতে সৃষ্ট ভাবমূলক ধর্মে পরব্রহ্ম সগুণ ও ভক্তিই মুক্তির উপায়। এই ধর্মের উদাহরণ ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম।[২]

বলুন, আর পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন—তাহাতে হিন্দুদিগের কোনমতেই ঈর্ষা করা বৈধ নহে। ঈর্ষা করিলেই উহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। [পৃঃ ১৪—১৫]—ভূদেব রচনাসম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ—১ম প্রকাশ, ১৩৬৪—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

১। মানুষ এই বাহ্যজগতের এবং তাহার নিজের অন্তর্জগতের সম্বন্ধে মনে মনে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত গ্রন্থের নাম ধর্মশাস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের ভিন্ন ভিন্নরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।—ভূদেব রচনা সম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪]—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ৩১।

২। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদয় দুভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ধর্মপ্রণালীর মূল প্রকৃতির পর্যালোচনা। এইগুলিকে প্রকৃতিমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম বলা যায়। অপর কতকগুলি মনুষ্য-মনের ভাব পর্যালোচনা হইতে সম্ভূত। এইগুলিকে ভাবমূলক বা ভাবিক বলা হয়। ...প্রাকৃতিক ধর্মে পরব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ দয়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের ভাবসকল আরোপিত হয় না। ভাবমূলক ধর্মে পরব্রহ্ম সগুণ—অর্থাৎ মনুষ্য হৃদয়ের যাবতীয় পরস্পর সাপেক্ষভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক ধর্মে জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্মে ভক্তিই মুক্তির উপায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মনেতাদের পর্যালোচনা কালে দেখা গিয়েছে যে ব্রাহ্মসমাজে রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে রামানুজের আপেক্ষিক অদ্বৈতবাদে পথ পরিবর্তন করেছে।[১] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কালে রামমোহনের যুগ অতীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রামানুজ, রামানন্দ প্রভৃতির নির্দেশিত পথ অবলম্বনকেই তিনি হিন্দুদের চিত্তের দুর্বলতার জন্য দায়ী করেছেন।[২] অর্থাৎ তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন শঙ্করবাদ ও স্মার্তচর্চায় বিশ্বাসী। তাঁর সংরক্ষণপন্থী মন আর্যধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং বিশ্বের সর্বজাতির উপযোগী বলে ঘোষণা করেছে।[৩] সমাজের উপর ভিত্তি করেই ধর্মের উৎপত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মতবাদ খণ্ডন করে তিনি 'সামাজিক প্রবন্ধে' বলেন যে হিন্দুধর্মের উৎপত্তির পিছনে সমাজের কোন স্থান নেই। বস্তুতঃ বলা যায় ধর্মের উপর নির্ভর করেই সমাজ গড়ে উঠেছে এবং হিন্দু শাস্ত্রের এই প্রতিপাদ্য বিষয়।[৪] ধর্মকে তিনি সুখের আকর বলে স্বীকার করেননি। বরং ধর্মের পথে দুঃখকষ্ট,

প্রাকৃতিক ধর্মের দৃষ্টান্তস্থল হিন্দু ও বৌদ্ধ, ধর্ম, ভাবমূলক ধর্মের দৃষ্টান্তস্থল খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম। —ভূদেব রচনাসম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪]—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ৮০-৮১।

১। তৃতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ] দ্রষ্টব্য।

২। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করবাদ ও স্মার্তচর্চা যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদি বিখ্যাত দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত ভক্তি মার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে, ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্বল্য অনুভূত হইতেছে।—ভূদেব রচনাসম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪]—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ৮২।

৩। আর্যধর্মের অপেক্ষা উদারতর ধর্ম মনুষ্যের মধ্যে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এ ধর্ম কোন একটি বাক্যে অথবা কোন ঘটনাবিশেষের প্রতি প্রতীতি জ্ঞাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বন্ধ নহে। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা, অধিকারভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে পারে।—ভূদেব রচনা-সম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪] প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ১৭১।

৪। আমাদের শাস্ত্রের মত ভিন্নরূপ। পশুদিগের এবং মনুষ্যদিগের সংঘ জন্মিলে, ধর্মের ভাবটি প্রকটিত হয় মাত্র, কিন্তু সমজ বা সমাজ ঐ জ্ঞানের মূল হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাবপদার্থ জন্মে না। —ভূদেব রচনাসম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪] প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ২৩৪-৩৫।

চিন্তা, পরিশ্রম প্রভৃতি অপরিহার্য উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন,—'অতএব প্রীতিপ্রদ সুখ মঙ্গলকর ধর্মের চিরসহচর না হইয়া বস্তুতঃ তাহা হইতে দূরগত বস্তু। ধর্ম করিলেই সুখ হয়, যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ধর্মব্যবহারের প্রবর্তনার জন্য অলীক প্ররোচনা প্রকাশ করেন মাত্র। কষ্ট এবং চিন্তা এবং সংযম এবং পরিশ্রম এবং অনবধাবনতা ধর্মকার্যের নিত্য সহচররূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।[১] এইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে' ধৃতরাষ্ট্রের 'কি দিবে তোমারে ধর্ম'-এর উত্তরে গান্ধারীর 'দুঃখ নব নব' এবং—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু

মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—

ধর্মেই ধর্মের শেষ।[২] এই উক্তির অপরূপ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' [১৮৮২] ও 'আচার প্রবন্ধে'র [১৮৯৪] বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখকের প্রাচীনধারার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে নারীজাতির গৃহধর্মের শিক্ষার কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন, বিদ্যালয়গত শিক্ষার কথা নয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। তেমনই বহু প্রবন্ধে প্রগতির বিরুদ্ধে, তার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র 'বাল্যবিবাহে' তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, 'বহুবিবাহে' বহুবিবাহের সমর্থনই প্রকাশ পেয়েছে এবং 'বৈধব্যব্রতে' বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে সাংসারিক পবিত্রতা বৈধব্যরীতি পালনের দ্বারা রক্ষিত হয়। সেইকারণেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টাকে তিনি বিদ্যাসাগরের 'চাঁদে কলঙ্ক'[৩] বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর হিন্দুধর্মের রীতির এই সংরক্ষণ-শীলতার জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যার আলফ্রেড ক্রফট তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"He was "Hindu of Hindus in all that concerned the regulation of his own life and doctrines of his

১। ভূদেব রচনাসম্ভার, সামাজিক প্রবন্ধ [১৩৬৪] প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ২৩৬—দ্রষ্টব্য।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড [১৩৬৮] পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৫২৫-২৬।

৩। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ [১৯০৫]—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

religion"[১] 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধে' তিনি নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন একথা বললে সম্পূর্ণ বলা হবে না। বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থের প্রাচীন শাস্ত্রনীতি কিভাবে পালন করা উচিত সে কথাও প্রকাশ করেছেন বলা যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আর একটি প্রধান বক্তব্য এই যে মাতৃমূর্তির সঙ্গে ভারতভূমির কোন পার্থক্য তিনি দেখেননি এবং এইভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বলা যায়। 'পুষ্পাঞ্জলী'তে [১৮৭৬] দেখা যায় যে ব্যাসদেব যখন প্রশ্ন করলেন যে,—'ইনি কোন দেবী' ?[২] তখন সেই প্রশ্নের মৌখিক কোন উত্তর না দিয়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবকে তীর্থ দর্শন করাতে কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারাবতী হয়ে কুমারিকা দিয়ে কামাখ্যায় উপনীত হয়ে অর্থাৎ পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করে বললেন,—'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শন প্রাপ্ত হইলে।'[৩] অর্থাৎ ভারতবর্ষই এই ধ্যানের ধন দেবীমূর্তি ও তীর্থপর্যটনের মধ্যেই তাঁকে প্রদক্ষিণ করা হয়। 'আনন্দমঠে'র প্রথম ভাগের একাদশ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের দ্বারা মহেন্দ্রকে দেবীমূর্তির ব্যাখ্যায় মাতৃমূর্তির দর্শনের সঙ্গে এইভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমন মনে করা অযৌক্তিক নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের এই আদর্শকে গ্রহণ করে কেবল মাত্র হিন্দুধর্মের পরিবর্তে হিন্দু জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'আনন্দমঠে' রূপদান করেছেন।[৪]

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা উপন্যাস বলে খ্যাতিলাভ করেছে। অনেকের মতে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের বিবাদকালে

১। সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী, ১ম সংস্করণ [১৯১১] কাশীনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য।

২। ভূদেব রচনাসম্ভার, পুষ্পাঞ্জলি, ১ম প্রকাশ [১৩৬৪] প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ; পৃঃ ৩৭৩।

৩। " " " " " পৃঃ ৪৩২।

৪। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী বলেন,—ভারতভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। পুষ্পাঞ্জলির প্রকাশ ১৮৭৬ সালে, 'আনন্দমঠ' রচনার অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই এ ক্ষেত্রে 'পুষ্পাঞ্জলি' কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন।—ভূদেব রচনাসম্ভার, সংস্কারবাদী ও সংস্কারক [১৩৬৪] প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ; পৃঃ ।৵০।

ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতিনীতির নিন্দার যে প্রণালী বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, সেই পদ্ধতির সঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্রের পরিচয়ই হয়ত এর জন্য দায়ী। একাদশ অধ্যায়ে 'আগড়পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ' ও বিশেষতঃ বিংশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদানুবাদ ও গোলযোগের সঙ্গে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত 'দুর্গামঙ্গলে'র [১৮১৯] 'কঙ্কালীর অভিশাপে'র অভূতপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'নারীগণের পতিনিন্দা'র সঙ্গে প্রমদা ও মোক্ষদার কথাবার্তার সাদৃশ্য ও লক্ষণীয়।[১] আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচা একটি পাষণ্ড চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গলেও ভাঁড়ু দত্ত একটি পাষণ্ড। ইতিপূর্বে আর কোন চরিত্রে এমন বিচিত্র বিকাশ দেখান সম্ভব হয়নি। ভাঁড়ু দত্ত শঠতার দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। কিন্তু পরিণামে তাকে ফলভোগ করতে হয়। ঠকচাচার জীবনেও শঠতাই ছিল অবলম্বন। কিন্তু তাকেও পরিণামে শাস্তি পেতে হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতির সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর শ্লেষ ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্ত হয়েছে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজীদের মধ্যে অনেকেরই আন্তরিকতার পরিবর্তে বাহ্যিক আড়ম্বরই প্রধান ছিল। প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরা দুর্গাপূজা করতেন, আবার সমাজের উপাসনাতেও যোগ দিতেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য় এদেরই আক্রমণ করে তিনি বলেন ঈশ্বরের কাছে তাদের এই চাতুরী নিস্ফল এবং খৃষ্ট ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হওয়ার উপক্রম করছে।[২] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের তৎকালীন অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন বলে তিনি তাঁকে 'পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফার্ষ্ট' নামে অভিহিত করেছিলেন। মাঘোৎসবে অভ্যাগতদের জনারণ্য ও সমাজের সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় উপাসকদের বিরলতা তাঁর দৃষ্টি অতিক্রম

১। আলালের ঘরের দুলাল, ভূমিকা, ৩য় সংস্করণ [১৩৬২]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত. পৃঃ ॥০-॥৴০।

২। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসব হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মায়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্যভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না, ক্রমে খ্রীশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্ছে।—হুতোম প্যাঁচার নকসা, ২য় সংস্করণ [১৩৬৫] —কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃঃ ৪০

করেনি।[১] অধিকাংশ ব্রাহ্মের কথায় এবং কাজে কতখানি পার্থক্য তারই ব্যঙ্গচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'য় 'কলকাতা' অংশে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে সাধারণের ধর্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত আসে ও আলোড়নের সূত্রপাত হয়। Malthus-এর Essay on Population এবং Lyell-এর Principles of Geology-র সূত্র ধরে ডারউইনের Origin of Species প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। বেন্থাম, মিল প্রভৃতি মনীষীরা তর্কশাস্ত্রের দ্বারা পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসে যে ভাঙন ধরিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কারে তাতে জোয়ারের তীব্রতা জাগে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হার্বার্ট স্পেন্সর Synthetic philosophy গ্রন্থের সূত্র রচনা করে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছত্রিশ বছরের অধ্যাবসায়ে দশখণ্ডে বইটি সমাপ্ত করেন। এর ফলে সমাজ, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব সংস্কাবের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চার্লস লায়েলের Antiquity of Man, আর্নেষ্ট রেনানের Life of Jesus, টমাস হাক্‌সলির Man's place in Nature এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ওয়ালেসের Theory of Natural Selection ও ডারউইনের Descent of Man প্রকাশের পর পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ভারত ও বিশেষ করে বাঙ্গালা তখন ইংরাজি শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করার এক অদম্য আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে এদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। সুতরাং পাশ্চাত্যের পূর্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে, বিপ্লব ও ধর্মসম্বন্ধে সংশয়ের এই ঢেউ এ দেশকেও প্লাবিত করতে বিলম্ব করল না। ইতিপূর্বেই এই ভাবধারার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে রামমোহনের বিদ্রোহে ও ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠায়। এখন সেই মনোভাব

১। আর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফার্ষ্টের বাড়ীতে বছর বছর যে একটা অন্ন-ক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েছি, ভালো কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু বুধবারে উপাসনার সময়ে সমাজে কেবল জন দশবারোকে চক্ষু বুঁজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত তাজিয়া পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তারা বোধ হয় পোশাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল।—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, ২য় সংস্করণ [১৩৬৫] কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃঃ ১০৮।

দুকুল প্লাবিত করল। অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন বহু লেখকের রচনায় এর আভাস পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন যুক্তিবাদী। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তাঁর উপর পড়লেও যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধন করে তিনি হিন্দু-ধর্মের নবতম ব্যাখ্যা রূপায়িত করেন। কাহারও কাহারও মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সংশয় থাকলেও মানবজীবনকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি এবং সেই কারণেই তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় হয়েছিল **August Comte**-এর প্রত্যক্ষ মানব ধর্মবাদ।[১] তাঁর তিন শ্রেণীর উপন্যাসের, দ্বন্দ্বহীন অনুরাগাত্মক, প্রণয়দ্বৈধমূলক মানসিক দ্বন্দ্বাত্মক এবং দেশপ্রীতিমূলক উপদেশাত্মকের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেণীতেই আধ্যাত্মিক মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'আনন্দমঠ,' 'দেবীচৌধুরাণী,' ও 'সীতারাম' এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই উপন্যাসগুলি রচনার সময় তিনি অনুশীলন করেছিলেন ভগবদগীতা ও মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রের। সেই কারণেই গীতার ধর্মের আশ্রয়ে নিষ্কাম কর্মের ছায়াতলে লেখকের পরাধীনতার বেদনা ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসগুলিতে।[২] তিনটি উপন্যাসেই বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব চরিত্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'আনন্দমঠে' আদর্শ-বাদ অনেক সময় বাস্তবতাকে অতিক্রম করেছে। 'দেবী চৌধুরাণী' এইরূপ বাস্তবতা বিরোধী নয়। 'সীতারামে'র প্রতিপাদ্য বিষয়ই ধর্মতত্ত্ব। চরিত্রগুলি এই ধর্মকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা অনুপ্রাণিত সংশয়বাদী বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, নিজ মতবাদ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। চৈতন্যদেবের যে ভক্তিভাবধারা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জনমনকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল তিনি তাকে অস্বীকার করেছেন। এই কারণেই 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ

১। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে একরূপ নাস্তিক হইয়াছিলেন—অর্থাৎ এই জগৎ ও জীবনের বাহিরে, ইহার ঊর্ধ্বে ঈশ্বর নামক সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও ন্যায়বান কোন নিয়ন্তা আছেন, সে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, অথচ মনুষ্যজীবনকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই, এবং এই জীবনকেই সার্থকতা দান করিবার জন্য একটি দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি **August Comte**-এর প্রত্যক্ষ মানব ধর্মবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস [১৯৫৫] মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৯-১০।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সংস্করণ—সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৩ দ্রষ্টব্য।

মহেন্দ্রকে বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নয়, 'নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের' অনুসরণে 'অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্মের' লক্ষণযুক্ত মাত্র এবং সেইকারণেই অর্ধেক বৈষ্ণবধর্ম ও দেশের পতনের কারণস্বরূপ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম কেবলমাত্র প্রেমময় নয়, শক্তিময়ও।[১] প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, এই বিদ্রোহ সে সময় সহজসাধ্য ছিল না। 'আনন্দমঠে' বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সন্তানেরা বৈষ্ণব হলেও তারা শক্তির পূজারী। সেই কারণেই মঠে 'মা'-এর তিন অবস্থার মূর্তি স্থান পেয়েছে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রগানের মধ্যে দেশমাতার শক্তিসাধনাই মূর্ত হয়েছে। সন্তানেরা উপাসনা করে বিষ্ণুর, পূজা করে শক্তির। আবার এমন অনেক উক্তি বঙ্কিমের রচনায় দেখতে পাওয়া যায় যা কেবল কোন ধর্মনেতার পক্ষেই বলা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছিলেন যে, মায়া কাটাবার ক্ষমতা কারও নেই। যে মায়া কাটিয়েছে বলে, সে হয় মিথ্যা বলে, নয় তার মায়া কোনদিনই ছিল না।[২] এর সঙ্গে 'দেখুন! দেখুন! আপনিও মহামায়ার দুর্ধর্ষশক্তির কাছে হার মানিলেন।'[৩] তোতাপুরীকে লক্ষ্য করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই উক্তির মধ্যে দিয়ে সকলেই মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ, এই চিরন্তন সত্য প্রকাশের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামমোহন যে মায়াবাদকে বহুস্থলে

১। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুকরণে যে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা, দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। ...চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়।—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ—আনন্দমঠ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ—বসুমতী সাহিত্যমন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩৬।

২। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখনই ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি।—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ—আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১৫।

৩। রামকৃষ্ণের জীবন (১৯৪৭) রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ৪২ ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[১] সেই মায়াবাদ দ্বারাই তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ভগবদগীতার নিষ্কাম ধর্মই 'দেবীচৌধুরাণী'র মধ্য দিয়ে মুখ্যতঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। 'প্রফুল্ল'র মধ্য দিয়ে মহাশক্তির রূপকেই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যে মহাশক্তির বিকাশ কেবল স্নেহপ্রেমের মধ্য দিয়ে নয়, শক্তির মধ্য দিয়েও। গীতার নিষ্কাম কর্মের উপদেশ শুধু পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষভাবেও শুনতে পাওয়া যায় ভবানী পাঠকের মুখে—'ধর্মাচরণে সুখ্যাতি-অখ্যাতি খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সুখ্যাতি কল্পনা করিলেই কর্ম আর নিষ্কাম হইল কই? যদি তুমি অখ্যাতির ভয় কর তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরেব ভাবিলে না, আত্মবিসর্জন হইল কই?'[২] কর্মের যে ছোটবড় নাই এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই লেখক করতে চেয়েছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে সেই কারণেই বহিঃজগতের শক্তিসাধনা থেকে প্রফুল্ল ফিরে এসেছে গৃহস্থাশ্রমের গৃহ ধর্মে। পরমহংস যেমন বলেছিলেন যে, মন মুক্ত থাকলে সংসার বাঁধন হয়ে ওঠে না[৩] বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে তেমনই বলেছেন যে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত বলে প্রফুল্লর কাছে গৃহধর্ম কঠিন হয়ে ওঠেনি। কারণ সংসারেই সে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হয়েছিল।[৪] গীতার বাণী প্রতিষ্ঠাই 'দেবী চৌধুরাণী'র উদ্দেশ্য।

'সীতারাম' রচনার মধ্যেও যে গীতার নিষ্কাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুখবন্ধে গীতার শ্লোকসমষ্টি উদ্ধৃতির মধ্য

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ (উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়-রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ) দ্রষ্টব্য।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ—দেবীচৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ বসুমতী—সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৪৭ দ্রষ্টব্য।

৩। রামকৃষ্ণের জীবন [১৯৪৯] রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ১৬৫ এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ—উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়—রামকৃষ্ণ ও তাঁহার—শিষ্যবর্গ-দ্রষ্টব্য।

৪। এসকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লর পক্ষে আশ্চর্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, দেবী চৌধুরাণী—৩য় খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৭৫

দিয়ে। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য সফল হয়নি সম্পূর্ণ পরিমাণে। তবে ছোটবড় চরিত্র গুলির সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ তিনি করেছেন এবং এরই মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ক্ষুদ্রবৃহৎ ইত্যাদি সকল কিছু বর্ণনার মধ্য দিয়েই মহত্তের পরিকল্পনায় শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য।[১] এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নিয়তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল ও 'সীতারামে'র শ্রী দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র। গীতার মর্ম উপলব্ধি করার ফলে প্রফুল্ল গৃহধর্মকেই অবশেষে গ্রহণ করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিল। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা দিকভ্রষ্ট শ্রী অবশেষে জয়ন্তীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে একনিষ্ঠ থাকায় সীতারামের গৃহধর্ম আকাঙ্ক্ষা হল প্রতিহত। এরই ফলে সীতারামের পতনও হয়ে পড়ল অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতির চিত্রাঙ্কন এই উপন্যাসের আর এক বৈশিষ্ট্য। এমন অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসে এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছাড়া সাময়িককালে আর কোন লেখকের রচনায় পাওয়া বিরল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেকাংশে স্বচ্ছদৃষ্টি হয়েও প্রচলিত নীতি ও সংস্কার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে রোহিনীর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে 'অকারণ, অহেতুক, জবরদস্তি অপমৃত্যুর' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শ'কেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[২] 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর পরিণতি সুনীতিরই প্রতিষ্ঠা করে। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরোক্ষে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছে মনে হয়। 'কপালকুণ্ডলা'য় ভবানীর সেবাইত অধিকারী ও কাপালিকের শক্তিপূজার বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করে বামাচারী সাধকের ভ্রান্তি প্রতিপাদিত হয়েছে।

১। The supreme artist is not he who reproduces the common place and the trivial, but who gives bodily forms to the noblest capacities of man, to the thought which wanders through eternity, to the will which breaks the way through every obstacle to the love that triump over death.—Types of Tragic Drama by C. E. Vanghan, pages 9-10.

এই উক্তিটি 'সীতারাম' সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

২। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ১৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য গদ্যগ্রন্থের তিনশ্রেণী[১] —ব্যঙ্গাত্মক ও সরস, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমালোচনা বিষয়ক এবং দর্শন ও শাস্ত্রচর্চা বিষয়কের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত 'কৃষ্ণচরিত্র' ও ধর্মতত্ত্বে' [অনুশীলন] ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর আরও কয়েকটি বিশিষ্ট মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ধর্ম ও আচারের বিশেষ কোন পার্থক্য নির্দেশ করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্ম এবং আচারকে অভিন্ন অর্থে দেখেছেন। ভূদেবের রচনাতেও আচারের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন আচারনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এই অভিন্নরূপের মর্যাদা দেননি। তাঁর 'ধর্মব্যাখ্যা'য় কোথাও আচারের কোন স্থান নেই। তাঁর মতে 'সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের নাম ধর্ম'।[২] অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' সমস্ত বৃত্তির সমন্বয়ের আদর্শ রচনা করেন। তাঁর মতে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা ধর্ম ও না করা অধর্ম। প্রকৃতি যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্ট বিধান, সুতরাং এর বিরুদ্ধে প্রার্থনা ফলহীন এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যা সংঘটিত হয় তার জন্য প্রার্থনা করাও নিরর্থক। সেইকারণে তাঁর ধর্মদর্শনে ভক্তির স্থান নেই। বঙ্কিমের ধর্মদর্শনে ভক্তিরও স্থান আছে। তিনি বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যবিধানের সঙ্গে জ্ঞান, চিত্তরঞ্জন, শরীর ইত্যাদি বৃত্তিসমূহেরও অনুশীলন করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, অনুশীলনী, যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতীয় ভক্তিধর্মের উপর। এই কারণেই তাঁর আদর্শ অধিক গ্রহণীয় হয়েছে। ভারতীয় ভক্তিবাদ বা ভগবৎ দর্শনের উপর ভিত্তি করে তিনি পাশ্চাত্যদর্শনকে প্রচার করেছিলেন। ভগবদভক্তি প্রাণের উপর বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের কায়া রূপ গ্রহণ করেছে। 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে' তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমস্ত অনুশীলনের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সার্থকতা লাভ করেছে। তিনি ধর্মের যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন সেই তত্ত্বকে, সেই অনুশীলন প্রাপ্ত ফলকে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের মধ্যে

১। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সংস্করণ—সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৩-০৪ দ্রষ্টব্য।

২। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ১২৪।

রূপায়িত করে সকলের সামনে এক বাস্তব আদর্শস্থাপনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[১] নিছক ধর্মব্যাখ্যা না করে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর আদর্শ ধর্মরূপ তিনি সাধারণের চোখে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন হতে পৃথক এক নিরালম্ব তত্ত্বরূপে তিনি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। প্রত্যক্ষ জাগতিক বিধানে মনুষ্যত্ব বিকাশেই তিনি সত্যধর্ম প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন বলে হিন্দুধর্মের সকল তত্ত্বেরই সারবস্তুর সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছেন বলা যায়।[২] রামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিল। তাঁর মতে শাক্যসিংহ বা ঈশার চেয়ে রামচন্দ্র উন্নত আদর্শ হলেও শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় নিষ্প্রভ। এই কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের তত্ত্ব জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখানে তিনি এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মের আনন্দ, উপনিষদের ধর্মের সৎ ও চিত এবং বৌদ্ধধর্মের সারভাগ গ্রহণ করে সংগঠিত। সেই কারণেই এই ধর্ম জাতীয় ধর্ম হওয়ার উপযুক্ত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন বিধিনিয়মের পরিবর্তনও আবশ্যক। এর মধ্যে ধর্মের বিরুদ্ধতা কিছু মাত্র নেই। সেই কারণেই ধর্মতত্ত্বের পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'তিন চারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন,

১। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'তিনি যে কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুলচিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বরূপে পাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহাকেই সজীব শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহে তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল।—আধুনিক সাহিত্য [১৩৫৫] কৃষ্ণচরিত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৬-৭৭।

২। এ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার বলেন,—'মানুষের বাস্তব প্রকৃতির মধ্য দিয়াই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ খুঁজিতেছে, তাহাকে তিনি সত্যকার ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।...এজন্য হিন্দুধর্মের কোন একটি তত্ত্বকে সত্য বলিয়া অপর সকলকে পরিহার করেন নাই।'—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ [১৩৬৩] মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ২৩।

তবে তাঁহারাই বলিতেন 'না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতা-চরণ হইবে।' ইতিপূর্বেই 'আনন্দমঠে'র আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবদের প্রেম ধর্মের পরিবর্তে শক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠতা শ্রেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্বে' বাহুবলের স্থান দেওয়া হয়েছে। 'হে মনুষ্যস্বরূপ, অন্যায়ের প্রতি যে পবিত্র ক্রোধ তাহা আমাদের মনে সঞ্চারিত কর।' প্রাচীন আর্য ঋষিদের এই প্রার্থনা এবং 'দুর্বলের পক্ষে ধর্মাচরণ অসাধ্য', 'গরীবের কোন ধর্ম নাই' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধর্মক্ষেত্রে বাহুবলকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনায় বাৎসল্যরস এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। অর্থাৎ কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতকে পার্বতীর ছেলেখেলার বর্ণনার মধ্যেও কখন কখন এই রসের পরিবেশন দেখা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৈনন্দিন সাধারণ মানবজীবনের বর্ণনায় সর্বপ্রথম এই রসের পরিবেশন প্রবর্তন করে ধর্মতত্ত্বের বর্ণনার সঙ্গে মানবজীবনের পার্থক্য দূর করেন। এরই উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় 'কণ্ঠমালা'য় শম্ভু ও বিনোদ, 'দামিনী'তে পাগলী, 'মাধবীলতা'য় পিতম ও ইন্দ্রভূপ, 'রামেশ্বরের অদৃষ্টে' রামেশ্বরে এবং 'পালামৌ'তে নিজের মধ্যে।[১] একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও রচনার মধ্যে এমন কুশলতা দেখা যায় না।

রমেশচন্দ্র দত্তের বহু রচনার মধ্যেও হিন্দুধর্মের প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সংসার' ও 'সমাজ'। 'সংসারে' বিধবাবিবাহ ও 'সমাজে' অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন ধ্বনিত হয়েছে। যে সময় সংস্কারবাদী ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন জানাতে পারেননি এবং যার ফলে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত হল,[২] সে সময়ে রমেশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসের বিষয় বলতে হবে।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সংস্করণ—সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৩ দ্রষ্টব্য।

২। তৃতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ] দ্রষ্টব্য।

'সংসারে' অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে পাঠকদের অভিভূত করে শরৎ ও সুধার মিলনের মধ্য দিয়ে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। 'সমাজে' রমাপ্রসাদ সরস্বতী অপূর্ব শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এবং হিন্দুধর্মের বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানের উচ্ছেদসাধনই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। দেবীপ্রসাদ ও সুশীলার অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে লেখক স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে সংস্কারের প্রয়াসী হয়েছেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাবের ও অসম বয়সের বিবাহের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম শ্লেষও মাঝে মাঝে তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায়।[১] অবশ্য কখন কখন বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও হিন্দুসমাজের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচলিত সুনীতির আদর্শকে তুলে ধরেছেন। 'মাধবীকঙ্কনে' বিবাহতীত প্রেমের চেয়ে দাম্পত্য বন্ধনের গুরুত্বকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দ ও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলার মধ্যে এই শিক্ষাই রূপান্তরিতভাবে দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক হলেও 'সংসারে' বিধবাবিবাহের মধ্য দিয়ে নিয়তির বিধানে স্বামীহীনার পক্ষে নতুন স্বামী গ্রহণের সমর্থন জানিয়ে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাসাহিত্যের অনেক লেখকের রচনার মধ্যে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি বিরূপ মনোভাব ফুটে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তত্ত্বপ্রচারের দিক দিয়ে নয়, নিছক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই মাইকেল মধুসূদনের রচনায় বিদ্রোহ যেমন উদ্ধত ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এমন আর আগে দেখা যায়নি। তাঁর রচনায় প্রবীণ ও নবীন ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের প্রয়াস নেই, রয়েছে আঘাতদ্বারা প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীকে ভেঙ্গে ফেলার দাবী। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রথম সর্গেই ভারতীর করুণাপ্রার্থনায় যদিও বার বার বাল্মিকীর নাম ও

১। চঞ্চলহৃদয়া, প্রখর নয়না, চতুরা, রূপলাবণ্যসম্পন্না অমলাকে বোধ হয় অনেক পাঠক মহাশয়েরই মনে ধরিবে। তবে কৈবর্তের মেয়ে বলিয়া যদি কেহ ঘৃণা করেন, আর বৃদ্ধস্বামী বর্তমান। বিধবা হইলেও বরং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া কোন রকম চেষ্টা দেখা যাইত। কিন্তু বুড়া এখনও মরে নাই।—রমেশ রচনাসম্ভার, প্রথম প্রকাশ (১৩৬৪) বঙ্গবিজেতা—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৫-৮৬।

উদাহরণ উচ্চারিত হয়েছে,১ এবং অনুরূপ পথ অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাল্মিকীর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশই দেখতে পাওয়া যায়। বরং বলা যায় যে তিনি মনীষী নিট্‌শের মত এমন এক মহামানবের কল্পনা করেছিলেন, যিনি লোকভয়, ধর্মভয় ইত্যাদি দ্বারা শাসিত হয়ে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে নত করতে চান না। এমন মহামানবতা রামের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু রাবণের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সাধারণতঃ কাব্য রচিত হত শত্রুপক্ষ-জয়ী শক্তিমানের প্রশস্তি জানিয়ে। ফলে অনেক সময় প্রায় একই রকম আচরণের জন্য যেখানে পরাজিতের নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে, সেখানে অনুরূপ আচরণের জন্য জয়ীর স্তুতি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সুভদ্রাহরণকালে যেহেতু অর্জুন যাদবসেনাদের পরাজিত করেছিলেন, সেই কারণেই সুভদ্রার অর্জুনকে বরণ করার ইচ্ছা ছিল এই ব্যাখ্যা দিয়ে পার্থকে বীররূপে মহাভারত-কার বন্দনা করেছেন। রামের কাছে রাবণ সবংশে নিহত হয়েছিলেন বলে রাবণের সীতাহরণের মধ্যে পাপ ও কলুষতার বর্ণনাই কেবল রয়েছে, বীরের শক্তিপূজা নেই। বোধ হয় এই মনোভাব দ্বারাই মধুসূদন পরিচালিত হয়েছিলেন। এই কারণেই প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখনীধারণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। কূর্মপুরাণে পতিব্রতা উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে এবং মহপ্রভুও বলেছেন যে বেদপুরাণে বহুস্থানে উল্লেখ আছে যে প্রকৃতপক্ষে সীতাহরণ হয়নি, হয়েছিল মায়াসীতাহরণ। অর্থাৎ পরোক্ষে বলা যেতে পারে যে প্রবল পরাক্রমী রাবণ নিধনের জন্য সীতাহরণ উপাখ্যান রচনা কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র বিশেষ।২ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় দেশবাসীদের কাছে যাঁরা আজন্ম

১। ভারতী! যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মিকীর রসনায় [পদ্মাসনে যেন]
* * *
নরাধম আছিল যে নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।—মেঘনাদবধকাব্য, পঞ্চম সংস্করণ [১৯৫৮] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ১।

২। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদ)—কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সুকুমার সেন সম্পাদিত); পৃঃ ২০৪ দ্রষ্টব্য।

পূজা পেয়ে এসেছেন তিনি তাদের উপেক্ষা করেছেন। প্রতি রচনার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘনাদকে অবলম্বন করে নব্য ইলিয়াড রচনা করার আশাও প্রকাশ পেয়েছে।[১] রাবণের মধ্যে পাপের যে সীমারেখা দেখা যায় মেঘনাদের চরিত্রে তার বিন্দুমাত্রও নেই। সুতরাং শতাব্দীর সংস্কারের বিরুদ্ধে রাবণকে অকস্মাৎ বীর নায়কের মর্যাদা দিলে হয়ত সে ধারণা জনগণের মনঃপূত না হতে পারে, এইজন্য রাবণের পরিবর্তে মেঘনাদকেই তিনি দিয়েছেন নায়কের সম্মান। অবশ্য 'মেঘনাদবধকাব্য' পাঠকালে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এই কাব্যের প্রকৃত নায়ক রাবণ, মেঘনাদ নয়। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি স্পষ্টতঃই জানিয়েছেন যে রাক্ষসপক্ষই তাঁর মনের সকল সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে এবং রাবণ তাঁর মনের মত চরিত্র।[২] এই কারণেই রামায়ণের দুর্ধর্ষ লক্ষ্মণ মাত্র উর্মিলাবিলাসী এবং মেঘনাদবধের সময়ে তাঁর আচরণ ভীরুতার জলন্ত উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের অবতার রাম 'ভিখারী রাঘব' এবং বিভীষণের চরিত্র 'ঘরশত্রু বিভীষণ' প্রবাদকে জলন্ত ও সার্থক করে তুলেছে। অবশ্য স্বজন ও পরজন সম্বন্ধে মতামত আর্য রামায়ণেরই প্রতিলিপি বলা যায়। আর্য রামায়ণের,—

১। I have thrown down the gaunlet, and proudly denounce those whom our countrymen have worshipped for years, as imposters and unworthy of the honours heaped upon them. I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghnad destitute of merit, why ? I shall burn it without a sigh of regret···He was a noble fellow and but for that scroundel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the by if the father of our Poetry had given Ram human companions, I would have made a regular Iliod of the death of Meghnad.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৫ম সংস্করণ [১৯২৫] যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৩২৩ ও ৩২৫।

২। People here grumble and say that the heart of the poet in Maghnad is with the Rakhasas. And that in the real truth. I despise Ram and his rabbles ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination, he was grand fellow.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৫ম সংস্করণ [১৯২৫] যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৪৮৯।

'ন জ্ঞাতিত্বং ন ভ্রাতৃত্বং ন জাতিস্তব দুর্ম্মতে।
প্রমাণাং ন চ সৌহার্দং ন ধর্মদূষক ॥
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপিবা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব চ' ॥১

এই শ্লোকের সঙ্গে ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণকে মেঘনাদের উক্তি,—

'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পর পর সদা।'২ তুলনীয়।

বহু সমালোচকের মতে ট্যাসোর 'জেরুজালেম উদ্ধারে'র এরমিনিয়ার ক্লরিণ্ডার ও গিলডিপের চরিত্রের বীর্য, ইলিয়াডের অশ্বারোহণ পারদর্শিনী কেমিলা ও ইলিয়াডের যুদ্ধসাজে সজ্জিতা আথিনীয়র চরিত্র মধুসূদনকে প্রমীলার চরিত্র অঙ্কণে উদ্‌বোধিত করেছিল। প্রকৃত পক্ষে বীররস ছিল তাঁর প্রিয় বস্তু। সেজন্য দেশীয় ও বিদেশীয় কোন দৃষ্টান্তকেই তিনি উপেক্ষা করেননি। এই কারণেই তৃতীয় সর্গে রণ সাজে সজ্জিতা প্রমীলার চেড়ীবৃন্দসহ লঙ্কায় প্রবেশকালে 'হৈমবতী'র সঙ্গে প্রমীলার তুলনায় এবং 'নৃমুণ্ডমালিনী' নামের মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রভাবও দেখা যায়। এমন কি অনেকস্থানে ভাবাগত সাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন,—

'টলিল কনকলঙ্কা, গর্জিল জলধি
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে,৩

এই দুই ছত্রের সঙ্গে—'চক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ প্রকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥৪ শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শ্লোকটির অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্যণায়। এই বীররস প্রিয়তার জন্য রামের চেয়ে রাবণ ও রাক্ষসেরা কবির বেশী প্রিয় হয়েছে। সেইজন্য রাবণের পরাভব

১। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ১৬৯ দ্রষ্টব্য।
২। মেঘনাদবধ কাব্য, ৫ম সংস্করণ [১৯৫৮] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ৬১।
৩। মেঘনাদবধ কাব্য, ৫ম সংস্করণ [১৯৫৮]—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ২৫।
৪। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা [১৩৬৪]—বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় তন্ত্রের প্রভাব—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ২৬১ দ্রষ্টব্য।

ও সবংশে নিধন পাপের ফল নয়, নিয়তির বিধান। রাবণের উক্তিতেই তার প্রকাশ,—

'কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ?

*　　*　　*　　*

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর।'[১]

ভোগ ও শক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র দেববিজয়ী সুন্দ উপসুন্দের সঙ্গে মেঘনাদবধের রাবণের চরিত্রে সাদৃশ্য অনেকাংশে একই শ্রেণীর বলে বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন তাঁর ধর্মীয় চেতনায় শক্তিসাধনা করেছেন। সেই কারণেই মেঘনাদবধ সম্ভব হয়েছে রামচন্দ্রের অকালবোধনের ফলে এবং শক্তিরূপিনী মহামায়ার মোহিনীমূর্তিই 'তিলোত্তমাসম্ভবে' সুন্দ উপসুন্দের বুদ্ধিভ্রংশ করে ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এমনকি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও ব্যতিক্রম হয়েছে বলা যায় না। কারণ গোপীদের যে প্রেম, সে প্রেমকে সমাজ-ধর্মের পরিপন্থী বলা যায় না। ব্রজাঙ্গনাদের এই প্রেমের সাধনাকে বরং তান্ত্রিক সাধনা নামে অভিহিত করতে পারা যায়। এই গুঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভাগবতে ব্রজাঙ্গনাদের কাত্যায়নীপূজার মধ্যে। সম্ভবতঃ এই কারণেই গোপীদের প্রেম মধুসূদনের কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মিলনের প্রচেষ্টা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। তার সর্বপ্রধান সুস্পষ্ট প্রকাশ 'দশমহা-বিদ্যা'য়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশমূর্তির বর্ণনা সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তবে এই দশমূর্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়নি। শুম্ভনিশুম্ভ বধের সময়ে দেবী এই দশরূপ ধারণ করে বিভিন্ন অসুর নিধন করেছিলেন।[২] পরে

১। মেঘনাদবধকাব্য, প্রথম সর্গ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ২।

২। View of the History, Literature and Religion of Hindus by Ward, pages 7-9. দ্রষ্টব্য।

'কালীকৈবল্যদায়িনী' পুস্তকে তন্ত্রের পথ অনুসরণ করে এই দশমূর্তির ভিন্ন আখ্যা—কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা[১] দিয়ে দশমহাবিদ্যারূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হেমচন্দ্র পুরাণ বা তন্ত্রের এই মতবাদগুলিকে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করেননি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন যে,—'দশ-মহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না, যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিতমতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।'[২] প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নিজের কল্পনার রংয়ে দশমূর্তির পরিবর্তন সাধন করেছেন। 'বগলা' ও 'ষোড়শী' সম্পূর্ণরূপে তাঁর কল্পনাশ্রিত এবং 'মাতঙ্গী', 'ভৈরবী' প্রভৃতিতে কল্পনা ও পুরাণের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানের সংঘাতে ইউরোপের ধর্মজগতে যে আলোড়ন জেগেছিল এবং যার প্রভাব এদেশকেও আচ্ছন্ন করেছিল, তার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই হেমচন্দ্র ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের অনুসরণ করে পুরাণ ও তন্ত্রের দশমহাবিদ্যার দশমূর্তি কালী, তারা, ষোড়শী [রাজরাজেশ্বরী], ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা ও মহালক্ষ্মী [কমলা]র নবতম ব্যাখ্যা দিয়ে 'দশমহাবিদ্যা' রচনা করেছেন, কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণাদ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ছত্রতলে পৃথিবীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ কিরূপে সাধিত হচ্ছে এবং অশুভর স্থানে শুভ কিভাবে আসন গ্রহণ করবে সেই চিত্র অঙ্কনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রথমপর্বের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখান হয়েছে যে পৃথিবীর আদিকালে 'সংহার' মন্ত্রের বশীভূত হয়ে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে হানাহানির ফলে সত্য, শিব ও সুন্দর কিভাবে ধ্বংস-রূপিনী, ভয়ঙ্করী নিরাবরণা কালীমূর্তির পদতলে নিষ্পেশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্বে দেবীর তারামূর্তি ভয়ঙ্কররূপিনী হলেও নিরাবরণা নন, অর্থাৎ মানবজগতে

১। দশমহাবিদ্যা—আর্য সাহিত্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত [১৩০০] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিশিষ্টে 'বান্ধবে' প্রকাশিত সমালোচনা, পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য।

২। দশমহাবিদ্যা—আর্য সাহিত্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত [১৩০০] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন পৃঃ ৵০

জ্ঞানের অঙ্কুর বিকাশলাভ করছে,—'জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে।'[১]

তৃতীয় পর্বে সভ্যতার বিকাশে ষোড়শী মানবহৃদয়ে দাম্পত্যপ্রেমের সঞ্চার করেছেন,—

প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে,
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী রূপিনী।[২]

চতুর্থ পর্বে ভুবনেশ্বরী মূর্তি ভয়ঙ্করী বেশ ত্যাগ করে মানুষের মনে সন্তান স্নেহের সৃষ্টি করেছেন। পর্বানুযায়ী ক্রমে ক্রমে 'জ্ঞান অভয়দাত্রী জীব উদ্ধার কর্ত্রী ও 'ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী রূপিনী"[৩] ভক্তি প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির সঞ্চার, মাতঙ্গী 'প্রীতি তুলি ভবতলে সর্বজীব দুঃখ দলে'[৪] মানবের মনে পরস্পর প্রীতির বন্ধন, ধূমাবতী পারস্পারিক সাহাযে দুঃখক্লেশের লাঘবের প্রবৃত্তি, দরিদ্রদলনীরূপী বগলা দারিদ্র্যকে দলিত করার শক্তি, ছিন্নমস্তা সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধারণ করে নিজ রক্ত পান করে মানুষের মধ্যে পাপকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি দান করেছেন এবং সর্বশেষে মহালক্ষ্মীর অঞ্চলে সকল ক্লেদগ্লানিকে জয় করে মানুষ সুখ ভোগ করতে সমর্থ হয়েছে।

নবীনচন্দ্র সেনের রচনায় সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ভূমিকাতে তিনি পক্ষান্তরে এই মতবাদই প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে যে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, নবীনচন্দ্র সেই ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই কারণেই এই ভূমিকায় গীতার নিষ্কামত্ব বা কামনা নির্বাণের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ তত্ত্বের একতা সাধন করেছেন।[৫] 'রৈবতক'

১। দশমহাবিদ্যা—হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৭।

২। " " " পৃঃ ৩৭।

৩। দশমহাবিদ্যা, আর্য সাহিত্যসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত [১৩০০] হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৮

৪। " " " " পৃঃ ৩৯

৫। শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ভূমিকায় নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরম ধর্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার উদ্দেশ্য।...গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—নিষ্কামধর্ম। এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ।—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ২৪১-৪২ দ্রষ্টব্য।

'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ ও সুভদ্রা এই সমন্বয় ধর্মেরই প্রতীক। মধুসূদন 'মেঘনাদবধে' রামায়ণকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন। নবীনচন্দ্র এই কাব্যত্রয়ে মহাভারতকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' মানবতার আদর্শরূপে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করেছেন এবং নবীনচন্দ্র অখণ্ড মহাভারত স্থাপনে বিপুল প্রয়াসীরূপে কৃষ্ণ:ক উপস্থাপিত করেছেন।[১] কাব্যত্রয়ের শ্রীকৃষ্ণ শ্রেণীসাম্যের উদ্বোধক, যুক্তিবাদী, স্বভাবধর্মের পূজারী এবং জনমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় উদারধর্মের দিশারী। এই কারণেই আর্য অনার্য মৈত্রীবন্ধনে অখণ্ড মহাভারত স্থাপন তাঁর লক্ষ্য। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচীন সংস্কারবাদী ও তৎকালীন শ্রেণীবিভাগের ফলে সম্মান এবং ক্ষমতাভোগী ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি দুর্বাসা। এমন কি দুর্বাসার সহায়তায় বলরামকে অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহপ্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে এবং দুর্যোধনকে বলরামের প্রিয় ও সুভদ্রার পরিণয় সম্বন্ধে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তিনি এই ঘটনাকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য দায়ী করেছেন এবং পরোক্ষে দুর্বাসার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিনাশ হওয়ায় অনার্যেরা শক্তির অধিকারী হবে এবং তাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ব্রাহ্মণেরা লুপ্তগৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু পরিণামে শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হন। অর্থাৎ নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষে অবশেষে নবীন ধর্মসংস্কার বিজয়মাল্য গ্রহণ করে। জরৎকারু, শৈল, বাসুকী প্রভৃতি চরিত্র এই মনোভাবকেই পুষ্ট ও ঘটনাপ্রবাহকে গতিদান করেছে মাত্র। এই কাব্যত্রয়ীতে ইতিহাসের অন্যথা করায় বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তার উত্তরে 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্রের বক্তব্য এই প্রতিপাদ্য স্থাপনেই সাহায্য করে। মহাভারত স্থাপনের এই কল্পনাই পরে অপরূপ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব,' 'ভারততীর্থ' প্রভৃতির মধ্যে এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মহানন্দমঠে' [মহাভারতী কাব্য]।

১। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে অখণ্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস, যে ধর্মের আত্মা তিনি স্বয়ং, বাহুবল ধনঞ্জয় ও জ্ঞানবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,—তাই তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামে কাব্যত্রয়ী অথবা তিন খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ২৩৭।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যগুরুর সম্মান দান করেছেন। বিহারীলালের বিভিন্ন রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'সারদামঙ্গল'। রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙ্গালা গীতিকাব্যের তিনিই পথদ্রষ্টা। অবশ্য এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।[১] তবে তিনি যে গীতিকবিদের পুরোধা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁর কল্পনায় রঙ্গীন গীতিকাব্যগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবপ্রকাশের চেয়ে আলোছায়ার রহস্যময় দিকই বেশী প্রকাশ পায়। একে বাঙ্গালাসাহিত্যের ধর্ম সংস্কৃতি ও সাধনার প্রাচীন প্রহেলিকা বিলাসের[২] চিরন্তন নীতিরই রূপান্তরিত আত্মপ্রকাশ বলা যায়। 'সারদামঙ্গল' নামের মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের জয় ঘোষিত হয়েছে, যদিও সাময়িককালে কোন মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং 'সারদামঙ্গল'কে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীভুক্তও করা যায় না, তবুও 'মঙ্গল'কাব্যসমূহের 'মঙ্গল' শব্দদ্বারা তিনি যে প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয়। সম্ভবতঃ 'সারদামঙ্গল'ই সর্বশেষ 'মঙ্গল' নামধেয় উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা কাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যেও অভিনবত্ব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল প্রসঙ্গে বলেছেন যে,—'সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।'[৩] কিন্তু এই স্বতন্ত্রতা কতখানি লক্ষণীয় সেইটিই বিচারের বিষয়। কবি সারদাকে জননী, প্রেমিকা ও কন্যা নানারূপে কল্পনা করেছেন। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তদের আরাধনায় আরাধ্যা দেবী ইতিপূর্বে জননী ও কন্যার স্থান গ্রহণ করলেও কোন দেবীই প্রেমিকারূপে আবির্ভূতা হননি। হয়ত মানব কবির পক্ষে দেবীকে প্রেমিকারূপে কল্পনা করার এবং শ্রদ্ধার আসন হতে সমশ্রেণীতে আনার সাহসের অভাব ছিল। বিহারীলাল সারদাকে প্রেমিকারূপে আকাঙ্ক্ষার পাত্রী করে সাধারণের ধর্মমনোভাবে যুগান্তর এনেছিলেন বলা যায়।[৪]

১। মধুসূদন যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন পরবর্তীকালে বিহারী লাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ উত্তরসুরীবৃন্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নব নব সাফল্যের নিত্যপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৭।

২। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার ধর্মীয় অবস্থা] দ্রষ্টব্য।

৩। আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল [১৩৫৫]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩০।

৪। বিহারীলালের সারদাকে পার্থিব প্রেমিকারূপে কল্পনার নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা যায়,—

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়ের যে ধারা বাঙালা সাহিত্যে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথকেও তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রথম হতেই যে এক সুনিদিষ্ট, সুস্পষ্টরূপ ধারণ করেছিল এমন ধারণা পোষণ করা ভুল হবে। তাঁর ধর্মমতবাদেও পরিবর্তনের স্তর লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন,—'অবশ্য একথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ চলতি পথিকের নোট বইয়ে টোকার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোন কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি।[১] এই পথ চলার কালে, পথচলার বাঁকে রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বপশ্চিম আচ্ছন্নকারী ধর্মসংশয়ের মেঘমালার পক্ষসঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই বিশেষ ধর্মসাধনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও প্রথম যৌবনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ বেছে নেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন তিনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা ও শিক্ষাই যে তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেছিল এমন ধারণা ভ্রান্ত। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতার পূজারী তাঁর পিতা কেবল পিতামহের মতবাদকেই অস্বীকার করেননি, উপরন্তু পুত্রের স্বাধীন মতবাদকেও বাধার বন্ধনে জড়িত করেন নি। এর ফলে রবীন্দ্র-নাথের স্বাতন্ত্র্যতার জন্য অনেক সময়ে তাঁকে বেদনা পেতে হয়েছে।[২] প্রত্যক্ষ-

গলে গলে বাহুলতা
জড়িমাজড়িত কথা
সোহাগে সোহাগে রাগে গলগল মন।
করে কর থরথর
টলমল কলেবর
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর।—সারদামঙ্গল [১৩৬১] বিহারীলাল চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৭।

১। আত্মপরিচয় [১৩৫৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪২।

২। আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। ...যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্য কখনও ভর্ৎসনা

ভাবে পাশ্চাত্যের ধর্মসংশয়বাদ যে তাঁর মনের উপর ক্রিয়া করেছিল এমন ধারণা করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম যৌবনেই বিলাতে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের Data of Ethics—প্রকাশের পরই [জুন, ১৮৭৯] বইটি পাঠ করেছিলেন।[১] Synthetic Philosophyতে ধর্ম, সমাজ ও অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কার ভাঙ্গনের সূত্রপাত করে স্পেন্সার সংস্কারপন্থী যুবকদের গুরুস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অনুরক্ত।[২] সুতরাং তাঁর উপর স্পেন্সারের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক বলা যায়। ইতিপূর্বেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ইংরাজী শিক্ষার তীব্র উত্তেজনা তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে ধর্মের উপর কোন আস্থাই অক্ষয় চৌধুরীর ছিল না।[৩] তাঁর শিক্ষায় এই মনোভাব প্রকাশিত হত ও ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হত সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তখন নাস্তিকতা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। জেরেমি বেন্থাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং অগষ্ট কমটের নাস্তিক মতবাদকে যুবকেরা বিশেষ সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। এদেশেও তার প্রভাব পড়েছিল। এই ধর্মবিদ্রোহ অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের বেদনার

করতেন না। তিনিই নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতাও আমার ছিল; একথা স্বীকার করতেই হবে। আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েছেন।—মানুষের ধর্ম [১৩৬০]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৬—১৭।

১। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া ষ্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics। সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—জীবনস্মৃতি, বিলাত [১৩৬১]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৯৫।

২। এ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য অনুধাবনীয়,—স্পেন্সর ছিলেন সে যুগের ভাঙ্গনপন্থী যুবকদের গুরুস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের ভক্ত ছিলেন।—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৬।

৩। তখনকার কালের ইংরাজি সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। ...জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোন আস্থাই ছিল না অথচ শ্যামা বিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত।—জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৯৫।

কারণ হলেও যৌবনপ্রত্যুষের বুদ্ধির দম্ভে পারিবারিক ধর্মসাধনাকে উপেক্ষা করে তিনি এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করেছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনায় অর্থাৎ 'প্রক্ষোপনিষদ' রচনার [১৯০৯] পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে এই ধর্মসংশয়ের ফলে ধর্ম বা ভগবদতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে অনুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অনেক সময়ে প্রশ্ন জেগে উঠেছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য বা গীতালীর গভীর আবেগ তৎকালীন রচনায় ধ্বনিত হয়নি। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে ধর্মতত্ত্বের যে সুর শুনতে পাওয়া যায় তাকে কবির অন্তরের বাণী বলা যায় না। এগুলি অনুসরণ বা অনুকরণ মাত্র, ভাবের প্রকাশ নয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী' প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন যে,—'পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।'[২] 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' বিধাতার অপূর্ব শক্তি নিরীক্ষণ করেও তাঁর সন্দেহ দূর হতে চায় না। তাই তিনি প্রশ্ন করেন,—

'এই যে জগৎ হেরি আমি
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
একি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।'[৩] [অনুগ্রহ]

১। তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। ...যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই, তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।—জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয় [১৯৬১]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১০২—০৩।

২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভানুসিংহের পদাবলী, সূচনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১-৭

৩। " " সন্ধ্যাসঙ্গীত, অনুগ্রহ— " পৃঃ ১৮

নানা বিষয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে। প্রাচীন মতবাদকে তিনি দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। জগতের স্রোত কোথায় চলেছে সে তত্ত্ব তিনি জানতে চেয়েছেন,—

'জগৎ স্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই!
যেথায় চলে রবিশশী চলরে সেথায় যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে,
জগৎ স্রোত বয়ে নিয়ে কোন সাগরে মেশে।'[১] [স্রোত]

প্রাণের রহস্য তিনি জানতে চেয়েছেন,—

'যতটুকু বর্তমান তারেই কি বলে প্রাণ
সেত শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।'[২] [অনন্তমরণ]

প্রসঙ্গক্রমে স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কোমল অনুভূতিগুলির পৃথিবীতে উপস্থিতির রহস্য দূর করার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর জেগেছে। এই দুর্দম কোমল অনুভূতির উৎসসন্ধানে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেছেন,—

'এ বল কোথায় পেলে আপন কোলের ছেলে
এত করে টানে।
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।
নৈরাশ্য কভু না জানে বিপত্তি কভু না মানে,
অপূর্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ এ বিশ্বের কোনখান
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন?'[৩] (সিন্ধুতরঙ্গ)

জগতে অহরহ যে রাগিনী বেজে চলেছে কবি তার সুরকারের সন্ধান চেয়েছেন

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রভাতসঙ্গীত, স্রোত— পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৭০

২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রভাতসঙ্গীত, অনন্তমরণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৫৩।

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, মানসী, সিন্ধুতরঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২৪১।

—'ওগো কে বাজায়, কে শুনিতে পায়, না জানি কি মহারাগিনী।'[১] [বিশ্বনৃত্য] সেই কারণেই ধরণীকে তিনি জননীরূপে পেতে চেয়েছেন। কেবলমাত্র মাতৃনামেই সন্তুষ্ট না থেকে সে বিষয়ে আশ্বাস চেয়েছেন,—

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণ মর্মর কণ্ঠস্বর—
'আমি শুধু ধূলি নই, বৎস আমি প্রাণময়ী
জননী তোদের লাগি অন্তর কাতর।'[২] [শূন্য গৃহে]

অবশ্য এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে এই সংশয় ও জিজ্ঞাসা তাঁকে বিধাতা সম্বন্ধে নাস্তিকে পরিণত করেছিল। 'গীতাঞ্জলী,' 'গীতিমাল্য,' 'গীতালি' প্রভৃতির ভাবগভীরতা তাঁর এ সময়ের রচনায় প্রকাশ পায়নি সত্য, বরং অনেক সময় সন্দেহ ও সংশয় আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু ভগবৎতত্ত্ব ও ধর্মসম্বন্ধে তাঁকে সম্পূর্ণ উদাসীন বলা যায় না। এই সময়কে তাঁর মতামত গড়ে তোলার অন্তর্বর্তীকালীন কাল বলা যায়। সেইজন্য অনেক সময়েই অজানাকে জানার আগ্রহ এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়,—

'দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারই মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায় ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।'[৩] [এবার ফিরাও মোরে]

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, সোনারতরী, বিশ্বনৃত্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৪০২

২। " " মানসী, শূন্য গৃহে " পৃঃ ২৫৭

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৪৭৫।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন যে, 'তত্ত্বরূপে' নয় 'অনুভূতিরূপে' তিনি 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনাকালে অনুভব করেছিলেন যে, যা কিছুই সংঘটিত হচ্ছে তা গিয়ে মিলিত হচ্ছে মহামানবে ও সেখান থেকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসছে।[১]

সেই কারণেই মহামানবের কূল তিনি খুঁজে না পেলেও নিজের সঙ্গে তাঁর 'একাকার' ভাব অনুভব করেন,—

'তোমার পাইনে কূল—
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।

*　　　*　　　*

তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার
যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।'[২] (ধ্যান)

সেই সর্বশক্তিমানকে অতিক্রম করার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তিনি অনতিক্রমনীয়। তিনি কাছে থেকেও কাছে নয়, আবার দূরে থেকেও দূরে নয়, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তিনি দুর্নীরিক্ষ্যরূপে বর্তমান রয়েছেন,—

আমি মনে করে যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যতদূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।

১। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন ['প্রভাতসংগীত' রচনাকালে] কি ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়।—মানুষের ধর্ম (১৩৬০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৫।

২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, মানসী, ধ্যান—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩১৭।

চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।[১] (আত্মসমর্পণ)

এই পৃথিবীর মধ্যে নবচেতনায় তিনি জেগে উঠতে চেয়েছেন। বিশ্বজগৎ তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করলে তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করবেন। বিধাতার সঙ্গে তাঁর সম্মিলন হলে সমগ্র জগতের সঙ্গে তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হবে,—

'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।'[২] (বিদায়)

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে মনে হয় যে পাশ্চাত্যের ধর্মসংশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যান্য লেখকদের মত তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে সেই স্রোতে আত্মসমর্পণ করতে পারেননি। এই মতবাদ বার বার তাঁর মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় করেছে, কিন্তু ধর্ম ও ভগবৎ তত্ত্বকেও তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। দুই ভিন্নমুখী স্রোতের আবর্তে তাঁকে সংশয়ের দোলায় বার বার দুলতে হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর রচনাসমূহের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির ভাবাবেগ রূপ গ্রহণ করতে পারেনি এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত ধর্মসংশয়ের ছায়া আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই কারণেই তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে ধর্মের যে গভীর তত্ত্ব অপরূপ হয়ে উঠেছে, উনবিংশ শতাব্দীর রচনা সমূহে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই কালকে তাঁর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার যাত্রাকাল বলা যায়। লক্ষ্য তখন লভ্য হয়নি বলেই মতামতও সুস্পষ্টরূপ গ্রহণ করেনি।

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, মানসী আত্মসমর্পণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২২৬

২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, কল্পনা (বিদায়)—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৭২৫।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম জীবনের পশ্চাৎ পট ॥

যুগস্রষ্টা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানতঃ উপনিষদের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না এবং তাঁর বহু কাজে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এ ছাড়াও রামমোহন যখন তাঁর ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সে সময় আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার আলোচনা বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল। রাজা রামমোহন নিজেও এ সকল ভাষায় বিশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন।[২] সুতরাং তাঁর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক ইসলাম ধর্মের ও বিশেষ করে সুফীবাদের প্রভাবও তাঁর উপরে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। রাজা রামমোহনের সর্বপ্রথম অনুগামী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর ধর্মমত গঠনে উপনিষদকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যে তন্ত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না।[৩] তবে সে প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরপক্ষে কোন কোন মুসলমান সাধক কবির কাব্যপ্রভাব তাঁর উপর এসে থাকতে পারে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য প্রভাব হচ্ছে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। রাজা রামমোহনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ধর্মজীবনের সাক্ষাৎ প্রভাব বলতে যা বোঝায় তা মহর্ষির কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথের দিকে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকাল প্রধানতঃ কল্পনাশ্রয়ী হলেও মহর্ষির ধর্মপ্রভাব তথা ভারতীয় উপনিষদের প্রভাব কবির জীবনে তিল-মাত্র অসার্থক হয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ [উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়—রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ] দ্রষ্টব্য।

২। তিনি রঙ্গপুরে থাকিতে পারস্য ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রতিবাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তদর্শন অনুবাদ করিয়াছিলেন।—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ [১৩৬২]—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৬০।

৩। ব্রাহ্মসমাজে ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল।...শোনা যায় যে মহানির্বাণ তন্ত্র অনুসরণে

হলেও হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি তিনি কখনই বীতশ্রদ্ধ হননি। বিশেষ করে ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। তাই মহর্ষির জীবৎকালে তাঁর ছেলেদের উপবীত গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানই যে কেবলমাত্র পরম জাঁকজমকের সঙ্গে হত তাই নয়, ঠাকুর বাড়ীর বিবাহাদিও ব্রাহ্মণপরিবারের বাইরে হওয়ার নিয়ম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেও মহর্ষিদেবের এই সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পিতার নিকট হতে যে সমস্ত অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বপ্রথমেই গায়ত্রীর উল্লেখ করা যায়। ঋগ্বেদের ৩।৬২।১০ সংখ্যক মন্ত্র 'তৎসবিতু বরণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'-এর দেবতা হচ্ছেন সবিতৃদেব। এই সমস্ত ঋকমন্ত্র রচনার পর যখন নানা যজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট জটিল অনুষ্ঠানসকলের প্রবর্তন হল তখন পুরোহিতেরা মন্ত্রের সূত্রপাতে 'ওঁ' এবং 'ভূ ভূর্বঃ স্বঃ' এই তিন ব্যাহৃতি বা সংক্ষিপ্ত মন্ত্রকে ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যা বন্দনার জন্য নির্দেশ করলেন। এই মন্ত্রের ছন্দ ছিল 'গায়ত্রী'। সেইজন্য যুগের প্রভাবে মন্ত্রের প্রকৃতনাম 'সাবিত্রী ঋক' অপ্রচলিত হয়ে 'গায়ত্রী' নামে সকলের নিকট পরিচিত হয়। রামমোহন রায়ও নির্দেশ দিয়েছেন যে গায়ত্রী জপ করে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে 'ওঁ' অর্থে সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্তা ও 'ভূ ভূর্বঃ স্বঃ' অর্থে ত্রিলোক প্রকাশক ব্রহ্মকে, সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়ের প্রেরয়িতা, এই উভয়রূপে দেখতে হবে।[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও গায়ত্রীর স্থান অত্যন্ত উচ্চে ছিল। চিরজীবন তিনি গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করে এসেছেন এবং ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রীর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।[২] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে গায়ত্রী কি মহান স্থান অধিকার করেছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক,

দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীদিগকে মন্ত্রদানও করিতেন। —আত্মজীবনী [১৯৬২] পরিশিষ্ট ২৫—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩২২ এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ [ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়— রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ] দ্রষ্টব্য।

১। আত্মজীবনী [১৯৬১] পরিশিষ্ট ৩০—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য।

২। যেই আমি রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাহারই জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হইলাম। যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম

আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে তার এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী। যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রী মন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করেছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, 'বরেণ্যং ভর্গ', সেই বরণীয় তেজকে, ধ্যানগম্য করে তুলেছে। এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।[১]

প্রাচীন বৈদিকমন্ত্র ও বৈদিকপদ্ধতি অনুসারে উপনয়নের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গায়ত্রীর প্রথম পরিচয় হয়।[২] নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ত্রীর প্রতি এক আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন। যদিও সে বয়সে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু এই মন্ত্রের মধ্য দিয়ে হৃদয়কে বিস্তার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা তিনি করতেন—এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন।[৩] তাঁর অবচেতন মনের মধ্যে গায়ত্রী যে ছায়াবিস্তার করেছিল তারই ফলে

প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করি, তখন তাহার মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকে।—আত্মজীবনী [১৯৬২] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৭।

১। শান্তিনিকেতন—ভক্ত [রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড, ১৩৬৮-পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৩০৫।

২। একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়নের জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সঙ্কলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে সংগৃহিত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের উপনয়ন হইল।—জীবনস্মৃতি [১৯৬১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪০।

৩। নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করিবার খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি।

গায়ত্রী জপের সময়ে অকারণে অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল।[১] গায়ত্রীর মধ্যে চেতনাকে পরিব্যক্ত করার যে দীক্ষা তিনি মহর্ষির কাছে পেয়েছিলেন, উপনয়নের অব্যবহিত পরেই শান্তিনিকেতনে আসায় তাঁর সেই দীক্ষা পরিপূর্ণ হল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতাকে উপলব্ধি করে।[২] গায়ত্রীর প্রতি যে নিষ্ঠার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন তার মূলে কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিবেশই ছিল না, ছিল পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারের আন্তরিক যোগসূত্র। মহর্ষি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে এই সত্য ব্যক্ত করেছেন।[৩] এই বংশ পরম্পরাগত অন্তর শক্তি বহুগুণিত হয়েছিল মহর্ষির কাছ হতে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করে।[৪] অন্তর ও বাহির, আত্মা ও বিশ্বকে সংযোগকারী গায়ত্রী সাধনার মূর্ত প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের জীবন এবং

আমার বেশ মনে আছে 'ভুভুর্বঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।—জীবনস্মৃতি [১৯৬১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪০।

১। গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি যে সে বয়সে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজেই কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।—জীবনস্মৃতি [১৯৬১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪৩।

২। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যক্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ [রবীন্দ্ররচনাবলী—১১শ খণ্ড, ১৩৬৮—পশ্চিবঙ্গ সরকার প্রকাশিত], পৃঃ ৭৩৮।

৩। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়।—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৭।

৪। বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো, এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া

শান্তিনিকেতনের আদর্শের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা। জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে।'[১]

গায়ত্রী সম্বন্ধে অন্তরের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রকাশ করেছেন তাঁর অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে। এই সকল রচনার মধ্য দিয়ে এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে যে বহিঃশক্তি ও অন্তঃশক্তির সংযোগকারী গায়ত্রীমন্ত্র সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যোগসাধন করে সকল সংকীর্ণতা, স্বার্থ, ভয়, বিষাদ হতে মুক্তিদান করে।[২] এর ফলে চলিষ্ণু ঘটনাপুঞ্জ কেবলমাত্র ঘটনাই থাকে না—তার অন্তরের অনন্ত সত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।[৩] শুধু তাই নয়, গায়ত্রী বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের মিলন-

হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্তভাবে না, বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি।—মানুষের ধর্ম [১৯৬০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৭।

১। শান্তিনিকেতন—ভক্ত [রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড, ১৩৬৮—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৩০৯

২। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎ চরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্র বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।—ধর্ম-ধর্মের সরল আদর্শ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ২৪।

৩। অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না, তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব, এইজন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।—শান্তিনিকেতন—সত্যকে দেখা [রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড], পৃঃ ২৩২।

সাধন করছে এবং সেইসঙ্গে যুক্ত করছে ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও জ্যোতিষ্কলোকের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাকে।[১] এইজন্যই এই উদবোধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়। তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি, ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়, মনে করিতে হয় আমি ত্রিভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ প্রদেশবাসী নহে। আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি লোকলোকান্তর তাহার এক একটি কক্ষ।"[২] "আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি, সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি—ভূ র্ভুবঃস্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম। সেইজন্য বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্য আলোকের দূতপাঠিয়ে দিচ্ছেন।"[৩] 'যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা,' আমি জলেস্থলে আকাশে সুখে দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি—এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে।

১। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়ের মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র সেই মন্ত্রটিকে ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁর সেই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির উপলব্ধি করার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী। —শান্তিনিকেতন—ভক্ত—[রবীন্দ্র রচনাবলী] ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৫।

২। ধর্ম-ধর্মের সরল অর্থ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ২৩।

৩। শান্তিনিকেতন—প্রভাতে ,, ,, ,, পৃঃ ১৪৮।

এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে ও চলতে শেখা।'[১]

কেবলমাত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃই নয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ওঁ—কারও তার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে অনুভূত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আমাদের ধী ও চেতনার সঙ্গে গায়ত্রীকে একই বন্ধনহীন গ্রন্থিতে যিনি বেঁধে দিচ্ছেন, সকল কিছুর মূলেই যিনি, তিনি সর্বব্যাপী এবং এইজন্যই তিনি ওঁ।[২] প্রাচীন ভারতে সংসারীর পক্ষে পরমাত্মাকে লাভ করার মন্ত্র ছিল ওঁ। তখন মূর্তিকল্পনা ছিল না। জগৎ সংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হতে ধ্বনিত এই সংক্ষিপ্ত শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অর্থের বন্ধনে ধরা দেয় না, আকারে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।[৩] এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ওঁকারের মধ্যে ব্রহ্মের ও অসীমের নির্দেশ দান করেছেন, —'সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতিব্রহ্ম। ওম বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ

১। শান্তিনিকেতন—দুর্লভ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৩৪৩।

২। আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বকেও সৃষ্টি করেছেন আর একদিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।—শান্তিনিকেতন—ওঁ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ২৫৭।

৩। প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থল এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্মুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্তিকল্পনা ছিল না—পূর্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না, এই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র, হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।—উপনিষদ ব্রহ্ম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৬৩৯।

করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয়দান করে, অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।'[১]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার বিকাশ এইভাবে উপনয়নকালে গায়ত্রীর মধ্য দিয়ে। তাঁর ধর্মভাবনা সম্পূর্ণই তাঁর নিজের হলেও তার মূলে ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং এই ঐতিহ্যের প্রধান দুই শাখা উপনিষদ ও বৈষ্ণবসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে ওঠে।[২]

উপনিষদের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এই পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবির জীবনে এই পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে প্রাচীনকালের উদ্বেলভাবের পরিবর্তে শান্তির সমাবেশ হয়েছিল এই পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার প্রবর্তনে।[৩] শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে উপনিষদের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। 'হিমালয়যাত্রা' কালে মহর্ষি প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথকে পাশে

১। উপনিষদ ব্রহ্ম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৬৭০।

২। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন বলেন—উপনয়ন উপলক্ষ্যে গায়ত্রীমন্ত্র পাইবার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ। তবে সে উন্মেষ গভীর চিত্তগহনে।...রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা তাঁহার নিজস্ব। তবে এ ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সে মূলের দুইটি প্রধান শাখা। এক উপনিষদের আনন্দদর্শন, দুই বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদ এবং সেইসঙ্গে সহজ-সাধনার তত্ত্বমুক্ত সর্বাস্তিবাদ। -বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ [১৩৬৮] সুকুমার সেন, পৃঃ ১১।

৩। আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্তসমাহিত।—আত্মপরিচয় [১৩৬১], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৮।

নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করতেন।[১] এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে সত্যের প্রকাশ ক্রমে ক্রমে অনুভূত হয়েছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতবর্ষে উপনিষদ ব্রহ্মের যে প্রকাশ করছে সেই সত্য, সেই সরল আদর্শ কোথাও খণ্ডিত নয়, তা পরিপূর্ণ।[২] উপনিষদের প্রাচীন মন্ত্রগুলি ধ্যানের সহায়ক বলে তিনি শান্তিনিকেতনে উপনিষদের মন্ত্রে ছাত্রদের দীক্ষা দিতেন।[৩]

গায়ত্রীর মত উপনিষদের অনুশাসনও রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে গৃহী থেকেও এক অতি মহৎ ধর্মজীবন যাপন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শকে উপনিষদ হতে সংগৃহীত শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন ঃ—

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ ।
যদ্‌ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ।।'

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি হবেন ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ও যে কোন কর্ম করুন,

১। সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাটি দুগ্ধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠদ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।—[জীবনস্মৃতি১৯৬১], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৩।

২। ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনাজালদ্বারা বিজরিত নহে।—ধর্ম-ধর্মের সরল আদর্শ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ২১।

৩। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে, ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি।—শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৮২০।

তা ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন।[১] রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, যারা সংসার ত্যাগ করে, কেবলমাত্র তাদের জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা নয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সন্তানসূত্র ছেদ না করে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে, শুধুমাত্র ভক্তি বা জ্ঞানে নয়, কর্ম, হৃদয়, মন এবং চেষ্টায় সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হবেন।[২] সুতরাং 'ইহাই সংসারের মূলমন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন।'[৩] ঈশোপনিষদেরও এই নির্দেশ যে—যারা কেবল মাত্র অবিদ্যা ও সংসারের জালে আবদ্ধ, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও অন্ধকারে প্রবেশ করে তারা, যারা শুধুমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।[৪] সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের মতে,—'ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে

১। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

২। তবে কি এইকথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালোমন্দ সুন্দর কুৎসিত অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাহাদেরই জন্য? তাই যদি হইত তবে ব্রহ্মবাণী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না। অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন এবং যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তৎব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে—কেবল জ্ঞানে নহে, কর্মে, হৃদয়ে, মনে এবং চেষ্টায় সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে।—উপনিষদ ব্রহ্ম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড], পৃঃ ৬৩১।

৩। উপনিষদ ব্রহ্ম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৬৩২।

৪। সংসারের সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ।।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা এবং সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভুয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।—উপনিষদ ব্রহ্ম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক প্রকাশিত],পৃঃ ৬৩২

এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।'[১] ব্রহ্মের মন্দির স্বরূপ এই সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠভাবে জ্ঞান, ভোগ ও কর্মের দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বর সর্বাঙ্গীনরূপে জ্ঞান, ভোগ ও কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলে সংসারযাত্রা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।'[২] 'গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়, তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া ওঠে তখন সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।'[৩] অধিকন্তু প্রেমের সার্থকতা দানের মধ্যে। সুতরাং যতক্ষণ মানুষ কিছু দিতে না পারে ততক্ষণ ব্রহ্মপ্রেম সার্থক হতে পারে না। যদযৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—সংসারের কর্ম, কর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মে সমর্পণের মধ্যেই ব্রহ্মপ্রেম সার্থক হয়ে ওঠে।[৪]

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি মহর্ষিদেবকে সংসার ও ধর্মজীবন যাপনে একটি অপূর্ব সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের শিক্ষার উপরে

১। ব্রহ্মমন্ত্র [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৬২১

২। জ্ঞান এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সর্বাঙ্গীনভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার, আমাদের এই কর্মক্ষেত্র, ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎ সৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ, এবং জগৎ সংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে। সংসারের সেই জ্ঞানসৌন্দর্য, ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া ওঠে।—ব্রহ্মমন্ত্র, পৃঃ ৬২২, ঔপনিষদ ব্রহ্ম, পৃঃ ৬৩৪ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড]।

৩। ধর্ম-ততঃ কিম [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৮৭।

৪। প্রেম ত কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কি? তবে ভক্তি আমাদের সার্থকতা লাভ করিত কি করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম আমাদের কর্তৃত্ব। তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। —ধর্ম —মনুষ্যত্ব [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড], পৃঃ ১৮।

এই প্রভাব এমনই গভীরভাবে পড়েছিল যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রভাব লুপ্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে সংসারে থেকে যে ধর্মজীবন যাপন করা যায় ধর্মজীবনে সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ঈশোপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই বাক্যাংশটুকু তাঁর সমস্ত ধর্মজীবনের মধ্যে কার্যকরী হয়েছিল।[১] কবি প্রথম জীবন থেকে শেষদিন পর্যন্ত ঈশোপনিষদের এই শ্লোকাংশ অবলম্বনে বার বার বলে গিয়েছেন যে সংসারজীবনে ভোগ নিষিদ্ধ নয়, তবে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা কর্তব্য। অর্থাৎ সংসারে থেকে ধর্মপালনের আদর্শ হচ্ছে নিরাসক্ত ভোগ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে এই গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাস জন্মেছিল যে সংসারে ভালোবাসা, মায়ামোহ, স্নেহপ্রেম কোন কিছুই মিথ্যা নয়। সমস্তর মধ্য দিয়েই, পুণ্যাচরণের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর উপলব্ধি হয়ে থাকে। বাল্যজীবন থেকে উদীয়মান ও বর্ধমান এই অনুভূতি শেষ জীবন পর্যন্ত কবির সমস্ত রচনাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান দেখা যায়। সংসারের সমস্ত কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়েই ধর্মজীবন উপলব্ধির সার্থকতা প্রকাশ পায়। মহর্ষির প্রদর্শিত উপনিষদের আদর্শ জীবনে গ্রহণ করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই বলেছেন,—'যে মুক্তির বাণী তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাঁকেই আমরা গ্রহণ করব—সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করেছেন।'[২] মহর্ষির সাধনা ও ব্রহ্মধর্মের মূল উপনিষদের ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকাল হতেই সচেতন ছিলেন। ভারতের ঐতিহ্য ও উপনিষদের ধর্ম 'নৈবেদ্যে' সমন্বয় লাভ করেছে।[৩] এই

১। এই শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ কর তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।—আত্মপরিচয় [১৯৬১], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৯৩।

২। শান্তিনিকেতন—মুক্তির দীক্ষা [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৪৮৮।

৩। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী বলেন,—ঔপনিষদ ধর্ম সম্বন্ধে কবি যৌবনারম্ভ হইতেই সচেতন। কারণ তাহাই হইতেছে মহর্ষির সাধনা ও ব্রহ্মধর্মের ভিত্তি।

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন 'পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণ কমলে' এবং সেই সনেই প্রকাশিত হয় 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার পথে যতই অগ্রসর হলেন ততই তিনি প্রেরণা-লাভ করলেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য হতে,—

'হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।'[১]

সেইসঙ্গে তাঁর পিতার জীবনের আদর্শও তাঁর চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—

'ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড় কর করি কর তাহা দরশন।'[২]

এই দুই প্রেরণা ও অভিজ্ঞতাই সাম্যলাভ করেছে 'নৈবেদ্যে'। 'নৈবেদ্যে' উপনিষদের স্পর্শও অনুভব করা যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি এখানে উপনিষদের অনুভূতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৩] সুতরাং এই সময়ের রচনায় যে অদ্বয়বাদের প্রকাশ তাকে সম্পূর্ণরূপে উপনিষদের প্রভাবের ফল

নৈবেদ্যে আসিয়া সেই ঔপনিষদ ধর্ম আর ভারতের মহত্ত্ব একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং শেষপর্যন্ত দুয়ের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।—রবীন্দ্র সরণী—প্রথম প্রকাশ [১৩৬৯], প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৯৫।

১। নৈবেদ্য [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড—পশ্চিবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৯০৫।

২। নৈবেদ্য [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৮৬৬।

৩। নৈবেদ্যের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে যে অদ্বয়বোধ তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র কাব্যধারার ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিতেছিল। নৈবেদ্যে আসিয়া মনে হয় কবি-অনুভূতি এখানে উপনিষদের সঙ্গে মিল খুঁজিয়া পাইয়াছে, অনুভূতির প্রকাশে তাই উপনিষৎ সচেতনতার চিহ্ন আছে।—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস [১৩৬৮], শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫১।

বলা যায় না। এখানে উপনিষদের প্রভাব রয়েছে অংশতঃ। উপনিষদের বাণী-গুলিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এনে রবীন্দ্রনাথ নিজের মানবতাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

উপনিষদের সঙ্গে অদ্বয়বোধের মিল থাকলেও সেই অদ্বয়বোধের মধ্যে দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

অদ্বয়ের উদাহারণ : 'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরকালের সেই আমি।'[১]

দ্বয়ের উদাহারণ : 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি
পেয়ে আবার হারাই মিলনঘোরে॥'[২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে প্রথম হতেই অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] সেইসূত্রে তিনি শাঙ্কর দর্শনেরও বিরোধী ছিলেন এবং কিছুটা রামানুজের পন্থী ছিলেন। রামানুজ চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিলাস বিভূতি বলে জীব ও জগতের পৃথক সত্বা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সব দ্বৈতবাদীদের থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবোধ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। অনেকের মতে কবির 'আমি' ও 'তুমি'র ধারণা কোন স্থৈতিক ধারণা নয়। সেখানে চিরনূতন, চিরপ্রকাশমান ব্যক্তিসত্য 'আমি'র যোগে 'তুমি' নিত্যসত্য হয়ে উঠেছে।[৪]

১। বিচিত্র [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৪২৯।

২। পূজা ও প্রার্থনা " " " পৃঃ ৬৫৯।

৩। চতুর্থ পরিচ্ছেদ—উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় [রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ] দ্রষ্টব্য।

৪। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি'র ধারণাও কোনও একটি স্থৈতিক (Static) পরম সত্যের ধারণা নয়। 'আমি'র ধারণাও কোন স্থৈতিক ধারণা নয়। 'আমি'ও নিত্যপ্রবাহে নিত্যনূতন করিয়া হইয়া উঠিয়া চিরপ্রসার্যমান ব্যক্তিসত্য লাভ

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কালের অতীত নন। তিনি কালের মধ্য দিয়ে চিরন্তন আত্মপ্রকাশে শাশ্বত সত্য হয়ে উঠেছেন।[১] সুতরাং ভারতবর্ষীয় প্রাচীন দ্বৈতবাদিগণের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের অল্প মিল থাকলেও তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ অনুগামী হননি। বরং পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতের সঙ্গে সাদৃশ্য কিছু বেশী পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর যদি ভেদহীন, বস্তুহীন 'এক' হন তবে স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে যে সেই 'একে'র সার্থকতা বা অস্তিত্ব কি রকম? বস্তু বা অচিৎ ব্যতীত চৈতন্যময়ের চেতনা কিভাবে জাগতে পারে? সুতরাং বস্তুহীন পরমপুরুষকে জড় ব্যতীত চিৎ বলে কল্পনা করা যায় না। এই প্রশ্ন উদয়ের ফলে হেগেল ও তাঁর শিষ্যেরা অচিৎ বা বস্তুজ্ঞানের অতীত 'এক' ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সত্য বলে স্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল[২] উভয়েরই মতে জগতের মধ্য দিয়ে, অচিতের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর চিৎ ও সত্য হয়ে উঠেছেন।

করিতেছে, আমার এই চিরবিকাশমান 'আমি'র যোগে 'তুমি'ও নিত্যকালের সত্য হইয়া উঠিতেছে।—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৫৬।

১। The absolute eternal is timelessness, and that has no meaning at all, it is merely a word. The reality of the eternal is there, where it contains all times in itself.—Personality by Rabindra Nath Tagore ; P-57.

২। And the Absolute is not a mysterious something to which the categories, being, substance, cause etc. apply. The Absolute is the categories. Yet there is also distinction at the same time as identity (p. 77). ...God, it has been said, is the measure of all things. It is this idea which forms the groundnote of many of the ancient Hebrew hymns, in which the glorification of God tends in the main to show that he has appointed to everything its bound : to the sea and the solid land, to the rivers and the mountains, also to the various kind of plants and animals. (p. 170) The Absolute or God is a syllogism. God, regarded as abstract universal. is the Logical Idea. But God is not merely this emtpy abstract universal. This uuiversal goes out of itself into particularity, which is nature and returns to itself in the singularity of concrete spirit. (p. 248)—The Philosophy of Hegel by W. T. Stace (Dover Publications Inc.)

রবীন্দ্রনাথ সীমা ও অসীম উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে,— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি ॥[১]

আনন্দময় ব্রহ্ম হতেই বস্তুজগতের সৃষ্টি এবং আনন্দের মধ্যেই তারা জীবিত। উপনিষদের এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,— 'আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'[২] তিনি সীমা ও অসীমের সংযোগে পরম সত্য উপলব্ধি করেছেন,—

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।'[৩]

সীমার সত্যকে অস্বীকার করে অসীমকে সত্য বলে মনে করলে পরমপুরুষকে উপলব্ধি করা যায় না এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে 'রাজা' নাটকে। সুদর্শনা রাজার বিশ্বরূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন বলে তাঁকে বিশেষরূপে বস্তুবিশ্বে দেখতে চেয়েছিলেন। সেইকারণে সত্য তাঁর উপলব্ধি হয়নি। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিশেষরূপ ও বিশ্বরূপের মিলনেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। সেই কারণে 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে,[৪]—রাজার এই উক্তির উত্তরে যখন রাণী বললেন,—'যদি থাকে সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।'[৪]

১। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী [১ম ভাগ], স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৬।

২। জীবনস্মৃতি [১৩৬১], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৩।

৩। গীতাঞ্জলি [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ২৯২।

৪। রাজা [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৩৬১।

তখন তার মধ্যে ঈশোপনিষদের 'তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বসাধ্য বাহ্যতঃ'—তিনি অন্তরে, বাহিরে সর্বময়, এই তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্বম খল্বিদম্ ব্রহ্ম' রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বত্র ব্রহ্ম বিরাজমান। সেই কারণেই তিনি শুধুমাত্র নির্গুণ নন, তিনি সগুণও। সীমার দৃষ্টিকোণে তিনি সগুণ অসীমের দৃষ্টি কোণে তিনি নির্গুণ। একমাত্র কেনোপনিষদ ছাড়া সমস্ত উপনিষদেই ব্রহ্মোপলব্ধির নির্দেশ দেখা যায়। কেনোপনিষদে দেখা যায় যে, যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানেন না। এই কারণে যখন শিষ্য গুরুকে বললেন যে তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, তার উত্তরে গুরু বললেন,—

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য
ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতম্ বিজানতাম ॥[১]

যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে করেন তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেননি এবং তিনিই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, যিনি মনে করেন তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেননি। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত। অপরপক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্মকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখেছিলেন। উদ্দালক তাঁকে বলেছিলেন, 'তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো।' সাধনায় যখন শ্বেতকেতু ব্রহ্মের যথার্থরূপ উপলব্ধি করলেন তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন 'অহম ব্রহ্ম অস্মি।' আমিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কোন বিভেদ নেই। সীমা সত্য হলেও তার পূর্ণতা তখনই যখন সে অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানেই হয় ব্রহ্মোপলব্ধি।

সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যও হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে পরমাত্মার উপলব্ধি অশেষ। কারণ তিনি অসীম। যতই তাঁর সঙ্গে চেনাজানা হয়, ততই পার্থক্যের দূরত্ব বেড়ে চলে,—

'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে ॥'[২]

১। কেনোপনিষদ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ২৭।

২। পূজা [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত], পৃঃ ৪৭

সুতরাং জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনুভব করা যায়, কিন্তু শেষ করা যায় না। বলতে পারা যায় না 'অহম ব্রহ্ম অস্মি'। জীবাত্মা কখনও নিজেকে বা পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না এবং সেই কারণেই বলে,—

'তার অন্ত নাই গো নাই যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
তার অনুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।'[১]

কবির পরমপুরুষ পরম লীলাময়। তাঁকে কোন পৃথক সত্তা বা বিশেষরূপ দেওয়ার অর্থ খণ্ডক্ষুদ্র করা। বিচিত্র নিত্য নব লীলার মধ্য দিয়েই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। 'তৎ ত্বম অসি'র সম্পূর্ণ সমর্থন রবীন্দ্রনাথ করেন না। সীমা ও অসীমের মধ্যে, অন্ত ও অনন্তের মধ্যে ব্যবধানের সূক্ষ্ম সীমারেখা লুপ্ত করতে রবীন্দ্রনাথ চাননি। এই কারণেই উপনিষদের সত্য অনুভব করেও তিনি উপনিষদের কবি হননি। রবীন্দ্রনাথের পরমপুরুষ কোন শাস্ত্রজ্ঞান বা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আসেননি। তিনি এসেছেন নিজের মর্মোপলব্ধি ও সহজ অনুভবের মধ্য দিয়ে।[২] বেদান্তকেও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি রাম-মোহনের মত বুদ্ধিমান লোক বৈদান্তিক ছিলেন বলে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর মতে যে কারণে দুই অপেক্ষা এক সরল, সেইকারণে বহু মত অপেক্ষা বেদান্তের মত সরল।[৩]

১। পূজা [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত] পৃঃ ২৭।

২। শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় বলেন,—উপনিষদের অনুরক্ত রসিক পাঠক রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ করিবার আগ্রহ বড় দেখি না, দেখি তিনি ডুব দিয়েছেন রসসমুদ্রের অতলে, যেখানে কোন তত্ত্ব নাই, কোন বিচার নাই, বিরোধ নাই। সেইকারণেই যখন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ ব্যাখ্যা করেন, তখন সে ব্যাখ্যায় উপনিষদ তত্ত্ব ততটা পাই না, যতটা পাই উপনিষদের আপ্তবাক্যকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের মর্মের উপলব্ধির কথা।—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৯, নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫।

৩। এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে, তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্য লাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মত অতবড় একজন প্রখর বুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়সন সাহেবও

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যে কোন কোন মুসলমান সাধক কবির প্রভাব পড়েছিল এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দীওয়ান হাফেজ ছিলেন তাঁর সব চেয়ে প্রিয় কবি। বহুসময়ে ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব কালে তিনি হাফেজের রচনা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন।[১] তেমনই পার্বত্য বনপথে, সিমলায় রাতে প্রভৃতি বহু সময়ে তিনি হাফেজের রচনা হতে প্রেরণা লাভ করেছেন। মহর্ষির 'আত্মজীবনী'তে বহুস্থলে হাফেজের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২] সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বালকবয়সে মহর্ষি ও শ্রীকণ্ঠসিংহ প্রভৃতি পিতার বন্ধুদের কাছে সুফী কবিদের সুক্তি শুনেছিলেন একথা অবশ্যই অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অনেকে সেই কারণে তাঁর জীবনদেবতার মূলে সুফী প্রভাব বিদ্যমান বলে ইঙ্গিত দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুফী প্রভাব যদি থেকেই থাকে তবে তা অতি সামান্যই। কারণ সুফী প্রেমসাধনার শেষ কথা আত্মলোপ ও প্রেমনির্বাণের তত্ত্ব জীবন-দেবতার ক্ষেত্রে ওঠা অসম্ভব। তবে একটি বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। সুফীবাদে পরমার্থ দয়িতার উন্মুক্ত কেশজালের বন্ধনে রুদ্ধশ্বাস নির্বাণই কাম্য। তেমনই 'গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি'[৩] প্রভৃতি পংক্তির মধ্যে জীবনদেবতা—প্রিয়ার চূর্ণকুন্তলের স্পর্শলাভের আকুলতা দেখতে পাওয়া যায়।[৪] বরং বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কোন দর্শন বা তত্ত্বকথা অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত না

আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোন সংশয় দূর হয়নি। এক হিসাবে অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত মত সরল, কারণ দুইয়ের চেয়ে এক সরল।—ছিন্নপত্রাবলী (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড), পৃঃ ১৩৬।

১। যে রাত্রিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতাম, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—

গো, শম্ অ ম-য়ারেদ্ দরী জম্ অ, কে ইম্‌শব
দর মজলিসে-মা মাহে' রুখে দোস্ত তমাস্ অস্ত।
(দীওয়ান—হাফিজ, ৫৬।২)।

'আজ আমার এ প্রভাতে দীপ আনিও না, আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।'—আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২২০।

২। আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১০৬, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ২১০, ২১৯, ২২০, ২২৩ দ্রষ্টব্য।

৩। সোনার তরী (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড), পৃঃ ৪৫০।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮), সুকুমার সেন, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

হলেও এর পিছনে গীতা এবং বৈষ্ণব ও বাউলগানের প্রভাব কিছু পরিমাণে রয়েছে।[১] যেমন. কবির জীবনের আকুলতার সঙ্গে বৈষ্ণব অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাবের ফলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধিকার অভিসারের ন্যায় জীবন দেবতার উদ্দেশ্যে অন্তর্যামী বিরহিনী বধূর অভিসার যাত্রা। এই লুকোচুরি খেলায় সৃষ্টির রহস্য অপরূপ হয়ে উঠেছে।[২] রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,—'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।'[৩]

জয়দেবের কাব্যের রাধাকৃষ্ণকে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবকবিরা আবেগ আকুলতার ভাবরসে সঞ্জীবিত করে অপরূপ করে তুলেছিলেন। জয়দেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল বাল্যকালেই মহর্ষির সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াবার সময়ে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত অতি পুরাতন 'গীতগোবিন্দে'র মাধ্যমে। তখন অর্থ তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়নি। কিন্তু কাব্যের ছন্দ, সৌন্দর্য ও কথা তাঁর হৃদয়কে এমন অভিভূত করেছিল যে সমগ্র 'গীতগোবিন্দ'কে তিনি একটি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন।[৪] জয়দেবের পদাবলীর বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় তিমির, নিভৃত, নিলীন, বিতান, নিবিড়

১। কোন দর্শন সূত্র অথবা তত্ত্বকথা অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর্যামী –জীবনদেবতার তত্ত্ব খাড়া করেন নাই। অন্তর্যামীর উল্লেখ গীতায় আছে। পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮), সুকুমার সেন, পৃঃ ১৮।

২। এই আইডিয়ার পিছনে বৈষ্ণব অধ্যাত্ম চিন্তার ছাপ আছে, কবির নিজের জীবনের গূঢ় অনুভূতি আছে। অন্তর্যামী যেন বিরহিনী বধূ, জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে অভিসারে অগ্রসর। জীবনদেবতার সঙ্গে এই লুকোচুরী খেলাতেই সৃষ্টির রহস্য, জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ১৭-১৮।

৩। মানুষের ধর্ম [১৩৬০], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮১।

৪। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪১—৪২ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি শব্দের বারংবার ব্যবহারে[১] এবং 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে'র মধ্যে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি,' 'অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণম্' ইত্যাদির ছন্দের ইঙ্গিতে।[২]

এই প্রসঙ্গে জয়দেবের পর কালিদাসের নামও উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে 'যদি একজন কাহাকেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগুরু বলিতে হয় তো তিনি কালিদাস। তবে জয়দেবের মত কালিদাস শিক্ষাগুরু নন, যাহাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন 'চৈত্য গুরু' তিনি তাই।'[৩] বৈষ্ণব কবিরা দেহাশ্রিত ও দেহাতীত প্রেমকে পরিস্ফুট করে তোলেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত-কাব্যে এক কালিদাসের রচনা ছাড়া এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভবে' দেহনিরপেক্ষ প্রেমকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই কারণে 'কুমারসম্ভবে' মদনভস্মের পর যখন উমা

'ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ॥'[৪] (৩।৭৫) সখীদের

সম্মুখে দেহসৌন্দর্য ব্যর্থ হওয়ায় উমা লজ্জাবনতমুখে গৃহের দিকে চললেন। নিজের রূপকে নিন্দা করে তিনি স্থির করলেন 'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ (৫।২)[৪]—তপের দ্বারা ব্যর্থ সৌন্দর্যকে সার্থক করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। এইভাবে দেহাশ্রিত প্রেমের ব্যর্থতা প্রতিপন্নতায় দেহাতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা হল। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এই ভোগবিরাগ লক্ষ্য করেছেন। এমন কি তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রেও ভোগবিরাগ দেখেছেন যদিও প্রকৃতপক্ষে সেখানে দেহগত রূপের গ্লানি সাধনার দ্বারা শুদ্ধ হয়নি।[৫] রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায়

১। রবীন্দ্র কাব্য ভাষায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে জয়দেবের পদাবলী থেকে নেওয়া কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যেমন তিমির, নিভৃত, নিলয়, নিলীন, বিপুর, মেদুর, রভস, বিপিন, বিতান, তল, নিবিড়, গহন, মধু-যামিনী ইত্যাদি।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৫।

২। রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব (১৩৬৫)—বিমলকান্তি সমাদ্দার, পৃঃ ১৯৪-৯৫।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ৫।

৪। Kumar Sambhava (1923), edited by M. R. Kale, Pp. 57 and 69.

৫। History of Sanskrit Language, Vol. I—De and Das Gupta, p. XXXVI—XXXVII দ্রষ্টব্য।

এই দেহাশ্রিত প্রেমকে ফুটিয়ে তুলে সমাজের কল্যাণে কর্তব্য ও মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে ভোগবিরতির সার্থকতা দেখিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে' ভোগ হতে ভোগবিমুখতার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, 'চিত্রাঙ্গদা'র দেহাশ্রিত প্রেম ভোগমুক্তির মধ্যে সার্থকতালাভ করেছে, 'রাজা ও রাণী'তে প্রেমের সঙ্গে পৌরুষ ও কর্মের মিলনে ভোগ হতে কর্মের মধ্যে মুক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে বহুস্থানেই যে সুন্দর শিবের প্রতিষ্ঠা, কালিদাসের মধ্যেই তার মূল নিহিত। যদিও বৈদিক রুদ্রের সংস্পর্শে সেই শিব ভয়াল সুন্দর হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের উমাও কালিদাসের কাব্য সম্ভূত।[১]

কালিদাসের মত তপোবনের আদর্শও রবীন্দ্রনাথের মনে অপূর্ব প্রেরণার কাজ করেছিল। পদ্মাবক্ষে অবস্থান কালেই এই তপোবনের অনুপ্রেরণা তাঁকে এমনই অভিভূত করেছিল যে তিনি অনুকূল ক্ষেত্রে সেই প্রাচীনকালের ভাবাদর্শকে রূপদান করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে কালিদাসের ঋণ স্বীকার করেছেন।[২] তিনি বিশ্বাস করতেন যে কালের পরিবর্তনের ফলে তপোবনের আদর্শের রূপের পরিবর্তন হলেও মূলসত্য অপরিবর্তিত রয়েছে। এইজন্যই তিনি বলেছেন,—'আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে,

১। পুরাণকাহিনী আশ্রিত রূপক রবীন্দ্ররচনায় বেশী নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে প্রধান শিব রুদ্র, শিবরূপে তিনি সুন্দর, কালিদাসের কাব্যের নায়ক। রুদ্ররূপে তিনি বৈদিক দেবতা, তাণ্ডবে মত্ত। রুদ্রের ক্রোধদাহ অন্যায় ও পাপ ধ্বংস করিয়া ভুবনকে মার্জিত করে, জীবনকে মার্জনা করে। সুতরাং রবীন্দ্র কবিভাবনায় রুদ্রের দক্ষিণ ও বাম দুই মুখের মধ্যে মৌলিক অসামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের উমা কালিদাসের কাব্য হইতেই আসিয়াছে।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৯৯।

২। কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন একসময় সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূলক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপরচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবল বাণীরূপে নয়, প্রত্যক্ষরূপে।—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ [রবীন্দ্ররচনাবলী ১১শ খণ্ড], পৃঃ ১২৫।

কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা।'[১] কালিদাসের কাব্যের তপোবনের আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় 'চৈতালী'র 'বনে রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন' ও 'প্রাচীরে'।[২]

বৈষ্ণবপদাবলী রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হতেই অভিভূত করেছিল।'[৩] 'ভানু-সিংহের পদাবলী'কে এরই অনিবার্য ফল বলা যেতে পারে। 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্য ভাগবত', 'ভক্তমাল' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলীর বই এবং সেইসঙ্গে 'চণ্ডীমঙ্গল'ও তিনি পড়েছিলেন।[৪] 'অচলায়তনে' শোনপাংশু নামে যে বন্য জাতির বর্ণনা আছে তার পিছনে মঙ্গলকাব্যের ইঙ্গিত আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত দেখা যায় যে ডোম ইত্যাদি জাতির যোদ্ধারা যুদ্ধ আরম্ভের আগে বীরমাটি বা রক্তবর্ণের ধূলা শরীরে লেপন বা ধারণ করত এবং 'শোনপাংশু' শব্দের অর্থ যারা শরীরে রাঙ্গামাটি লাগায়।[৫]

রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের পশ্চাৎপটে বাউলবৈষ্ণবগানের সঙ্কেত লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মনের যে একক অনুভূতি ও গীতিপ্রবণতা বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অনুভূত হয়।[৬] উত্তর ও মধ্যবঙ্গে আন্দী বোষ্টমী, লালনফকীর প্রভৃতি বহু বৈষ্ণববাউল ও দরবেশের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন।

১। বিশ্বভারতী [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড], পৃঃ ১৯৭

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১০৩ দ্রষ্টব্য।

৩। " " " পৃঃ ১১ দ্রষ্টব্য।

৪। বৈষ্ণবসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ভক্তমাল' ইত্যাদি এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' তিনি সযত্নে পড়িয়াছিলেন।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ১১।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ২৭০ দ্রষ্টব্য।

৬। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় বলেন,—'লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে কবির সমগ্র জীবনে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বস্তুত একমাত্র কালিদাস ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই

'খাচার ভিতর অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়

ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতেম পাখীর পায়।' লালন ফকিরের এই বাউল গান তাঁর মনে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করেছিল।[১] এরই ফলে তাঁর মনে রহস্যবাদী মনোভাবের সূত্রপাত হয়। এর ধারা পরিলক্ষিত হয় বাউল রীতিতে লেখা 'বাউলে' [১৩১২], বাউলের সুর দেওয়া স্বদেশীগানে এবং এই সময়েই লেখা 'খেয়া'র 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' ও তারপর গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য ও গীতালি।[২] জপমালার একশ আটটি রুদ্রাক্ষের আবর্তনের মধ্য দিয়ে সাধক যেমন পরমপুরুষের প্রতি হৃদয়মন নিবিষ্ট করেন, তেমনই 'গীতালি'র একশ আট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরমপুরুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাধনার রূপ প্রকাশ পায়।

বাউলবৈষ্ণব সাধকদের সম্বন্ধে কবির অতি উচ্চধারণা ছিল। কোন কোন সাধকের ব্যক্তিত্ব তাঁকে এমনই অনুপ্রাণিত করেছিল যে 'বৌ ঠাকুরাণীর হাটে' ধনঞ্জয়ের মত বাউলবৈরাগী কেন্দ্রভূমিকা গ্রহণ করেছে।[৩]

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

নিখিল মানুষের মধ্য দিয়ে, আপনার মধ্য দিয়ে 'মনের মানুষে'র অনুসন্ধানে আকুল করা গগন হরকরার এই গানটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনা ও ভাষণে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালাতেও তিনি বাউলগানের

বৈষ্ণবপদকর্তাদের মত আর কেহই রবীন্দ্রনাথের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রকাব্য যে একান্ত গীতধর্মী, একান্ত স্বতন্ত্র ও আত্মগত, তাহার মূলে এই বৈষ্ণব পদকর্তারা নাই, এ কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। —রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—৫ম সংস্করণ [১৩৬৯], নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৬।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—অপরার্দ্ধ [১৯৬৩], সুকুমার সেন, পৃঃ ৬০৪ দ্রষ্টব্য।

২। " তৃতীয় খণ্ড " পৃঃ ১৫৩ দ্রষ্টব্য।

৩। " " " পৃঃ ২৬১ "

'ব্রহ্মকমলে'র কল্পনা ও আদর্শ গ্রহণ করেছেন।[১] 'গোরা'র সূত্রপাতে বিনয়ের মনের অস্পষ্ট ভাবাবেগকে বাউলের গানে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। তাঁর 'তুমি' ও 'আমি' ভাবের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং উত্তরমধ্য ও পশ্চিম ভারতের সন্তসম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে বাউল গানের প্রভাবও অঙ্গাঙ্গীনভাবে মিলিত রয়েছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদকর্তা বসন্তরায়ের পদাবলীর অনুরাগী ছিলেন। বাল্যকালের শ্রীকণ্ঠসিংহের স্মৃতির সঙ্গে বসন্তরায়ের নামের সমন্বয়সাধন করে তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়কে রূপদান করেছিলেন।[৩] অনেকের মতে 'রাজা' নাটকেও অসীমের সঙ্গে সীমার মিলনসাধনের আকাঙ্ক্ষা—রাধাকৃষ্ণের অভিসারের ছবিই রাজা ও সুদর্শনার বিরহমিলনের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়।

'দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়।'[৪] বৈষ্ণব কবির এই দর্শন-তত্ত্বের প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়[৫] যখন রাজা সুদর্শনাকে বলেন, 'নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোট হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও

১। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।

২। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার মধ্যেই লীলার্থ কল্পিত একটি 'তুমি-আমি'র ভাব দেখিতে পাই, এই 'তুমি আমি'কে অবলম্বন করিয়া যে প্রেমভক্তির সুর রবীন্দ্রনাথের গানে জাগিয়া উঠিয়াছে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে তাহার প্রস্তুতি ছিল একথা অস্বীকার করিতে পারি না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই চিত্তপ্রবণতার মধ্যে কবি অনুভূতি ও ধর্মানুভূতির যে অপরিচ্ছেদ্য যোগ আবিষ্কার করিতে পারিলেন, সেই যোগের সঙ্গে গভীর মিল অনুভব করিতে পারিলেন বাঙ্গলার বাউলগানের এবং উত্তরমধ্য ও পশ্চিমভারতের সন্ত সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে।—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৫৬।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৪৭ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৯৮ দ্রষ্টব্য।

৪। চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৯৬৩); পৃঃ ১৬।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য।

তো দেখবে, সে কতবড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!,'[১] ১৩২১ সালে প্রকাশিত 'বোষ্টমী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাধনা ও রসের গূঢ় অর্থের পরিচয় প্রদান করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর—'সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।' এই ভাবাকুল রচনা রবীন্দ্রনাথের বহুগানে প্রেরণা এনে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'তাসের দেশে'র—'বলো সখী বলো তারি নাম আমার কানে কানে

যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার তানে তানে।[২]

তেমনই 'স্বরবিতানে'র—'তোমারি নাম বলব নানা ছলে

বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।'[৩] এই গানের মধ্যে চৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার নামমাহাত্ম্য স্বীকার করা হয়েছে।'[৪] বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে নিজেকে নায়িকারূপে কল্পনার যে রূপক দেখতে পাওয়া যায় তার পশ্চাৎপটে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের সঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। মেঘদূতের 'যক্ষকান্তা' ও পদাবলীর রাধা মিলিত হয়ে কবির চির বিরহবিচ্ছেদের কল্পলোকে একাকার হয়ে গিয়েছে।[৫] কবি নিজেও বলেছেন,—'মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয় এর মধ্যে মানব ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মেলন

১। রাজা (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৩১০

২। তাসের দেশ „ পৃঃ ১১৭৮

৩। পূজা (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড). পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৯৯ দ্রষ্টব্য।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

গাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে।'[১]

উপনিষদের সত্যকে গ্রহণ করেও যেমন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কবি হননি। তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও তত্ত্ব স্বীকার করেও তিনি বৈষ্ণব কবি হননি। সকল সময়েই তিনি প্রধানতঃ নিজস্ব দর্শন ও উপলব্ধির অনুগামী হয়েছেন। রবীন্দ্ররচনায় 'তুমি' ও 'আমি'র পারস্পরিক প্রেম সম্বন্ধে যে রহস্যময়তার প্রকাশ, বৈষ্ণব পদাবলীতে তার একান্ত অভাব রয়েছে। এর একটা কারণও অনুমান করা যেতে পারে। বৈষ্ণব কবিরা বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁদের রচনায় সেই সম্প্রদায়গত সহজ মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়ের বাহক নন। সেই কারণে এই সহজ মনোবৃত্তি বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত মনোবৃত্তি তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। তাঁর রচনা সর্বদা এবং সর্বত্র ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার দিক নির্দেশ করেছে।

কেবলমাত্র উপনিষদ নয়, অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। তাঁর পরিণত বয়সের রচনাতে বৈদিক সাহিত্যের প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়, যদিও বৈষ্ণব সাহিত্যের মত বৈদিক সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ সাবলীল নয়। জীবনদেবতা-অন্তর্যামী ধারণার পিছনে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সুপর্ণ প্রতীকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[২] 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে আজ দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি'র মধ্যে ঋগ্বেদের উষা সূক্তের 'অপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্'-এর সংকেত দেখা যায়, আবার তেমনই ঋগ্বেদের 'প্রবোধয়ন্তী-রুষসঃ সসন্তং দ্বিপাচ্ চতুষ্পাচ্ চরথায় জীবম্'-এর সঙ্গে তুলনা করে উদ্ধৃত করা যায়,—

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী
রক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।…

১। ছিন্নপত্রাবলী (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড) পৃঃ ১৬৪

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

তাইত চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।[১]

উপনিষদের ধারা অবলম্বন করে প্রাচীনকালের বাঙ্গালা সাহিত্য হতেই প্রহেলিকা বিলাস প্রবণতা দেখা যায় এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে যে ধন হারায়েছি আমি, পেয়েছি আঁধার রাতে॥
না দেখিলে তারে পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুম ফুটিবে প্রাতে॥'[৩] রবীন্দ্রনাথের এই গান প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রহেলিকা বৈশিষ্ট্যের ধারা গ্রহণ করে তাঁর জীবনদেবতা-অন্তর্যামীর অদ্বৈতবাদকে প্রকাশ করেছে।[৪]

'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।'[৫] 'গীতালি'র এই গানটির সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের একটি রচনার অপূর্ব সাদৃশ্যগত ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়, যার প্রথম দুই ছত্র— উট্‌ঠি ভড়ারো করুণমণু
পুকু খসি মহু পরিণাউ
মহাসুহ জোএ কামমহু
ছাড়হি সুন্নসহাউ।[৬]

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য।

২। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার ধর্মীয় অবস্থা) দ্রষ্টব্য।

৩। প্রেম (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ২৯১

৪। একটি গানে সহজ সাধকদের প্রহেলিকার ছাঁদে জীবনদেবতা অন্তর্যামীর অদ্বৈততত্ত্ব প্রকটিত। 'না চাহিলে…ফুটিবে প্রাতে।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ২০

৫। গীতালি (রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড), পৃঃ ৪১৯

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫০ ও ৪৮৮ দ্রষ্টব্য।

'গীতালি'র উপরোক্ত গানটির রচনাকাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ এবং বৌদ্ধ সাধকের রচনাটি আবিষ্কৃত হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং সহজিয়াসাধকের রচনা পাঠে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরিত হয়ে গানটি রচনা করেছিলেন এমন ধারণা করা অসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে উভয় কবির মনে একই ভাবধারা সঞ্চারিত হয়ে তাঁদের রচনায় তা প্রকাশ পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সহজিয়া—বাউল ও মরমিয়া কবিদের রচনায় নিজের অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গতি লক্ষ্য করে ঐদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনই 'গীতাঞ্জলি' রচনাকালে অ-বাঙ্গালী মরমিয়া কবি কবীর, দাদূ, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে[1] প্রেরণালাভ করেছিলেন।

ফজর মে জব আয়া য়লজী পুশাক সুনহ্‌লী তেরী
গমক ভর জব শ্বাস লগায়া চীত জগায়া মেরী।
ধূপমে হমকো কিয়া উদাসা ক্যা পীড় দূর সমায়া
গায়া গেরুয়া সুর মগরবী মরণ সা রৈন আয়া।
কাগজ কালা হরফ উজালা ক্যা ভারী খৎ পায়া
ইণ্ডী রৌমক কোঁ রে য়লজী তুঁহি য়াদ ভুলায়া।
ভায়ী জলসা আজম দাবৎ তুঁহি ইক মেহমান
খলক্ খলক্ মে খৎ হৈ ফৈলী মখ্‌রার হম ফরমান॥'

জ্ঞানদাস বাঘেলির এই রচনার প্রতিফলন তাঁর বহু কাব্যগানে দেখতে পাওয়া যায়।[2] অবশ্য কেবল কাব্যগানেই নয়, অন্যান্য রচনাতেও এর আভাস আছে। যেমন 'ডাকঘরে' অমলের কাছে লেখা রাজার চিঠি। নীচের কবিতাটিও দ্রষ্টব্য,—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

১। গীতাঞ্জলি রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ কবীর প্রমুখ অ-বাঙ্গালী মরমিয়া কবিদের রচনার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫৩।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫৩ দ্রষ্টব্য।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপনা মুক্তি,
মুক্তি খুঁজিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'[১]

'উৎসর্গে'র এই ভাবব্যঞ্জক কাব্যটির মধ্যে সাধক কবি দাদূর রচনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বাস কহৈ হৌঁ ফুল কো পাউঁ ফুল কহৈ হৌঁ বাস।
ভাস কহৈ হোঁ ভাব কো পাউঁ ভাব কহৈ হোঁ ভাস॥
রূপ কহৈ হোঁ সত কো পাউঁ সত কহৈ হৌঁ রূপ।
আপস মে দউ পূজন চাহৈ পূজা অগাধ অনুপ॥[২]

দু'একটি কবিগানের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগানের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এগুলিকে কবিগানের প্রভাব বলা সঙ্গত নয়। যেমন,—

'বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে
বিজ্ঞানে দেহি মা শিবে,
সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।'

অথবা —'যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়
আমার মুক্তিপদেতে কাজ নাই।
আমি শুনেছি শিব উক্তি, সেবিব শিব শক্তি
করেছি মনে মনে যুক্তি তাই।'[৩]

১। উৎসর্গ [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড], পৃঃ ৯৪

২। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য।

৩। আধুনিক বাংলা কাব্য [১৩৬১]—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩ হতে কবিগান দুটি গৃহিত।

এই কবিগান দু'টিতে মুক্তির জন্য কবির কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না পেয়ে অজস্র বন্ধনের মধ্যে বন্ধনমুক্তির প্রকৃত আনন্দ অনুভব করার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ভাবাবেগের সঙ্গে গভীরতর অর্থ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমনঃ—

'দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ, সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবনদ্বারে।'[১]

অথবা—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'[২]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে তিনি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে আপন বৈশিষ্ট্যে স্থান অধিকার করেছেন। সকল সাধনা ও ভাবনার সারতত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন বিশেষ চিন্তাধারার অন্ধ অনুগামী তিনি হননি। নিজের উপলব্ধিই সকল অবস্থায় সকল দর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছে এবং এরই ফলে তাঁর বিশিষ্ট ধর্মদর্শন গড়ে উঠেছে, যার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর অজস্র রচনাসম্ভারে।

১। নৈবেদ্য [রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড], পৃঃ ৮৮১।
২। নৈবেদ্য [রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড], পৃঃ ৮৭৪।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

।। রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ ।।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন যেভাবে শিশুকাল হতে গড়ে উঠে সুস্পষ্ট আকারলাভ করেছিল সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।[১] সমাজজীবনে রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় দর্শন এবং জীবনদর্শন যে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে তা তাঁর অসংখ্য কাব্য গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে প্রকাশিত দেখা যায়। বিশেষ করে কথাসাহিত্যে অর্থাৎ গল্পে ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন যে আকার গ্রহণ করেছে তার বিষয়ে বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও প্রসঙ্গ ক্রমে এসে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একাধারে কথাসাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও অজস্র প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মানবধর্ম, ভারতীয় সমাজধর্ম ও হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যেও ধর্মচিন্তার এই সমস্ত বিভিন্ন রূপ নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই সমস্ত ধর্মচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে এবং উপন্যাসের বাইরে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলার সাহিত্য মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম অপূর্ব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর অসামান্য মনীষার পরিচয় ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ধর্ম আলোচনার মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের রূপই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং সেই হিন্দুধর্ম লৌকিক হিন্দুধর্মের খুব একটা উপরে উঠতে পারেনি। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যানে তিনি পরম ঔদার্য ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বিশ্বজনীনতার আদর্শে ক্বচিৎ আদর্শায়িত হয়েছে। তবে ধর্মের মহিমা বঙ্কিমের লেখনী মুখে নৈতিক পদস্খলনের মলিনতাকে দৈবাৎ তুচ্ছ করে মানুষকে বড় করে দেখাতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথে এবস্তু প্রায় সর্বত্রই আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও ক্বচিৎ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামীর কথা বলতে পারা যায়। তার জন্মের ব্যাপারে ত্রুটি থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের

১। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপট) দ্রষ্টব্য

লেখনীতে তিনি মহাপুরুষের পর্যায়ে উঠতে পেরেছেন। অন্যত্র পদস্খলনকে বঙ্কিম প্রায়শ্চিত্ত যোগে শুদ্ধ করতে চেয়েছেন। যেমন দেখা যায় 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। এই বিশেষত্ব রবীন্দ্র সাহিত্যে বহুত্রই লক্ষণীয়। তাঁর একাধিক গল্পে এইরূপ অসামাজিক জন্মের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও মানুষকে তিনি মহৎ করে দেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'সমস্যাপূরণ' ও 'নামঞ্জুর' গল্পের উল্লেখ করা যায়। 'সমস্যাপূরণে' ঝিঁকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার যখন মোকদ্দমার সময়ে কাশী থেকে এসে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনকে প্রতিদ্বন্দ্বী অছিমদ্দিনের অসামাজিক জন্মবৃত্তান্তের রহস্য ব্যক্ত করে নিজ পুত্র বলে পরিচয় প্রকাশ করলেন[১], তখন সামাজিক বন্ধনের চেয়ে মানুষকে বড করে তোলা হল; তেমনই 'নামঞ্জুর' গল্পে অমিয়া। অমিয়ার জন্ম অসামাজিক সম্বন্ধের ফলে। তার মা ছিলেন জাতিতে কাহার, পিসিমার যুবতী দাসী। জন্মবৃত্তান্ত অমিয়ার ছিল অজ্ঞাত। নিজেকে সে উচ্চবংশজাতা মনে করত বলেই কাহিনীকারের প্রতি অনাথা হরিমতির সেবা সে সুনজরে দেখেনি। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাবের ফলে যখন অমিয়ার জন্মরহস্য ব্যক্ত হল ও অনিল দূরে সরে গেল[২] তখন সমাজ বন্ধনের উর্ধ্বে মানুষের জয়গানই ধ্বনিত হল। এরই বিরাট রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'গোরা'র মধ্যে। গোরাও অন্ধভাবে হিন্দু সংস্কারকে অবলম্বন করেছিল। সুচরিতা তার মনে পরিবর্তন আনলেও অন্ধসংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। তার সংস্কারমুক্তি ঘটল সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে সে জানতে পারল যে সে হিন্দু নয় সে আইরিশ সন্তান। এই জন্মকাহিনী প্রকাশ হওয়ার ফলেই সে সমস্ত আচারবন্ধনের চেয়ে মানুষকে বড় করে চিনতে শিখল।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এই ঔদার্য এসেছে তাঁর নিজস্ব ধর্মচিন্তা ও অনুভূতির ফলে, কোন শাস্ত্র বা প্রথাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে নয়। নিজের মধ্যে যে চেতনা গড়ে উঠেছে, উপনিষদের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে তা মিলিয়ে নিয়েছেন মাত্র। এরই পরিচয় পাওয়া যায় 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে। ভর্তৃহীনা জাবাল পুত্র

১। সমস্যাপূরণ—গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২১১

২। নামঞ্জুর—গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৭২৫

সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য যখন ঋষি গৌতমের কাছে নিজের প্রকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন তখন ঋষি তাঁকে বললেন,—

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত।"[১]

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই দ্বিজোত্তম শব্দ পাওয়া যায় না। ঋষি গৌতম বলেছিলেন, —"নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।"[২] অর্থাৎ 'অব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারে না, হে সৌম্য, তুমি সমিধ আহরণ কর, তোমাকে উপনীত করিব, তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।' দ্বিজোত্তম শব্দের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ মানুষ সত্যকামকেই বরণীয় করে তুলেছেন। তবে বঙ্কিম সাহিত্য আলোচনা করে একথা বলা বোধ হয় দোষের হবে না যে এই ধরনের উদারতা ও সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অভিরামস্বামী' সর্বাগ্র গণ্য।

তবে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্বের ঔদার্য রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর ছিল। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দিলেও এই বিধবাবিবাহকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেন নি।

উপন্যাসের পরিণতিতে সেইজন্য কুন্দর জীবনের বিনিময়ে সূর্যমুখীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে বিধবাবিবাহ না দিলেও বিধবার অন্তরের প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর কোন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। কিন্তু অসামাজিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রেমকে হীন বলে কল্পনা করা যায় না। 'চতুরঙ্গে'ও বিধবা ননীবালার সঙ্গে শচীশের বিবাহ সম্পন্ন না হলেও এই বিবাহ ব্যবস্থা শ্রদ্ধার বস্তু। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে একটা গভীর পার্থক্য (Vital difference) দেখা যায়। 'চতুরঙ্গে' বিধবা দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের যে বিবাহ তিনি দিয়েছেন তা তুচ্ছ বিধবাবিবাহের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে বলে মনে হয় না। অবস্থাবিশেষে বিধবা বিবাহের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ত এর মধ্যে আছেই, তাছাড়া

১। ব্রাহ্মণ—কথা-রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৬২০

২। ছান্দোগ্যোপনিষদ—উপনিষদ গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয়ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৩৪

এর মধ্যে দিয়ে প্রেমের এক অনির্বচনীয় বিশ্বজনীনতা, ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। বস্তুতঃ দামিনীর বিবাহ সামাজিক ঘটনাই নয়, মানবজীবনের ঘটনা ও মানবহৃদয়ের ঘটনা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করিয়াছিল, তবে এ বিবাহ সাধারণ ঘরসংসার পাতিবার বিবাহ নহে—ইহা আইডিয়ালের ভাঙ্গাচোরা গড়া সম্বন্ধ।"[১] মূলতঃ এই বিবাহের মধ্যে আদর্শই মুখ্য নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধস্থাপন গৌণ। এই ধরনেব ছবির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না। কারণ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একক এবং অদ্বিতীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রেম, বিধবাবিবাহ, নারীর পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি ছবি অজস্ররূপে চিত্রিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দামিনী, শচীশ, শ্রীবিলাস জাতীয় কোন শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলতে পারা যায় এমন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা নেই।

"আমি বলিলাম, দামিনী আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমন কি, তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না করাও তা, অতএব তোমার কোন ভাবনা নাই।

দামিনীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।...

দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মত ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই তুমি আর এই তুমির মাঝখানে ওটা একটা কেবল ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।"[২] ঠিক এই শ্রেণীর দ্বিতীয় চরিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্ত ধর্মের কথা না হলেও ধর্মচিন্তার প্রতিফলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।

শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা ক্ষেত্রেও ধর্ম উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেছেন। যদিও উপন্যাস সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে এতে শিল্প রচনার হানি

১। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, ১৩৫৫—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৬
২। চতুরঙ্গ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৪০১—৪০২

ঘটেছে। উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করলে উপন্যাসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে গীতার বাণী দিয়েছেন তা তখন প্রশংসা পেলেও আধুনিক বিচারে এতে শিল্প হানির কথা আসে।

উপন্যাস লেখকের জীবনদর্শন বা নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বের উপলব্ধি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হতে পারে, কিন্তু তা উপন্যাসের সঙ্গেই জড়িত থাকবে। উপদেশ হিসাবে সেগুলি বহিঃপ্রদেশের সামগ্রী হয়ে থাকলে, যেমন বঙ্কিমের এ দুটি উপন্যাসে হয়েছে, তাকে উপন্যাস শিল্পের অনুকূল বলা যায় না।

বঙ্কিমের উপন্যাসে যেখানেই ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে সেখানে বঙ্কিম নিজে গীতাহস্তে আবির্ভূত হয়েছেন। 'আনন্দমঠে' যখন সত্যানন্দ ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বরের পরিচয় দিয়ে বলেন,—'এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি। তাঁহার উপাসনা ভক্তি দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি, ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধনদ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান শরীরী চতুর্ভুজাদিরূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করেন।'[১] অথবা 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল যখন বলেন,—'কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি, কর্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্মোদ্ধারের জন্য যে সুখদুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই; তাঁর কর্মের জন্য যাহা করিতে হয় করিব।'[২] —তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কনায়িকারা তাঁরই শিষ্যরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও এমন ভাব নেই। যেমন 'গোরা'। 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ ধর্ম, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও তাঁর মতামত সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোথাও লেখক নিজে এসে দেখা দেননি। কোন সমস্যা বা ধর্মচিন্তা উপন্যাসের বহিঃ-ক্ষেত্রে এমনকি উপন্যাসের সৌধ আবরণের বাইরের পরিধিতেও দেখা দেয়নি। উপন্যাসের অন্তঃক্ষেত্রে নায়কনায়িকার জীবনের মধ্যে এই সমস্ত ধর্ম ও সমাজ চিন্তা অবিচ্ছিন্ন হয়ে জড়িত হয়ে রয়েছে। সেইজন্য যখন গোরা পরেশবাবুকে বলে,—'আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেইজন্যই আপনি আজ

১। আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, তৃতীয়ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, পৃঃ ৩৬

২। দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৭

কোনো সমাজেই স্থান পাননি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না,—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'[১] তখন সে কথা রবীন্দ্রনাথের উপদেশ বলে বোধ হয় না। গোরার জীবনের কথা বলে বোধ হয়। তেমনই পরেশবাবুর ধর্মজীবনের আদর্শের মধ্যে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আছে এবং যে মহর্ষি পিতৃদেবের আদর্শ জীবন থেকে তিনি এই চরিত্রের ইঙ্গিত পেয়েছেন স্থানে স্থানে তারও কথা মনে হয়। কিন্তু একথা কেউই বলবেন না যে তার মূর্তি ধরে রবীন্দ্রনাথ উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়েছেন। উপন্যাসের কলাকৌশল প্রসঙ্গে একথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন ও ধর্মাদর্শের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উপনিষদের আদর্শে এক অনির্বচনীয় অখণ্ড আনন্দময় সত্তার মধ্যেই মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর উপন্যাসগুলিতেও এই ভাব দেখা যায়। একথা আগেই বলা হয়েছে যে সংসার ত্যাগ করে যে বৈরাগ্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও তা অনুমোদন পায়নি।[২] কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগকে অস্বীকার করেননি। ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতিও যেমন তিনি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন সর্বস্ব ত্যাগের তথাকথিত মহিমাকেও তেমনি তিনি কোথাও গৌরব দেন নি। সংযমের ভিত্তিতে ভোগ ও ত্যাগের বিস্ময়কর সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র দর্শনের প্রধান রূপটি ফুটে উঠেছে। উপনিষদের ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ কর) কিন্তু তেন ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা) এই আদর্শই তিনি তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর নাটক ও উপন্যাসাদির মধ্য দিয়েও এইভাব কীর্তিত হয়েছে। তাই ভারতীয় আদর্শ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—'ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।'[৩]

১। গোরা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৩৫৫

২। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপট) দ্রষ্টব্য।

৩। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৯০৫

মনে হয় শিশুকাল থেকে যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন তার কারণ বঙ্কিমের জীবনে তিনি এই সংযমের আদর্শ লক্ষ্য করেছিলেন। হয়ত বা সেইজন্যই উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত মধুসূদনের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল পার্থিব জগতের বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ নিয়ে অন্তে অনন্তের স্পর্শলাভ। অর্থাৎ দিব্যচেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত পার্থিব অনুভূতিকে অনন্তের দিকে পরিচালিত করা। এই কারণেই তিনি বলেছেন,—'ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া ওঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।'[১] সেইজন্য 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'র প্রতিভূ ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বার রূপায়িত হতে দেখা যায়।[২] সন্ন্যাসীর আদর্শই প্রকৃত রাজার আদর্শ। বৈরাগ্যই ঐশ্বর্যকে মহীয়ান করে তোলে। এই কারণেই 'শারদোৎসবে' রাজা যখন বিজয়াদিত্যের কাছে এমন উপদেশ প্রার্থনা করলেন যার অনুসরণ করে তিনি রাজত্ব করার উপযুক্ত হতে পারেন, তখন সন্ন্যাসীবেশী বিজয়াদিত্য তাঁকে বললেন,—'উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।'[৩] 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'র এই এক রূপ গেল। এর আর এক রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'ফাল্গুনী'তে। মথাদেব কাহিনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর প্রস্তাবনা অংশে অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। 'ফাল্গুনী'তে উদ্‌ভ্রান্ত রাজাকে কবিশেখর সাহস দিয়ে বলেছেন,—'এ যৌবন ম্লান হল ত হোক না।

১। ব্রহ্মমন্ত্র, পৃঃ ৬২৯, উপনিষদ ব্রহ্ম, পৃঃ ৬৩২—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত।

২। রবীন্দ্র সাহিত্যে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বারে বারে নানা নামে নানা সাজে প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আদর্শ চরিত্র, যিনি ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে বরণ করিয়াছেন, যিনি 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই ঋষি-বাক্যকে জীবনে সার্থক করিয়াছেন।—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৬

৩। শারদোৎসব—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২১২

আরেক যৌবন লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্রমল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।'[১] দৈহিক জীবনের অন্তে এই নবীন যৌবনের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে কবিশেখর বলেছেন,—'সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।'[২] এইভাবেই ভোগবতী পার হওয়ার পর কর্মের দ্বারা ত্যাগের মধ্যে ভোগের আদর্শ রূপায়িত হয়। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সেই শ্রদ্ধা তাঁর কাব্যে ও প্রবন্ধেও তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এর মূলেও তাঁর সেই আদর্শ, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' রয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর বুদ্ধত্বলাভের পর কর্মে প্রবৃত্ত হলেন, যে কর্ম লোভ স্বার্থের অতীত, যে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম।[৩] রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসের যে আদর্শ 'চিরকুমার সভা'য় শ্রীশের মুখে তার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়।[৪] পরবর্তী-কালে 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটকে শ্রীশের উক্তির আদর্শ অনুযায়ী গৃহস্থ সন্ন্যাসীর রূপায়ণ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানবজীবনের এবং মানব সংসারের যত ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া প্রীতি ইত্যাদি অনুভূতি ঈশ্বর প্রেমেরই নামান্তরমাত্র। 'ক্ষণিকা'য়

১। ফাল্গুনী—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯

২। ফাল্গুনী—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৪৫৩—৫৪

৩। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষত্বই এই যে, একদিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ, অন্যদিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে।...যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভ করিলেন তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই, তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত, তাহা দয়ার কর্ম, প্রেমের কর্ম।—বুদ্ধদেব—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৪৮৩

৪। আমাদের চিরকুমার সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। আমরা একদিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের কোন উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং লালিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব ঘটবে।
—চিরকুমার সভা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৭৩০

ব্যঙ্গ ও সংকল্পের সংমিশ্রণে যার প্রকাশ,[১] 'নৈবেদ্যে' তারই পূর্ণতর রূপ দেখতে পাওয়া যায়,—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ!'[২]

রবীন্দ্রদর্শনের এইটিই মূলকথা। সমগ্র রবীন্দ্রদর্শনে এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে,—

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।[২]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমসাধনার সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—'প্রেমের সাধনাই সাধকদের যথার্থ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার মূলকথা এই প্রেমতত্ত্ব, তাঁহার কাব্যসাধনা এই বিভিন্ন অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া,—তাঁহার কর্মযোগও এই প্রেমের প্রকাশ।'[৩] রবীন্দ্রনাথ যে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধনা করেছেন সে ত্যাগের অর্থ মুক্তি নয়। প্রেম এবং ত্যাগের মধ্যে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। প্রেম না হলে ত্যাগ সম্ভব নয়। ঈশ্বর এই প্রেমের ভিখারী। তাঁর এই ভিক্ষুকরূপ 'খেয়া'য় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে কখন 'রাজার দুলাল' রূপে, কখন 'মেয়ে' রূপে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,—'ভগবানে ও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ, এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করেছেন। এই দেওয়া পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।......দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি Personal

১। আমি হবো না তাপস, হবো না, হবো না,
যেমনি বলুন যিনি,
আমি হবো না তাপস, নিশ্চয়, যদি
না মেলে তপস্বিনী।—ক্ষণিকা, (১৩৬১)
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৮

২। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৮৭৪

৩। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৪

কি Impersonal। প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না এক সঙ্গে মিলে আছে।'[১] 'চোখের বালি'তে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর যে প্রেম, ত্যাগের মধ্য দিয়েই সে প্রেম মহীয়ান হয়ে উঠেছে। এই প্রেমের বশবর্তী হয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়েই রাজা গোবিন্দমাণিক্য ঋষিতে পরিণত হয়েছেন, হয়েছেন রাজর্ষি।

সংসারকে অবহেলা করে যারা ঈশ্বর ও পরমার্থের দিকে ঝুঁকেছে তাদের জীবনব্যাপী সাধনা যে বৃথা এবং অর্থহীন তা রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট করে তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্ফুরণের প্রথম যুগের 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ইত্যাদি নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য (Motive) মানবসমাজের স্নেহমায়া প্রভৃতি ত্যাগ করে যে ঈশ্বর খুঁজতে যায় সে ভুল করে এবং প্রকৃতি তাকে ক্ষমা করে না। এমন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে প্রকৃতি কিভাবে বিড়ম্বিত করে, নিতান্ত কিশোর বয়সের রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' তা দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের মূলকথা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়',—এর ইঙ্গিতও 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী ধর্মভ্রষ্ট রঘুকন্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল এই অহঙ্কারে যে সে সকল মায়া জয় করে সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। পক্ষান্তরে এই অহঙ্কারই হয়ে দাঁড়াল তার জীবনের পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় সে হল পরাজিত। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' অবশেষে সন্ন্যাসীকে প্রকৃত সত্য স্বীকার করতে হল,—

'যাক রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত।
দূর করে ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু।
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী।
পাষাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।

১। শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ১১৪

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে।'[১]

সন্ন্যাসী পৃথিবীকে তুচ্ছ মনে করেছিল, সংসারকে মনে করেছিল সীমাবদ্ধ।[২] কিন্তু সীমার মধ্যেই যে অসীমের লীলা, এই সত্য সে তখন উপলব্ধি করতে পারেনি। উত্তরকালের গান,—

'সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'[৩]

এই তত্ত্বের প্রকাশও 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রূপায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে দস্যু রত্নাকর যে বাল্মিকী হয়েছিল সে শুধু বাঁশীর রব শুনে নয়, সমস্ত জীবসংসারের দুঃখ দেখে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে কবি তাই দেখিয়েছেন। দলবলসহ শিকারে গিয়েও সুকুমার হরিণ-শিশুকে দেখে বাল্মীকির মন ব্যথিত হয়ে উঠেছে। অবশেষে তিনি বলেছেন, 'জগত চরাচর, সব শোভাময় নেহারি।'[৪] পরবর্তী কালের রচনা 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটকেও একই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁর ধর্মচেতনার মধ্যে প্রধান বস্তু এই যে প্রকৃতির অমোঘ বিধান সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। কারণ এই বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতিকে আয়ত্বাধীন না করতে পারলে মানুষ ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে। যে দর্শনে সংসারকে মায়া এবং সমস্ত সৃষ্টিকে অর্থহীন মনে করা হয় সে দর্শনে তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল বলে মনে হয় না। তাই মায়াবাদীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন,—

১। প্রকৃতির প্রতিশোধ—রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২১০

২। এ কী ক্ষুদ্র ধরা। এ কী বদ্ধ চারিদিকে।
আজ যেন এরা সব ছোট হয়ে গেছে
দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।
—প্রকৃতির প্রতিশোধ—রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩-৪৪

৩। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২৯২

৪। বাল্মীকি প্রতিভা—রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৫০৯

লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।[১]

কবির মতে প্রতিদিনের অন্তর ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য, মানব ও নিসর্গের মধ্যে যার প্রকাশ, তাকে মায়া বলে উপেক্ষা করার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা। আসলে এই মায়া সত্যের চেয়েও বেশী শাশ্বত। এই মায়াকে উপেক্ষা করার মধ্যে মানবাত্মার মুক্তিলাভ কখনই হতে পারে না। কেবল তত্ত্ব কথা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেন নি, সত্য হিসাবে অন্তরের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করেছেন।[২] এই বিশ্বপ্রকৃতি ও সংসারের মধ্যেই যার আত্মপ্রকাশ সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রকৃতপক্ষে বৈরাগী তাকেই ত্যাগ করে যায়,—

কহিলা গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?
দেবতা কহিলা, আমি—শুনিল না কানে···
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?[৩]

১। মায়াবাদ—সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪২

২। আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে, এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি এবং স্নিগ্ধ সন্ধ্যা সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্তললাটে স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জলস্থল আকাশ, এই নদী কল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক আধখানা জেলে ডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকারমিশ্রিত বনশ্রেণী বেষ্টিত সুপ্তিময় গ্রাম সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়। অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে—এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি একথা কিছুতে মনে হয় না।

—ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৩

৩। বৈরাগ্য—চৈতালী, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৫৪৫

এই তত্ত্ব তাঁর বহু কাব্যগানে বিচিত্রভাবে বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন 'সোনার তরী'র 'পরশপাথরে' ক্ষ্যাপার যে ব্যর্থ অভিযান ও অনুসন্ধান, তার সঙ্গে বৈরাগীর গৃহত্যাগ তুলনা করা যেতে পারে। তেমনিই দেবমন্দিরের মাঝে প্রধান ভক্ত যখন রাত্রিদিন আরাধ্যদেবতার উপাসনা করছে, তখন ভ্রমের মধ্য দিয়েই তার প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি হল ;—

সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যারে।
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"[১]

বিশ্বজগৎকে অস্বীকার করার মধ্যে যে শান্তি তার মধ্যে নয়, সংসারের দুঃখ ও অশান্তির দোলায় অসীমের লীলার যে অনুভব রবীন্দ্রনাথের তাই আকাঙ্ক্ষার বস্তু[২]

উপন্যাসেও তাঁর এই আদর্শই নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'রাজর্ষি'তে গোবিন্দমাণিক্য প্রেমভালোবাসার বশবর্তী হয়ে শিশু ধ্রুবর মধ্যে ধন্য হয়েছিলেন। শিশুর মধ্যদিয়ে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করেন। "তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান।...শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান, সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ—চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

১। দেবতার বিদায়—চৈতালী, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৫৪৪

২। তোমার কাছে শান্তি চাব না
থাক না আমার দুঃখ ভাবনা
অশান্তির এই দোলার পরে বসো বসো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা। —গীতিমাল্য—

রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪

মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্ত-লোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়।"[১]

'চতুরঙ্গে' শচীশ লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিণামে নিজের ব্যর্থতাই সে অনুভব করেছিল। জ্যাঠামশাই সে ভুল করেননি। নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়ে, সংসারকে ত্যাগ না করে মানুষকে সকলের উপর স্থান দিয়ে তিনি জীবনকে সার্থক করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসেও গোরা প্রেমভালোবাসার উপরে হিন্দুধর্মের লৌকিক আচার পদ্ধতিকেই স্থান দিয়েছিল। কারামুক্তির পর তার অবচেতন মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীর আঘাতে হৃদয়ে দ্বিধা জাগলেও তার সংস্কারমুক্তি হয়নি, বরং সেই সংস্কারকেই সে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পেয়েছে ও প্রেমভালোবাসার সহজ সত্যকে স্বীকার করতে চায়নি। জন্ম রহস্য উদঘাটনের আঘাতে সে প্রেমের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করেছে, প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ দ্বার ভেঙে মুক্ত আলোকে ব্যর্থ আচার পদ্ধতির উপর প্রেমের আসনে প্রকৃত সত্যকে তখনই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

আচারের তুচ্ছতা মানুষকে সার্থক করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ আচার সংস্কারের বশবর্তী হয়ে চলে। এই আচার ও সংস্কার মানুষকে পূর্ণ করতে পারে না। প্রেম, পবিত্রতা ও ন্যায়ধর্মই সকল কিছুর উর্ধ্বে সার্থকতা এনে দেয়। 'বোষ্টমী' গল্পে আচারের তুচ্ছতাই তিনি দেখিয়েছেন। বোষ্টমীকে তার স্বামী ও পুত্রই সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিল। কিন্তু বোষ্টমী আচারের মোহে মিথ্যার অন্বেষণে ছিল বলে তাকে এই ভালোবাসার পাত্রকেই হারাতে হল। গোপালকে সে অবহেলা করে এসেছে, সেইজন্য শেষ বিদায়ের মধ্য দিয়ে 'গোপাল' তার মনে চিরন্তন স্থান করে নিল। বোষ্টমী তখন গুরুদেবের সেবার মধ্য দিয়ে মিথ্যা আচারকে বড় করে তুলল, সেইজন্য মোহভঙ্গের পর তাকে হতে হল সত্যপথের পথিক। বোষ্টমী এই কারণেই বলেছে,—"পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"[২]

১। রাজর্ষি—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮

২। বোষ্টমী—গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৬৩৬

'গোরা'য় দেখতে পাওয়া যায় প্রেম ও স্বায়ধর্মকে তুচ্ছ করে হরিমোহিনী আচারের বন্ধনে সুচরিতাকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি। চৈতন্যদেবের আবেগ প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথকে তেমন অভিভূত করতে পারেনি। সেইজন্য চৈতন্য সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য নীরব। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ খুব কমই দেখা যায়। তবু বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীরতা 'বোষ্টমী'তে দেখতে পাওয়া যায়। আচারের প্রাচীর রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বার ভেঙে পড়েছে।

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"[১]

'অচলায়তনে'র গুরু যখন এলেন তখন তিনি এলেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আচারের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে। মহাপঞ্চক ও তার অনুবর্তীরা যে সংস্কার ও আচারকে প্রধান করে তুলে প্রাচীরের আবরণে অন্ধকারকে ব্যাপ্ত করে তুলছিল, যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল সেই অন্ধকারকে অপসারিত করে আলোর বন্যায় সত্যকে প্রকাশ করার। এই ভাবেই কঠিন আঘাতের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষেরা এসে বলেন—"যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোন জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যই আমি এসেছি।"[২] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,—"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে।...'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।... আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেঁধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে

১। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৯৪
২। অচলায়তন—রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৪।

হচ্ছে।"[১] এইভাবেই ঝড়ের মধ্যে আচার ও সংস্কারের জীর্ণ মিথ্যা বাঁধন একে একে খসে পড়ে,—

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতে নবীন সন্ন্যাস সম্প্রদায় গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন কৌমার্য অবলম্বনের একটি চেতনা শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এই ভাবকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার প্রতীকরূপে স্বীকার করতে পারেননি। সেই কারণে 'ক্ষণিকা'য় পরিহাস রূপে লেখেন—'আমি হবো না তাপস'…যা পরে পরিপূর্ণ রূপ পায় "নৈবেদ্যে" "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—এর মধ্যে। সম্ভবতঃ এই ভাবধারাকে বিদ্রূপ করে কৌমার্যের ব্যর্থতা দেখিয়ে তিনি রচনা করেন 'চিরকুমার সভা'। এটি প্রহসন হলেও এর তাৎপর্য কম নয়। কারণ 'চিরকুমার সভা'র বহু চরিত্রই পরে অনেক উপন্যাস ও নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যেমন চন্দ্রমাধববাবুর শান্ত সমাহিত ভাব 'চতুরঙ্গে' জ্যাঠামহাশয়ের মধ্যে ও 'গোরা'য় পরেশবাবুর মধ্যে ফুটে উঠেছে। তেমনিই নির্মলা চরিত্রকে তুলনা করা যায় 'গোরা'র ললিতার সঙ্গে। বিচিত্র চরিত্র রসিকদাদার সঙ্গে 'রাজা' ও 'শারদোৎসবে'র ঠাকুরদা চরিত্রের তুলনা করা যায়।[৩]

একথা আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। কোন শাস্ত্র বা পন্থার অনুসরণ বা অনুকরণ তিনি করেননি। জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে যেমন তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনিই ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য, নিজ গৌরবে ভাস্বর। ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও সহজ জ্ঞানের উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন, কোন গুরুশাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস

১। আত্মপরিচয়—রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ২০০
২। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩
৩। বেদমন্ত্র রসিক রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৫০)—ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৬০১—৬০৮ ও রবীন্দ্র জীবনী—প্রথম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৬২ দ্রষ্টব্য।

ছিল না।[১] কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত সাধন প্রণালীর উপরও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। মানুষের মায়ামমতা স্নেহপ্রীতি ভালোবাসা জগৎ প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়। এই যে গুরুরা সংসার ত্যাগের উপদেশ দিতেন তিনি তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। গুরুবাদের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অবজ্ঞা। উপনিষদে আছে,—'অন্ধেনৈবনীয়মানা যথান্ধাঃ।'[২] রবীন্দ্রনাথও গুরুবাদকে এই চোখেই দেখেছেন। শিষ্যকে গুরুর পথনির্দেশের অর্থ একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। এই কারণে তাঁর বহু উপন্যাস ও ছোট গল্পে গুরুবাদের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে। 'উদ্ধার' ও 'বোষ্টমী' গল্পে সেই ছবির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বোষ্টমী গুরুকে অবলম্বন করেছিল উদ্ধারকর্তা রূপে। কিন্তু অন্ধ গুরু তাকে অন্ধকারের পথ নির্দেশ করলেন। এর ফলে সত্যের সন্ধানে বোষ্টমীকে গুরু ও সংসার দুইই ত্যাগ করতে হয়। 'চতুরঙ্গে'ও লীলানন্দস্বামী গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে শিবতোষ, শচীশ, শ্রীবিলাস বা দামিনী কাউকেই পথ দেখাতে পারেন নি। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় গুরুপদে অধিষ্ঠিত না হয়েও যে পথ দেখিয়েছেন, সে পথ শাশ্বত পথ।

গুরুবাদের মূল নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা হয়েছে যে আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে যে গুরুবাদ দেখা যায় তার উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম হতে।[৩] প্রশ্ন উঠতে পারে তবে বুদ্ধদেবকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কেন? তাঁর শ্রদ্ধার কারণ বুদ্ধদেবের মধ্যে রয়েছে মানবপ্রেম। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোন চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই।... এইরূপে বৌদ্ধধর্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। মুণ্ডকোপনিষদ, পৃঃ ২২৩, কঠোপনিষদ, পৃঃ ৯০—উপনিষদ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ, ১৩৪৮—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

৩। আমরা পূর্বে একস্থানে আভাস দিয়াছি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণব ধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুতে দেবতা জ্ঞান করা ও তাহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে।—বুদ্ধদেব—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪।

করিয়াছে।"[১] সেইজন্য যখন জাপান চীনকে আক্রমণ করে, তখন যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে জাপানী সৈনিক কর্তৃক বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সংবাদে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, যার প্রকাশ 'নবজাতকে'র 'বুদ্ধভক্তি'তে। একই কারণে খৃষ্টকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কারণ—"খৃষ্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে—মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটাই খৃষ্টধর্মের বড়ো কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।"[২] অর্থাৎ গুরুবাদে নয় বুদ্ধ ও যীশুর দর্শনতত্ত্বের জন্যই তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কেবল অন্তরের উপলব্ধিতেই দিব্যচেতনা লাভ হয়, বাইরের আর কোন কিছুর সাহায্যে লাভ করা যায় না। ধর্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ (মহাভারত, বনপর্ব, ২৬১।৮৪)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এই সত্য নিজে পেতে হবে। কারণ ধর্ম এমন বস্তু নয় যা অন্যের দ্বারা লাভ করা যায়।

জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের মত বিরোধী। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণাশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। তবে বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। অর্থাৎ যারা জন্মের মধ্য দিয়ে বর্ণ লাভ করেনি, কর্মের মধ্য দিয়ে বর্ণলাভ করেছে। এইজন্য প্রকৃত ব্রাহ্মণের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সেই কারণে তিনি 'ব্রাহ্মণে' জাবালপুত্র সত্যকামকে 'দ্বিজোত্তম' নামে অভিহিত করেছেন। কারণ সে 'সত্যকুলজাত'। 'চতুরঙ্গে' শচীশ সোনার বেনে, যদিও শ্রীবিলাস তাকে প্রথম দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ বলে ভ্রম করেছিল। শচীশ কর্মেও ছিল ব্রাহ্মণ। হয়ত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আদর্শ থেকে তিনি শচীশকে অব্রাহ্মণ করেছিলেন। নিজ কর্মবলে নরেন দত্ত ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হয়েছিলেন। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের আদর্শও এর পিছনে থাকা অসম্ভব নয়। 'সতী' নাটকে জীবাজির চিতায় যবনপত্নী অমাবাইকে পূর্বের বাগ্‌দত্তার অজুহাতে পুড়িয়ে মারাও জাতিভেদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি বলা যায়। 'গোরা'য় ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জাতিভেদ প্রভৃতির বহু উদাহরণের মধ্য দিয়ে মানবতার আদর্শ প্রতিফলিত করা হয়েছে। গোরা লছমিয়াকে অস্পৃশ্য

১। বুদ্ধদেব—রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৪৮৪—৮৫

২। খৃষ্ট—রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭

করে রেখেছিল, দেশভ্রমণের সময় মুসলমানপাড়া চরঘোষপুরে এসে একমাত্র হিন্দুঘরে অন্নগ্রহণে বাধা অনুভব করেছে, কারণ সে জাতে নাপিত। কারামুক্তির পর গোরা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু জন্মপরিচয় লাভ করার পর তার সমস্ত অলীক জাতি অহঙ্কার ভেঙ্গে গেল। সেদিন থেকে গোরা অনুভব করল যে সে ভারতবাসী। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন সমাজের বিরোধ নেই, কোন জাতির বিরোধ নেই। সকলের জাতই তার জাত, সকলের অন্নই তার অন্ন।[১] কার্লাইলের Citizen of the world—হচ্ছে গোরা। 'চতুরঙ্গে' জ্যাঠামহাশয় সমস্ত জাতিভেদের বিরুদ্ধে। তার কাছে সমস্ত একাকার হয়ে গিয়েছে। এই জ্যাঠামহাশয়ের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায় 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর পিতার চরিত্রের মধ্যে।

রামমোহন রায় যে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত করেন কেশবচন্দ্র সেনের সময় হতে তাতে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় হতে জাতিভেদ বা বর্ণভেদের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়নি। হিন্দুসমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কঠিন ব্যবধান রচনা করেছিল তার লোপ করাই ছিল ব্রাহ্মসংস্কারকদের সমষ্টিমুক্তির উদ্দেশ্য। তাঁরা মনে করতেন যে অন্য সমস্ত শিক্ষা এরই পারম্পর্য ফলে নিজের থেকেই হবে। কিন্তু শতাব্দীর অন্ধ সংস্কার ভেদ করে সেই আধ্যাত্মিক বাণী জনগণের কাছে পৌঁছুল না। সেইজন্য সংস্কারকেরা সমাজের জড়তা ও মূঢ়তা দূর করতে অগ্রসর হলেন। এইভাবে ধর্মসংস্কারকেরা পরিণত হলেন সমাজ সংস্কারকে। কারণ তাঁরা ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা হতে সমষ্টিগত জনসেবার মধ্যে গণমুক্তির বাণী প্রচার করা উচিত বিবেচনা করলেন। এর পর স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী ঘোষণা করলেন, বিবেচনা করলে দেখা যাবে সেই বাণীও জনসেবার বাণী, গণমুক্তির বাণী নয়। কারণ বিবেকানন্দের কর্মযোগী সন্ন্যাসীরা সংস্কারের চেয়ে জনসেবার জন্যই বেশী উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথও সমষ্টিমুক্তি চেয়েছিলেন, তবে সেই আকাঙ্ক্ষা সংস্কারের নীরস কর্তব্যের পথে বা সেবাকাজের হৃদয়ের ভাবালুতার মধ্যে নয়। রবীন্দ্রনাথের বাণী হচ্ছে হৃদয়ের পরম শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, জাগ্রত করে, আধ্যাত্মিক ও আত্মসম্মানের অধিকারী করে সকল কর্ম সম্পাদনের অধিকারী হওয়া,—

১। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।—গোরা—রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৩৪৭।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,...
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।[১]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মানবতার আদর্শ, কোনো লৌকিক বা সম্প্রদায়গত ধর্মমতের পরিপন্থী নয়। সেই কারণেই তাঁর পক্ষে কোন সংস্কারের কাজে নামার প্রয়োজন হয়নি বা কোন সমিতি স্থাপনও আবশ্যক হয় নি।[২] 'নৈবেদ্যে' এই মানবতার বাণী প্রচারিত হয়েছে বলে প্রথম অংশে ধ্যানজীবনের ও দ্বিতীয় অংশে কর্মজীবনের অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। কারণ মানবতার মধ্যে ত্যাগ ও কর্মের সমন্বয় সাধিত হয়। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"ত্যাগ শিক্ষার পদ্ধতি হইতেছে কোনো মঙ্গলকর্মের মধ্যে আপনাকে উৎসর্জন। এই মঙ্গল যে কি তাহা কবি বহুবার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মানবকে কেন্দ্র করিয়া এই মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান, ইহা সামান্যভাবে লোকহিত নহে, ইহা কর্মযজ্ঞ বা কর্মযোগ, ইহা আত্মদান।"[৩] কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই চরম আশ্রয় সেই সর্বশক্তিমান। "আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে।"[৪] এই কর্মযোগে সর্বশক্তিমান কেবল আমাদের অন্তরেই নেই, তিনি আছেন বিশ্বজগতে সর্বমানবের সঙ্গে,—

১। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৮৭৪
২। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ১৩৫৫—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২-৩ দ্রষ্টব্য
৩। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৭২
৪। কর্মযোগ—শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮।

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।"[১]

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যদিও প্রবন্ধ লিখে কোথাও সুস্পষ্ট ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন নি, কিন্তু তাঁর কাব্যগান ও নাটকের মধ্য দিয়ে তাঁর যে মতামত প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর জন্মান্তরবাদের সমর্থনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কখনও বা এই মতামত রূপকের আকার ধারণ করেছে, কখনও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যগানে এই জন্মান্তরবাদের যে প্রকাশ তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—

১। পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোন দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে—
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপন হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে নাকি দেখাশোনা তোমায় আমায়![২]

২। যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে![৩]

৩। এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার।[৪]

১। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯১
২। পদ্মা—নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০-৬১
৩। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৯
৪। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪০

৪। আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।[১]

৫। মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে
তারপরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।[১]

৬। তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।[২]

বৌদ্ধদর্শনের প্রধান কথা জন্মান্তরবাদ। বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। জন্মান্তরবাদকে অবজ্ঞা করলে বুদ্ধকে তিনি এমন ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যু স্নানে বিশ্বের জীবন।[৩]

১৩৩৫ সালের নববর্ষের ভাষণে তাঁর প্রায় আট মাস পূর্বের অসুস্থতার অভাবনীয় অনুভূতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহ তন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।"[৪] এর মধ্যে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। তাছাড়া স্টপফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে কবির জন্মান্তর প্রসঙ্গে আলোচনাও উল্লেখযোগ্য,—"কথায় কথায় তিনি এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তর বিশ্বাস করি কিনা। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়,

১। গীতালি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪১, ৪১৫
২। বিচিত্র—রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২১
৩। চঞ্চলা—সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৪৭
৪। রবীন্দ্রজীবনী—৪র্থ খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৮

ইহা কথনো হইতেই পারে না যে, আমাদের জীবনধারার মাঝখানে এই মানব-জন্মটা একেবারে খাপছাড়া জিনিস—ইহার আগেও এমন কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনও হইবে না ; যে কারণবশতঃ জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে এইটাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।"[১] তাঁর নানা নাটকের মধ্যেও জন্মান্তর বাদের সমর্থন পাওয়া যায়। জীবন অমর। প্রকৃতিতে শীত বসন্তের যে লীলা চলছে, মানবপ্রকৃতিতে জরা যৌবন এবং জন্ম মৃত্যুতে সেই একই লীলার মধ্য দিয়ে জীবন নব নব রূপে রূপায়িত হচ্ছে—এই হল 'ফাল্গুনী'র বিষয়বস্তু, এই মত কলকাতায় 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক চিঠিতে প্রকাশ করেছিলেন।[২] উপনিষদে দেখা যায় যে জরামৃত্যু সম্বন্ধে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলেছিলেন যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জরামৃত্যু কল্পনামাত্র। জরা মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন অন্যভাবে। তিনি এ জগৎকে অপূর্ণ ও অপর জগৎকে পূর্ণ বলেননি, অপূর্ণতাকে সামান্য জ্ঞান করেন নি। তিনি বলেছেন অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন আলোর নব নব বিকাশ ঘটে, তেমনি জরা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবজীবনের নব নব বৈচিত্র্য বিকশিত হয়ে ওঠে। 'ফাল্গুনী'র তৃতীয় দৃশ্য 'সন্দেহে'র মধ্যে জরামৃত্যু সম্বন্ধে মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। চতুর্থ দৃশ্য 'প্রকাশে'র মধ্যে দেখা যায় চন্দ্রহাস বাউলের উপদেশ মত চলতে চলতে যখন মৃত্যু গুহায় প্রবেশ করে চিরন্তন জরাকে ধরে ফেলল, তখন দেখতে পেল যে তার রূপ বালকের রূপ। শুধু বালকের রূপই নয়, যে সর্দারের প্রেরণায় তারা সন্ধানে বেরিয়েছে, সে সেই সর্দার। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'বলাকা'য়,—

১। রবীন্দ্র জীবনী—২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৮-৭৯।

২। 'ফাল্গুনী'র ভিতরের কথাটি অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বার বার নবীন করে নিতে হয়।......বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীত বসন্তে, মানব প্রকৃতিতে সেই লীলা জরা-যৌবনে, জন্মমৃত্যুতে। এই কথাকেই গীতে এবং নাট্যে 'ফাল্গুনী'তে প্রকাশ করা হয়েছে।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৮—সুকুমার সেন, পৃঃ ২৫৭-৫৮

লিখেছে সে

এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথ শেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার,......
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।[১]

রবীন্দ্রনাথ এক অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখেছিলেন,—"জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক, ওর সামনের দিকটা যৌবন, এইজন্য জগতে চারিদিকে যৌবনটাই দেখছি, আর জরাটা যেন তার পিছনে সরে সরে যাচ্ছে। তাকে এই দেখছি আর পরক্ষণেই দেখছি নে। যেই শীতে সমস্ত ঝরে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই, বসন্ত এসে পূর্ণ করে বসেছে। তার থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকে পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়, এইজন্য সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়, হারিয়ে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যদি না চলে পুরাতন আর নতুন হয় না—আমাদের প্রাণকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি।"[২] রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদের সঙ্গে হেগেলের দর্শনতত্ত্বের তুলনা করা যেতে পারে। হেগেলের মতে যা Dialectic movement of life বা Non-being—এর মধ্য দিয়ে Being—এর চিরনবীনতা, রবীন্দ্রনাথের মতে তাই ক্রিয়াশীল পরিণতির মধ্যে মানবের অমরতা বা মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের অমরতা ও প্রতিষ্ঠা।[৩]

রবীন্দ্রনাথ সত্যকেই ব্রহ্ম বলে জেনেছেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এই পরম সত্যকে বিশ্লেষণ করা। এমন কি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের জন্য মানুষকে যে মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথা বলতে হয় তাও তিনি

১। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী—২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৪৭১

২। রবিদীপিতা—তৃতীয় মুদ্রণ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ২৩—২৪ দ্রষ্টব্য।

৩। হেগেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্বের সাদৃশ্যের জন্য সপ্তম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপট] দ্রষ্টব্য।

সমর্থন করেন না। তাঁর মতে,—"কাঠকে দগ্ধ করে আগুন যেমন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে অবিদ্যাকে মায়াকে দগ্ধ করেই কি সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না! আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতিলাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?"[১] "হৈমন্তী" গল্পে হৈমন্তী এবং তার বাবা দুজনেই সংসারের ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও মিথ্যাকে অবলম্বন করেনি। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী ও কল্যাণীর বাবা দুজনেই সত্যপথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না এই পণ যদি না করত তবে পার্থিব লাভ ক্ষতির বিচারে লাভবান হত, কিন্তু অন্তরের বিচারে হতে হত অপরাধী। এই কারণেই পার্থিব লাভালাভকে তারা দুজনেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। জগতের সমস্ত সত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই অনন্ত পুরুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, তত্ত্বকথার মধ্যে নয়।[২]

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন
জয় জয় সত্যের জয়।[৩]

সত্য ও আনন্দ অভিন্ন, ব্রহ্মের প্রকাশ যেমন সত্যের মধ্যে, তেমনিই আনন্দের মধ্যে। এই বাণী নানাভাবে নানা রচনার মধ্যে প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতে জাত।"[৪] সর্বশক্তিমান নানাভাবে তার

১। মত—শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ১৭৮

২। সত্য হতে অবিচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করা সাজে। কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন, 'এষঃ,' 'এই যে তিনি' সেখানে ত কোন কথা বলা চলে না। —ছোট ও বড়—শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮

৩। বিচিত্রা—রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০

৪। উৎসব—ধর্ম; রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ৭

আনন্দ দিচ্ছেন, মানবের আনন্দ লাভ করার জন্য। এইজন্য সেই অসীম শক্তি নিজেকে সীমার বন্ধনে প্রকাশ করছেন, কারণ তা না হলে প্রেম প্রকাশ হত না।[১] এই আনন্দের, এই প্রেমের কথা প্রকাশ পেয়েছে 'শারদোৎসবে', 'ফাল্গুনী'তে, 'ডাকঘরে'; প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অজস্র কাব্যগানে, যেমন,—

'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।'[২]

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে হলেও প্রাচীন শাস্ত্রের সংস্কার ছিল তাঁর জন্মগত। সেই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বরজ্ঞান থেকে তাঁর ঈশ্বরের ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজেরই অনুবর্তী। সেই কারণে 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরধারণাকে 'খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরে'র উপাসনা বলে নিন্দা করেছেন।[৩] ১২৯১ সালে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে যদিও তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম নামে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তস্থলে প্রবেশ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে এভাবে সীমায়িত করে দেখলে ধর্মসাধনা বাধা পায়। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন দিয়েছিলেন এবং উপনয়নাদি সংস্কারে আস্থাবান ছিলেন। কনিষ্ঠ

১। তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।—প্রেম-শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ১১৬

২। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ২৩৪

৩। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ব্রাহ্মসমাজের creed এর দ্বারা সীমায়িত ঈশ্বরজ্ঞান হইতে অন্যরূপ। কারণ তিনি বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতেন আর্টের দৃষ্টিতে, কবির চোখে, বোধহয় সেই অর্থে তিনি ধর্মসাধনা শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের creed-এর অনুরূপ। 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আদি সমাজের মতকেই সমর্থন ও প্রকারান্তরে ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজের ঈশ্বরসম্বন্ধে ধারণাকে 'খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরে'র উপাসনা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।—রবীন্দ্রজীবনী—প্রথম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৭

কন্যার বিবাহের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[১] হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে বলেছেন,—"হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।"[২] সেইজন্য যখন ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন উঠল এই প্রশ্ন নিয়ে যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কিনা তখন রবীন্দ্রনাথ সেই বিতর্কে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্ম বিরোধী মনোভাব ব্রাহ্মসমাজে দেখা দেওয়ার পর সমাজের সভ্যতালিকা হতে নাম তুলে নিয়েছিলেন।[৩] কারণ ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের এক অংশমাত্র এই মত প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন,—"বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজন বোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে।"[৪] রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রকাশ তখনকার রচনা 'গোরা'তেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিনয়-ললিতার বিবাহের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ যে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশ এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 'গোরা'য় ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ পরিস্কার করে দেখানো হয়েছে এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতের চিত্র প্রতিফলিত

১। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক সময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দু সংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন, কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন, কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্র নাথ বহুকাল হইতে এই সব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।—রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৮

২। আত্মপরিচয়—পরিচয়—রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃঃ ১৭৪-৭৫

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৭৮ দ্রষ্টব্য।

৪। আত্মপরিচয়—পরিচয়—রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ১৭১

হয়েছে, 'নৌকাডুবি'তে যে ব্রাহ্ম সমাজের ছবি রয়েছে 'গোরা'য় তারই পরিস্ফুট উগ্ররূপ দেখতে পাওয়া যায়।[১] অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় ব্রাহ্ম সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।[২] প্রকৃত কথা তাঁর ধর্মমত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মহিমায় উজ্জ্বল বলে কোন সম্প্রদায়গত মত বা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে চলেনি।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাহিত্য প্রীতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'পদরত্নাবলী' প্রকাশে সহায়তার মধ্য দিয়ে। যার ভিন্নতর পরিচয় বিভিন্ন রচনায় বৈষ্ণব কাব্যের মিলন বিরহের নব নব প্রকাশে।[৩]

যেমন,—

১। ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়

আমার ঘরে কেহ নাই যে।

তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।[৪]

২। বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,

মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই।[৪]

কেবল ভাবের গভীরতা ছাড়া বিষয়, ছন্দ ও কলাকৌশলে তিনি বৈষ্ণব-কাব্যকে কতটা আয়ত্ত করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'ভানু সিংহের পদাবলী'তে। কিন্তু তার মধ্যে ছিল অনুকরণের প্রয়াস। সেই অনুকরণ

১। রবীন্দ্রজীবনী—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য।

২। 'গোরা'য় ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের তত্ত্বালোচনায় পক্ষপাত লেশহীন দৃষ্টির পরিচয় ততটা নাই। ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি যুক্তিই রহিয়া গিয়াছে, সে যুক্তিতে যেন প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগে নাই। পানুবাবু ও বরদা-সুন্দরীকে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র বলা চলে না। পরেশবাবুকেও নয়, তিনি ত কোনো বিশেষ সমাজেরই নহেন। হিন্দুধর্ম, হিন্দু ইতিহাস ও সভ্যতার স্বপক্ষীয় যুক্তিই লেখকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সব যুক্তির পশ্চাতেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণা প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগিয়াছে।—রবীন্দ্রসাহিত্যের 'ভূমিকা (১৩৬৯)—নীহাররঞ্জন রায়; পৃঃ ৪১৬—১৭

৩। রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড,—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ২১৯ দ্রষ্টব্য।

৪। কড়ি ও কোমল—রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম খণ্ড); পৃঃ ১৮০, ১৫৬।

হতে তিনি মুক্তিলাভ করেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীতে'। অভিসার অন্তে তিনি দেহসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সে দেহসমুদ্র কামগন্ধহীন ভাবময় বৃহৎ সৌন্দর্যের ভোগাকাংক্ষার মধ্যে ব্যাপ্ত।[১] শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে 'রাজা' নাটকে রাজা ও সুদর্শনার মধ্যে যে বিরহমিলনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে তা তুলনীয়। কারণ তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণব কবির 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম' অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন বাসনার ধর্ম।[২] এই সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও সকল সৌন্দর্যের মধ্যে অপরূপের প্রকাশ দর্শনের সূত্রপাত 'নৈবেদ্যে' ও ক্রমে তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে 'খেয়া', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালিতে'। 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া'য় যার সূত্রপাত 'গীতাঞ্জলি'তে সেই নবভাবের উপলব্ধি পরিণতি লাভ করেনি। তার পূর্ণতা দেখা যায় 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে। এই কারণে 'গীতিমাল্যে'র গান তত্ত্বভারে ভারী হয়ে ওঠেনি। সেগুলি হয়েছে সহজ, সরল, আনন্দ আবেগময় এবং প্রাণবন্ত।[৩] এই সমস্ত রচনায় কবি রবীন্দ্রনাথ সহজেই সাধক কবি নানক, কবীর, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দাদূ, রজ্জব, একনাথ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয়। কারণ তাঁদের সকলেরই সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে একই রূপে বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই অপরূপের লীলা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।[৪] রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ক্রমপর্যায় আলোচনা করলে দেখা যায় 'নৈবেদ্যে' দেবতা কাছে আসেননি। তিনি দূরের থেকেই পূজা গ্রহণ করেছেন,—

১। দীর্ঘ অভিসারের পর বার বার তিনি দেহসায়রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দেহভোগাকাংক্ষাকে বৃহত্তর সৌন্দর্য ভোগাকাংক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, বস্তুদেহ ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়; পৃঃ ৫১।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন; পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য।

৩। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১২১—২৭ দ্রষ্টব্য।

৪। গীতাঞ্জলি—গীতিমাল্য—গীতালির কবি সাধক রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নানক—কবীর—দাদূ, রজ্জব—চণ্ডীদাস—জ্ঞানদাস—গোবিন্দদাস—একনাথ—মীরাবাই প্রভৃতি সাধক কবিদের সমগোত্রীয়, বিশ্বজীবনের সকল রূপের মধ্যেই অপরূপের লীলা এই সাধক কবিদের অধ্যাত্ম দৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও জীবনের ও নিসর্গের সকল রূপের মধ্যে এক নিত্য অপরূপের লীলাই দেখিয়াছেন।—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়; পৃঃ ১১২

'জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী
ওগো অন্তরযামী।'[১]

'খেয়া'র 'নেয়ে' কিন্তু আলো অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছেন। তবে 'খেয়া'র 'নেয়ে' 'সোনার তরী'র 'নেয়ে' নন। মহাকাল আমাদের সমস্ত নিয়ে যান কিন্তু আমাদের নেন না। 'খেয়া'র 'নেয়ে' কিন্তু এমন অসহায় ভাবে ফেলে যান না। কবির-ও সেইজন্য কোনরকম খেদ নেই। তাঁর কাছে এপার ওপারে কোন ভেদ নেই, রূপ ও অরূপের মতই দুই পারের সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্য।[২] কবি সেই জন্য বলেন,—

'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।'[৩]

শুধু তাই নয়, মিলনের আকাংক্ষা এখানে পরস্পরের। শুধু সীমা নয়, অসীমও সীমার সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ। সেইজন্যই দেখা যায়,—

'তৃষ্ণা কাতর পান্থ আমি'—
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে'[৪]

'খেয়া'য় যে লুকোচুরির খেলা আছে, 'গীতাঞ্জলি'তে তার অবসান। এখানে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছেন। এই উপলব্ধি তিনি লাভ করেছেন শান্তি-

১। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৮৫৮

২। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

৩। ঘাটে—খেয়া—রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ১৪৬

৪। কুয়ার-ধারে—খেয়া—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ১৭০

নিকেতনে সাধনার ফলে। তাঁর এই অনুভূতি গভীর হতে গভীরতর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালী'তে। সকল কিছুর মধ্যেই পূর্ণতার অনুভব করে তিনি বলতে পেরেছেন,—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।[১]

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার প্রভাব রয়েছে এ ধারণা করা ভুল। ভারতের যে চিরন্তন ভগবত সাধনার বিকাশ, কবি তার উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারই বিচিত্র প্রকাশ 'নৈবেদ্যে' দেখতে পাওয়া যায়। 'নৈবেদ্যে' যে ভক্তি সাধনার বিকাশ, সেই ভক্তিবাদ ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্য অনুযায়ী জ্ঞান, বীর্য, কর্ম ও মানবমহত্বের প্রভায় উজ্জ্বল, সেই ভক্তিবাদ পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধনা নয়।[২] কারণ সেই পরবর্তী সাধনা দুর্বলের সাধনা। তেমনই 'গীতাঞ্জলী'তেও যে আত্মনিবেদন সে নিবেদন দুর্বলের নিবেদন নয়। কবির অধ্যাত্ম উপলব্ধি 'বলাকা' ও 'পূরবী' র গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে 'বনবাণী'তে এসে উপনিষদের সঙ্গে সমন্বয় লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভক্তির ঘোর লেগেছিল 'বলাকা'র পর থেকেই সে রঙ অবলুপ্ত হয়ে এল। কোন ধর্মমত তাঁর জীবনদর্শনকে বাঁধতে পারে নি। তবু যেটুকু ছিল সেটুকুও লুপ্ত হয়ে গেল। সেই কারণে তিনি যেখানে ইতিপূর্বে 'ঈশ্বর' 'তুমি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিলেন সেখানে নিখিল জীবনপ্রবাহ ও অস্তিত্বের ব্যঞ্জনার মধ্যে তাকে ব্যক্ত করলেন। এর অর্থ জীবনকে

১। গীতালি—রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৪৫৫।

২। রবীন্দ্রকাব্যে যাঁহারা বৈষ্ণব ও ভক্তি সাধনার প্রভাব দেখিতে পান তাঁহারা যদি 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের ভক্তি সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতামত সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে ভক্তি বীর্যে পরিপূর্ণ, মানব মহত্বের আদর্শে জ্যোতিষ্মান, জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর, কর্মের প্রেরণায় বলিষ্ঠ, আমাদের ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্যে সেই ভক্তিবাদের বন্দনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও সেই মার্গের সাধনা করিয়াছেন, পরবর্তী বৈষ্ণব-মার্গের নয়, অন্তত 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে তাহার পরিচয় নাই।—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়; পৃঃ ৭৭

সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে উচিত-অনুচিত মেনে চলা, ধর্মকে অস্বীকার করা নয়।[১] বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধিই তাঁকে বন্ধন হতে মুক্ত করেছিল। তাঁর উপলব্ধির গভীরতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে 'চতুরঙ্গে' ও ছোট গল্পে 'বোষ্টমী'তে। 'চতুরঙ্গে' তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার গভীরতার পরিচয় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণব-বৈরাগীরা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন যে "সহজ" (বা রস-) সাধনার দ্বারা তার মধ্যে এমন এক জটিলতা ছিল যা "প্রবর্ত্ত" (বা নিম্নতর) সাধকদের বিপদগ্রস্ত করত, কিন্তু "উত্তর" (বা উচ্চতর) সাধকদের বাধা হয়ে দাঁড়াত না। 'চতুরঙ্গে' এই জটিলতার আবর্ত যে কত ভয়ানক তাই দেখানো হয়েছে। এই সময়ের লেখা ছোট গল্প 'বোষ্টমী'তে সহজ সাধনার উচ্চতর-স্বাত্মানন্দ-দিকের কথা পরিস্ফুট হয়েছে।[২]

সহজ হবি সহজ হবি ওরে মন সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে রবি···
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি।[৩]

বোষ্টমী ও তার মত অন্যান্য সাধকদের সাধনা বৈষ্ণব-সাধনার অনুযায়ী—'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' যদিও বাস্তব ঘটনা 'বোষ্টমী' কাহিনীর পিছনে অনেকখানি রয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির গভীরতা সর্বত্র সুস্পষ্ট।[৪]

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

২। আমাদের দেশে যে "সহজ" (বা রস-) সাধনার দ্বারা বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণব-বৈরাগীরা অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; সে সাধনার মধ্যে একটা বড়ো সংকট ছিল যা "উত্তর" (বা উচ্চতর) সাধকদের পক্ষে আটকাইত না অথচ "প্রবর্ত্ত (অর্থাৎ নিম্নতর) সাধকেরা তাহাতে বিপন্ন হইত। রসসাধনার সেই রসাল দিকটার বিপদ যে কত ভয়াল তাহা রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' খোলাখুলি দেখাইয়াছেন। সমসাময়িক গল্প 'বোষ্টমী'তে রসসাধনার উচ্চতর-স্বাত্মানন্দ দিকের চিত্র উপস্থাপিত।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৮৭

৩। গীতালি—রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৪২০

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩২৮-৩২৯ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় ধর্মসাধনায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সকল বিবাদ লুপ্ত করে সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করবে। এই কারণে বাঙ্গালার জলবায়ুতে জাত ও বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণের ভাবকল্পনা অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবী তাঁর কাছে অবজ্ঞাত হয়ে গেলেন। কারণ তাঁর ধারণা অসংখ্য দেবদেবীর সাধনায় জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে, একেশ্বরের সাধনার মধ্যেই ঐক্য নিহিত আছে।[১] এইজন্য তিনি বলেছেন,—

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।[২]

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপনিষদের পটভূমিকায় এক নবীন ব্যঞ্জনালাভ করে। 'বলাকা'য় নানা ভাবে এই ভাবধারার প্রকাশ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'কেন' ও 'কঠ' উপনিষদে দেখা যায়,

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥

'যেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না, (উক্ত ব্রহ্ম কিরূপ তাহা) জানি না, সুতরাং ইঁহাকে কিরূপে অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হয়—তাহাও জ্ঞাত নহি।' (কেনোপনিষৎ)

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি
কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

১। কবির বিশ্বাস একেশ্বরের পূজার মধ্যেই ঐক্যের বীজ নিহিত। অসংখ্য দেবদেবীর পূজা অর্চনায় জাতির জীবনে বল আসিবে না, সাহস আসিবে না, সংহতি আসিবে না।—রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৩

২। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথমখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৮৮৩

'সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করে না, এই অগ্নি আবার কিরূপে করিবে? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয়, তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।' (কঠোপনিষৎ)।[১] এই শ্রেণীর অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় 'বলাকা'র,—

শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরন,
ভেসে যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।[২]

তেমনই 'যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষূংষি পশ্যতি' ও—'যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে'[৩] অর্থাৎ 'যাহাকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না অথচ যিনি চক্ষু দর্শনময় করিয়াছেন, প্রাণ যাহাকে পায় না অথচ প্রাণের সাড়া যাহা দ্বারা জাগিয়া উঠিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।'[৪] এই ভাবধারার রূপায়ণ দেখা যায় 'ছবি'তে,—

নয়নে সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।[৫]

১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত; পৃঃ ২২ ও ১১৫

২। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৫১৮

৩। কেনোপনিষৎ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত; পৃঃ ২৪-২৫

৪। রবিদীপিতা—তৃতীয় মুদ্রণ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; পৃঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য।

৫। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৪১৭

অধ্যাত্ম উপলব্ধি কোন সীমাবদ্ধ মতবাদ দ্বারা লাভ করা যায় না, তার উপলব্ধি অন্তরঘন অনুভূতির প্রত্যয়ে।

'বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।'[১]

'বলাকা'র এই ভাবধারা পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে ক্রমেই পূর্ণ হতে পূর্ণতর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন 'ঈশ' ও 'কঠ' উপনিষদের

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।[২]

'ইনি চলেন, ইনি চলেন না, ইনি দূরে আবার ইনি নিকটে; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে; আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে' (ঈশ উপনিষদ), এবং

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

'যাঁহাই এখানে তাঁহাই সেখানে; যাঁহা সেখানে তাঁহাই এখানে, উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় (অর্থাৎ দ্বৈতের ন্যায়) দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়' (কঠোপনিষৎ) ও

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ উহা পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই মাত্র অবশিষ্ট থাকেন (ঈশ উপনিষদ)।[২] এই সকল ভাবধারার প্রকাশ 'সেঁজুতি'তে পাওয়া যায়,—

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বলীলা দেখি কেবলি সে

১। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৪৮৬।

২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত;, পৃঃ ৭, ১০১ এবং ২

নেই নেই করে আছে।[১]

তেমনই,—ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।

আলোকের অতীত আলোকে।

অনু হতে অনীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,

ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।

ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা

অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।[২] এই ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য উল্লেখ করা যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের,—'যেখানে মানুষ দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু উপলব্ধি করে না, তাহাই ভূমা।··· যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহাই মৃত্যু। 'হে ভগবন, ভূমা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত?' স্বীয় মহিমায় অথবা মহিমার উপরেও নয়।'[৩] রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি কেবলমাত্র কাব্যগানেই উৎসারিত হয়নি। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যেও এইভাবের বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যার উদাহরণ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত—'শারদোৎসব,' 'ডাকঘর,' 'রাজা' ও 'অচলায়তন' নাটক।

বৈষ্ণব সাধনার ভাবধারা হতে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের মন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের উপর ভিত্তি করে ধর্মের একত্ব সম্বন্ধে অনুভববন হয়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার সময় হতে তাঁর উপলব্ধি সেই সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ধর্ম ও মতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হল। তাঁর জীবনদর্শনের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি অধিকতর পরিস্ফুটভাবে অনুভব করলেন যে ঈশ্বর সকল সম্প্রদায়গত গণ্ডীর বাইরে। ধর্ম সকল স্থানকালের অতীত। কোন শাস্ত্র, বাণী বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে বাঁধতে পারা যায় না। সুতরাং কোন সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মসাধনাকে যদি আধ্যাত্মিক সাধনার পন্থা বলে গ্রহণ করা যায় তবে তার ফলে ধর্মসাধনাই ব্যাহত হয়।

১। পলাতকী—সেঁজুতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৫৫৭

২। বর্ষশেষ—পরিশেষ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৮৮৮

৩। রবীন্দ্রনাথ—কবি ও দার্শনিক—মনোরঞ্জন জানা; পৃঃ ৪৪৬ হতে উদ্ধৃত।

কারণ তার মধ্যে রয়েছে শুধু অভ্যাসের জড়তা। এই জড়তা কখনই সাধনার অঙ্গ হতে পারে না।[১] ঈশ্বর স্থানকালনির্বিশেষে সকলের। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নন, কোন বিশেষ ধর্মসাধনার বিষয়বস্তু নন। তিনি আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত। সেই মহিমার মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। "ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি। হে ভগবন, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন! ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন, স্বে মহিম্নি! আপন মহিমাতে। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে।"[২] অর্থাৎ উপনিষদের আলোকে তিনি উপনিষদকে অতিক্রম করলেন।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কাব্যগানে পাপ অনুতাপের ছবি বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। 'ধর্মের সরল অর্থ' ভাষণে (বঙ্গ দর্শন, ১৩০৯ মাঘ) পাপবোধ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন পাপের প্রতি হিন্দু ধর্মের মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে যে দোষারোপ করা হয় সেইটিই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। কারণ ভারতীয়রা পাপপুণ্যের মূলে গিয়েছিলেন বলে বলতে পেরেছিলেন অনন্ত আনন্দ-স্বরূপের সঙ্গে চিত্তের মিলনে সমস্ত পাপ দূর হয়। সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।[৩] প্রকৃত কথা ঔপনিষদিক বা বৈদিক সাহিত্যে পাপবোধের ছবির একান্ত অভাব আছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল যে হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে পাপের ছবি তাঁর রচনায় বিশেষ স্থান না পেলেও দুঃখ এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অবশ্য এই দুঃখবাদকে তাঁর নৈরাশ্যবাদ বা হীনমন্যতার পরিচয় হিসাবে মনে

১। ধর্ম যখন কোন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে, হয় অভ্যস্ত অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে।...ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডী আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া ওঠে —ধর্ম প্রচার—ধর্ম রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ; পৃঃ ৪১

২। ধর্ম প্রচার—ধর্ম—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ; পৃঃ ৪৫

৩। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৮৭ দ্রষ্টব্য।

করলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে দুঃখকে তিনি ধর্মসাধনার সোপান হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।[১] আত্মাহুতির মধ্যেই যেমন ধূপের সার্থকতা তেমনিই দুঃখবোধের মধ্যেই জীবনের পূজা উদযাপিত হতে পারে। দুঃখের মহিমা সেই কারণে তাঁর রচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।—

দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।[২]

দুঃখের মহত্ত্বকে প্রকাশ করে তিনি বলেছেন,— "দুঃখকে আমরা দুর্বলতা বশতঃ খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব। একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পদ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা থেকে তাঁর স্বদেশসাধনাকে পৃথক করা যায় না। যে ধর্মজীবনের আকাংক্ষা তাঁর মনে ছিল স্বদেশসাধনার ক্ষেত্রে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। 'চৈতালী'তে তার বিকাশ। কিন্তু সেই খণ্ড সাধনা যখন তাঁকে তৃপ্ত ও পূর্ণ করে তুলতে পারল না, তখন সেই চেতনা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠল। 'চৈতালী'তে কেবল স্বদেশসাধনাই নয়, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে কবির প্রথম সচেতন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়,—

১। আসল কথা বৈদিক বা ঔপনিষদিক সাহিত্যে পাপের নিদারুণ চিত্র নাই। তাই কবি মনে করিয়াছিলেন হিন্দুশাস্ত্রই পাপের প্রতি মনোযোগী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সংগীতের মধ্যে এই পাপবোধ ও অনুতাপের উপর রচিত গান খুবই কম। তবে পাপবোধ না থাকিলেও দুঃখবোধ করিয়া বহুগানে দুঃখ বাদকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। তবে কবির দুঃখবাদকে কখনো morbid বলিতে পারি না। উহা ধর্মসাধনার অন্যতম সুরমাত্র—উহাকে pessimism বলিলে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে।—রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ১৯০

২। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৯৮০

৩। দুঃখ—ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৬২

হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।[১]

'কল্পনা'য় এই চেতনা আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশচেতনাও 'কল্পনা', 'কথা' ও 'কাহিনী'র মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অবশেষে 'নৈবেদ্যে' এসে স্বদেশসাধনা ও ধর্মচেতনা এমন অঙ্গাঙ্গী মিলিত হয়েছে যে পৃথক করা কঠিন। ভারতের যে ঐক্যের সন্ধান তিনি করেছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠের সহজজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, তারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় 'নৈবেদ্যে'—যেখানে ঈশ্বর ও দেশ একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।[২]

পতিত ভারতে তুমি কোন জাগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ কোন মহাক্ষণে
হে মোর কল্পনাতীত।......
দাঁড়াবে যে সম্পদের শিখরসীমায়
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
নবীন প্রভাতে।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে স্বদেশসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় এক ছিল। 'আর্যামী'র ভণ্ডামী দুজনের কেউই প্রীতির চক্ষে দেখেন নি এবং সেই সূত্রে হিন্দুধর্মের নিশ্চেষ্টতা, নিশ্চলতা, প্রাণহীনতা ও বীর্যহীনতাকে সমর্থন করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতবাদের মতই স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন,—"ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়।[৪] ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়। আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃ প্রমাণ।...তাই

১। প্রাচীন ভারত—চৈতালী—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫৫২

২। রবীন্দ্রজীবনী—প্রথম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ৪৩৯, এবং দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য।

৩। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথমখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৮৯০

৪। তুলনীয়,—'বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যালাভে'।—ব্রাহ্মণ—কথা—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড; পৃঃ ৬১৮

কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনিই থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু। উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ! !"[১] এর সঙ্গে 'অচলায়তনে' মহাপঞ্চকের প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অন্ধপ্রেম ও স্থবিরতার তুলনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের রচনায় স্বদেশ সম্বন্ধে মতানৈক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। স্বদেশের সাধনায় উভয়ের চিন্তাধারাই দেশের উন্নতি কামনায় একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যে পার্থক্য সে পার্থক্য উভয়ের ধর্মদর্শনে।

আমাদের দেশের সাধারণের মত অনুযায়ী ধর্ম ও Religion শব্দ দুইটি এক অর্থে ব্যবহার করা চলে না। কারণ ধর্ম শব্দের অর্থ Religion শব্দের অর্থ অপেক্ষা ব্যাপক। Religion মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু হিন্দুদের মতে ধর্ম শব্দের অর্থ যা মানবসমাজকে ধারণ ও আশ্রয় করে আছে। সেই অর্থে হিন্দুধর্মকে Religion বলা যায় না, কারণ এই ধর্ম অপৌরুষেয় ও শাশ্বত। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই ধারণা বর্তমানযুগে প্রযোজ্য নয়। কারণ এখন হিন্দুধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন মতবাদে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখন ধর্ম শব্দ প্রাচীন তাৎপর্য হারিয়ে প্রায় Religion-এর সমজাতীয় হয়েছে।[২] রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। তাঁর দর্শনতত্ত্বের মধ্যে সমস্ত জাগতিক ও মানবিক বিরুদ্ধবোধের অভূতপূর্ব মিলন সাধন হয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ,—"ধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব। চেষ্টা করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃষ্টান শাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে, বলেছে তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্য স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল তার সহজ স্বভাবের চেয়ে

১। ভাববার কথা—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯; পৃঃ ৪৬

২। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে আর একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।"[১] এইভাবে মানুষ প্রতি দিন নিজেকে অতিক্রম করে ভূমাকে—সেই অপরিমেয়কে লাভ করতে চাইছে। সেই জন্য জীবজগতের নিত্যলীলার মধ্যে প্রতিদিন সেই অপরিমেয়কে নানারূপে প্রকাশিত হতে অনুভব করছে।[২]

সেই ভূমা সেই অসীমকে প্রকাশের জন্যই সীমার আবশ্যকতা। উপনিষদে রয়েছে,—'তদৈক্ষত বহুস্যাম, সদেবেদমগ্রে আসীৎ অসদেবেদমগ্রে আসীৎ, স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমিদম সৃজৎ।'[৩] অর্থাৎ তিনি যখন তাঁর পরম ঐক্যের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির শূন্যপূর্ণতায় পূর্ণ ছিলেন তখন অজানা ছিল তাঁর রূপ। সেই কারণে তিনি নিজেকে দেখার জন্য, নিজেকে অনুভব করার জন্য যে তপস্যা করেন, তারই ফলে জগতের সৃষ্টি। কিন্তু এই সমগ্র জগতে তাঁর যে আত্মপ্রকাশ, সে প্রকাশ চেতনাহীন, বোধহীন, জাগরণহীন স্বপ্নবিহারমাত্র। মানুষের মধ্যে এসেই সেই রূপ চেতনাময় হয়ে উঠেছে।[৪] উপনিষদের এই ব্যাখ্যাই নব রূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মধ্যে।

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।[৫]

কিন্তু— যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা

১। মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৫৭৯

২। জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার—
ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি, যার নিত্য লীলা চমৎকার।

প্রতিদিন মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে।—মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড; পৃঃ ৬০০

৩। রবিদীপিতা—তৃতীয় মুদ্রণ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; পৃঃ ৮০ হতে উদ্ধৃত

৪। রবিদীপিতা—তৃতীয় মুদ্রণ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; পৃঃ ৮০—৮১ দ্রষ্টব্য।

৫। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৪৭৯

আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা।...
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।[১]

এইভাবে সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশ বলেই সীমাবদ্ধের মধ্যে অসীমকে লাভ করার আকুল আকাংক্ষা জেগে উঠেছে। এই অনন্ত ব্রহ্ম মনের মানুষ বলেই তিনি মানুষকে স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছেন না। মানুষ সেইজন্য পথকেই বরণ করে নিয়েছে, সীমার মধ্য দিয়ে সীমাকে অতিক্রম করে অসীমকে লাভ করার ব্যাকুলতায়।[২] এই সীমা অসীমের লীলায় ধর্ম এক ব্যাপকতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে,—'ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখী যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না, তেমনিই আমরা অনন্তের মধ্যে যে অগাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব।...মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অন্তরের আনন্দকে পাওয়া।'[৩]

ক্রমোপলব্ধির পর্যায়ে দেখা যায় প্রথম যুগে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টাকে অনুভব করার যে আকাংক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল ক্রমশঃ সেই ভাব পরিবর্তিত হয়ে নিজস্ব চেতনায় সেই অসীম পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চলেছে। সীমাবদ্ধ মানুষের মধ্যেই অসীম ব্রহ্মের প্রকাশ;—

আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবনে নব নব।[৪] অর্থাৎ

পরমাত্মার এক খণ্ড অংশের প্রকাশ অন্তরাত্মার মধ্যে। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের

১। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৫০৪

২। আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্য ব্যাকুলতা।... অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোন উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতর জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনি মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন। তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না।—ছোট ও বড়—শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ; পৃঃ ৪৬৩

৩। শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ; পৃঃ ৪৯৪

৪। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড ;পৃঃ ৪৪৪

উক্তির সঙ্গে রায় রামানন্দের উক্তির তুলনা করা যেতে পারে।[১] চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে রায় রামানন্দ বলেছেন,

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ ১৩২
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি ॥[২] ১৩৪

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'র,—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন সুরে।[৩]

অবশ্য মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই এই ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবদে',—

বড় গুণবন্ত্ গোঁসাই চহই সো হোই তেহি বেগি।
ঔ অস্ গুণী সঁবারই যো গুণ করই অনেগ ॥[৪]

অর্থাৎ সেই গোঁসাই (ঈশ্বর) অশেষ গুণবান। তিনি যেমন চান তেমনই অপর দ্বারা শীঘ্র সম্পন্ন হয়। অধিকন্তু তিনি এমন গুণী ব্যক্তির সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁরই মত সুন্দর কর্ম সম্পাদন করেন।

পরমাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার এই সম্বন্ধের ফলে অন্তরাত্মাও আনন্দময় অমৃতেরই এক অংশ। আনন্দের উপলব্ধির প্রকাশ প্রেমের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণগুলিতে নানাভাবে এই উপলব্ধির প্রকাশ করে

১। রবীন্দ্রজীবনী—প্রথম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ৩৭১ দ্রষ্টব্য।

২। চৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৯৬৩); পৃঃ ১৮৫

৩। চিত্রা—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৪৯০

৪। পদুমাবত—মালিক মুহম্মদ জায়সী—ব্যাখ্যাকার বাসুদেব শরণ অগ্রবাল, পৃঃ ৬

বলেছেন,—"ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ, এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করেছেন। এই দেওয়া নেওয়া একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।"[১] এই প্রেমের সম্বন্ধেই পরমাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার নিত্য লুকোচুরি খেলা চলেছে। পরমাত্মার সন্ধানে অন্তরাত্মার এই অভিসার যাত্রা, এই অনুসন্ধানের বর্ণনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনার প্রকাশ পাওয়া যায় অসংখ্য কাব্যগানে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—

১। কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।[২]

*

২। আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের পদধ্বনি।[২]

*

৩। আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।[৩]

*

৪। "এই যে তুমি" এই কথাটি বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
'আছ আছ'র স্রোত বয়ে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের নয়নজলে গলে।[৩]

*

১। প্রেম—শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্ররচনাবলী—দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ১১৪

২। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ২৫৬, ২৩৭

৩। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ৩২৩, ৩৩১

৫। এখানে তো বাঁধাপথের অন্ত না পাই,
চলতে গেলে পথ ভুলি যে কেবলই তাই।[১]

প্রশ্ন উঠতে পারে এই অনুসন্ধানের শেষ কোথায়। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। উপনিষদের প্রার্থনায় দেখা যায়,—

পূষন্নেকর্ষে যম, সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোহসাবসৌ পুরুষ: সোহহমস্মি।[২]

হে পুরুষ, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুণ, আপনার যাহা অতি সুশোভনরূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাহা হইতে অভিন্ন।[২] অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে,—

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্রসত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?
তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে,
বলেছে যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,
বলেছে যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
'এস, প্রকাশ, এস।'
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে
বধূ যেমন সত্য করে জানে আপনাকে।[৩]

১। গীতালি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত ; পৃঃ ৪৪৪

২। ঈশোপনিষদ-উপনিষদ গ্রন্থাবলী-১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ-সংস্করণ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ; পৃঃ ১৩-১৪

৩। শেষসপ্তক—রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৫২

তবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উপনিষদের ভাবধারা স্থান কাল পাত্রের অতীত অসীমকে কেন্দ্র করে, আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রয়েছে স্থানকাল পাত্রকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে অন্তরের সঙ্গে বাইরের সমন্বয়।

'পরিণয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে।... পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাকে পাওয়া গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি— সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোন ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না, সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই—সংসারে তার প্রেম।"[১] 'রাজা' নাটকে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা ঈশ্বর বা পরমাত্মা, আর সুরঙ্গমা অন্তরাত্মা। সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মধুর সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই জীবনসাধনা ও প্রেমের সাধনা চলেছে। সুরঙ্গমা পরমাত্মাকে লাভ করেছে দাসীভাবে, ঠাকুরদা তাকে পেয়েছে বন্ধুভাবে। এই ভাবেই 'রাজা' নাটক হয়ে উঠেছে **the 'inner drama' of the 'human soul'**।[২] 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের যে সাধনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নানা কাব্যগানের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

১। আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ॥[৩]

*

২। তুমি এবার লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।[৪]

১। পরিণয়—শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড; পৃঃ ২০৫

২। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা (শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৬)—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

৩। পূজা—রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড; পৃঃ ৪৪

৪। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ২৫১

৩। আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।[১]

*

৪। তবু তুমি সেই তো আমার তুমি
আবার তোমায় চিনব নূতন করে।[২]

*

৫। আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজারবার
নূতন করে দিই যে উপহার।[৩]

এইভাবে অন্তরাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে অবিচ্ছেদ্য। 'গীতালি'তে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব রসানুভূতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। অসীমের ডাক তার অন্তরে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তবু এতদিনের পরিচয়ের বাঁধন যেন কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হয়েছে,—

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
লতার মত জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়।[৪]

এই অসীমের ডাক 'ফাল্গুনী'তে আরও গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠেছে।[৫] বৈরাগীর সর্দার ডাক দিয়ে যায়,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে কে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।[৬]

কিন্তু ঘরে না থাকলে পথ চলাই বা সার্থক হয়ে উঠবে কি করে? পথ-চলার ডাকের যে আনন্দ ঘরের স্থাবরতার মধ্যেই ত তার পূর্ণ পরিচয়। সেইজন্য

১। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; ৩৬৮
২। গীতালি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; ৪৪৮
৩। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; ৫১৫
৪। গীতালি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৪১১
৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন; পৃঃ ৪৮৯ দ্রষ্টব্য।
৬। ফাল্গুনী—রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ৪৫

স্থিতি এবং গতি উভয়কেই রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে গেঁথে জীবনের প্রকৃত রূপকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এই কারণেই 'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ দাদার কাব্যরচনায় নীতিপ্রচার, লোকহিতের বুলি ও স্থবিরতার পরিচয় দিলেও বসন্ত উৎসবকে তখনই পরিপূর্ণ ও শেষ করেছেন যখন দাদাকে বসন্তসাজে সজ্জিত করে সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছে।[১]

পরমাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার এই যে লীলা, এই লীলায় অন্তরাত্মা যেমন পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য উদগ্রীব, তেমনিই পরমাত্মারও প্রয়োজন রয়েছে অন্তরাত্মার। কারণ অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলন না হলে পরমাত্মার প্রকাশ হবে না সম্পূর্ণ।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।[২]

তবে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য অন্তরাত্মার এই যে অভিযান, সে অভিযান কোন নির্দিষ্ট পথে চালিত হলে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। সেই সার্থক অভিযান কোন ধর্ম শাস্ত্রের বা মতবাদের অনুশাসন মেনে চলে না। কারণ পরমাত্মার আসন বাইরে নয়, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত,—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে তোমায় পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানেই চাইনি।[৩]

শত সহস্র জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের পর রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন,—"আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে।...ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদের অন্তরাকাশে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' রূপে সুগভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমত জানলে

১। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; পৃঃ ৩৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।
২। গীতাঞ্জলি-রবীন্দ্ররচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ২৭২
৩। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৩৭৬

বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না, পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাইনে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।"[১]

রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বসৌন্দর্যই পরিপূর্ণতার দ্যোতক। তাঁর আত্মোপলব্ধি এবং ঈশ্বরোপলব্ধিও হয়েছিল এই বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই একথা তিনি নিজেই তাঁর Religion of Man-এ বলেছেন। ঋতুরঙ্গে এবং প্রতিদিনের প্রভাতের বিচিত্র সম্পদের মধ্য দিয়ে তিনি অধ্যাত্মলোকের অনুভূতি লাভ করেছিলেন।[২] সেই কারণেই তিনি বলেছিলেন,—

১। পরিচয়—শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড; পৃঃ ২০৪-০৫

২। You will understand from his how unconciously I had been travelling towards the realization which I started upon in an idle moment on a day in July, when morning clouds thickened on the horizon and a caressing shadow lay on the tremulous bamboo branches, while an excited group of village boys was noisily dragging from the bank an old fishing boat; and I can not tell how at that moment an unexpected train of thoughts ran accross my mind like a strange caravan carrying the wealth of an unknown kingdom (p/61)···Almost every morning in the early hour of the dusk, I would run out from my bed in a great hurry to greet the first pink flush of the dawn through the shivering branches of the palm trees which stood in a line along the garden boundary, while the grass glistened as the dew-drops caught the earliest tremor of the morning breeze. The sky seemed to bring to me the call of a personal companionship, and all my heart—my whole body in fact—used to drink in at a draught over the overwhelming light and peace of those silent hours. I was anxious never to miss a single morning, because each one was precious to me, more precious than gold to the miser. I am certain that I felt a larger meaning of my own self when the barrier vanished between me and what was beyond myself. (P/62)—Religion of Man—

R. N. Tagore.

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।……
বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।১

বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে যাঁর প্রকাশ অস্ফুটভাবে রয়েছে তাকেই পরিস্ফুট করে তোলা হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। সমগ্র জীবন সেই উদ্দেশের সাধনা। জীবনের মধ্যে সেই উপলব্ধির দ্বারাই জীবনের সার্থকতা।

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে
হে দেবতা তাই আজি
দিব তব সকাশে।২

সুতরাং দেখতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর যে কোন ধর্মনেতা বা ধর্মপথিক হতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্নমার্গী, বিচিত্র ও আপন মহিমায় ভাস্বর। এই কারণেই বলিষ্ঠ চিন্তাধারার বাহক ও ধর্মপথের পথিক হয়েও রবীন্দ্রনাথকে কোন সম্প্রদায় স্থাপন বা সমিতি গঠন করতে হয়নি। কেননা তাঁর ধর্মসাধনা ও দর্শন কোন সংস্কার বা প্রথার বেড়াজালে মানুষকে না বেঁধে মুক্ত পথে লক্ষ্যের নির্দেশে তাকে পৌছে দেয়।

১। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; দ্বিতীয় ; পৃঃ ৩০৪

২। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৩০৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মনায়কদের মতবাদের তুলনা।

ধর্মের প্রধানতঃ দুই প্রকারের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। একটি রূপ কোন বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে ও তার ফলে সৃষ্ট হয় নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের। এই ধর্মের কিছু অংশ চিরন্তন সত্য, কিছু অংশ বা চিরন্তন সত্য নয়, কতকগুলি বিশেষ রীতি বা নীতিমাত্র। কিন্তু এই শেষোক্ত অংশই ধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে অন্ধ সংস্কারের সৃষ্টি করে। ধর্মের দ্বিতীয় রূপ সর্বদেশ ও কালের পক্ষে উপযুক্ত শাশ্বত সত্যের প্রকাশ করে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানুষের ধর্ম'। এই সকল নিরপেক্ষ ধর্মমতকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম গড়ে উঠেছে, যাকে তিনি 'আমার ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। সাধারণ মানুষ সম্প্রদায়গত মতবাদের বশবর্তী হয়ে অন্ধ সংস্কারের অনুগমন করাকেই ধর্মাচরণ বলে মনে করে। তার ফলে সৃষ্টি হয় সঙ্কীর্ণতার। এই সঙ্কীর্ণতার বশবর্তী রবীন্দ্রনাথ কখনই হতে পারেন নি। সেই কারণেই জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে মুক্তকণ্ঠে নিজেকে 'ব্রাত্য' অর্থাৎ 'শ্রেণী হীন' সম্প্রদায় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন,—

এমন করে দিন গেল;
আজ আপনমনে ভাবি—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যার নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যার কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।

কেননা আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেড়িয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে। ১

সমকালীন ধর্মের বিভিন্ন সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ যারাই করেছেন তাঁরাই 'নাস্তিক' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই তথাকথিত নাস্তিকেরাই অনেক সময় ধর্মজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে যে সংস্কারে অন্ধ অনেকের চেয়ে তাঁরা কম ধার্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী নন।[২] অনেক সময় দেখা যায় যে এমন সব নাস্তিকতার পিছনে রয়েছে অন্ধ সংস্কারমুক্তি ও মানুষের কল্যাণকামনা। মানুষের কল্যাণনিষ্ঠ এই সমস্ত নাস্তিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর অজস্র রচনায় তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'চতুরঙ্গে' নাস্তিক জ্যেঠামশায়ের অপূর্ব চরিত্র অঙ্কনে। জ্যেঠামশায় নাস্তিক, কিন্তু তাঁর আচারনিষ্ঠ ভাই হরিমোহনের সঙ্গে তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠতা পদে পদে প্রতিফলিত হয়েছে। 'গোরা'য় আনন্দময়ীর আচারহীনতাই তাঁকে করে তুলেছে মহৎ, সমস্ত সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে।

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে

১। পত্রপুট, ১৫—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খণ্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত—পৃঃ ৩১৭-১৮

২। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রাধাকৃষ্ণন বলছেন—Generally the sceptic is at war with the faith of his generation. The function of scepticism is in relation to the dogmatism which it criticises ......Note 1—Socrates, when accused of heresy declared, "I do believe that there are gods and in a higher sense than that in which my accusers believe in them." Buddha believed in a god different from the popular ones in which his contemporaries trusted. To break down the images of gods we worship is not always an act of unbelief, it is announcement of a higher sense of god.—An Idealist View of Life (second edition, 1959) by S. Radhakrishnan; p/61-62.

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।[১]

বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান তত্ত্ব মানবের কল্যাণ কামনা। তিনি ভগবৎ তত্ত্বের আলোচনায় উদাসীন ছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন,—'আমি চরমের কথা বলতে আসিনি, আমি বলব পথের কথা।'[২] সেই কারণে হয়ত সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি নাস্তিক বলে প্রতিভাত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু মানবের কল্যাণকামনায় তিনি উপদেশ দিলেন যে,—'সমস্ত জগতের প্রতি হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে এই মৈত্রী স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে।'[৩] এই কারণেই বুদ্ধদেবের মূল মতবাদের সঙ্গে আত্মিক যোগ থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন।[৪] বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু কাহিনীর মহত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করে তাঁর অনেক কাব্যগাথায় এগুলিকে উপাদান স্বরূপ গ্রহণ ও প্রকাশ করেছেন।[৫] 'কথা' ও 'কাহিনী'তে এমন অনেক আখ্যান কাব্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকও মহাবস্তুর কুস-জাতক অবলম্বনে রচিত।[৬]

১। ধর্মমোহ—পরিশেষ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড; পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ; পৃঃ ৬৬৪

২। মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ; পৃঃ ৫৮৫

৩। মানুষের ধর্ম-রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড ; পৃঃ ৫১৮

৪। সপ্তম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ] দ্রষ্টব্য।

৫। বৌদ্ধ শাস্ত্র পুটে আবদ্ধ মহৎ কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু কাহিনী বীজ আছে যাহার মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুভব করিয়া প্রকাশ করিলেন। এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রকে শিক্ষিতের গোচরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বাঙ্গালী মনীষীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পরায়ণ প্রতিভার এই এক বিশেষ প্রকাশ।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—সুকুমার সেন ; পৃঃ ১০৬

৬। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮—সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৫৭ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড-সুকুমার সেন ; পৃঃ ২৬২ এবং **The Centenary Book of Tagore (The King of Dark Chamber and its folklore background by Heinz Mode G.D.R.) edited by Sukomal Ghosh ; P/110.** দ্রষ্টব্য।

অবশ্য ঋকবেদের পুরুরবা ও উর্বশীর কাহিনী এর ভিত্তি বলে মতান্তর দেখা দিয়েছিল। তবে এই মতবাদের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষতঃ 'রাজা' নাটকে চরিত্রগুলির নামগুলিতে সংস্কৃত মহাবস্তুর প্রভাব অনস্বীকার্য এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও জাতকের গল্পকে 'রাজা'র অনুপ্রেরণা বলে স্বীকার করেছেন।[১] 'মানসী'র 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলনে' ললিতবিস্তরের গাথার ছন্দ পাওয়া যায়।[২] বৌদ্ধ সংস্কৃতের 'দিব্যাবদানে'র 'পাংশুপ্রদানাবদান' এবং 'শার্দুল-কর্ণাবদানে'র সত্যঘটনাশ্রিত প্রথম গল্প হতে যথাক্রমে 'বাসবদত্তা' ও 'চণ্ডালিকা'র মূলকাহিনী সংগৃহীত।[৩] 'চূড়াপন্থকাবদানে'র 'পন্থক-মহাপন্থক' নাম দুইটির পাঠান্তর 'পঞ্চক-মহাপঞ্চক'কে চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্টের সঙ্গে 'অচলায়তনে' দেখতে পাওয়া

১। No less a scholar than Henrick Zimmer wrote in ZDMG 1929 an article on the Dark Chamber where tried to derive the plot from an episode in one of the Rig-Vedic poems, the well-known love story of the royal Pururavas and the divine Urvasi. Henrick Meyer-Benfey in an articlc published in the German Winternitz-Festschrift I933, refutes this opinion and replaces the source by the Buddhist birth-story, the Kusa-Jatak (531) which had already been mentioned in the same connection by Zimmer……As there exists several versions of the Kusa-Jataka the Pali text, and the Sanskrit text of Mahavastu, Meyer-Benfey believes that Tagore might have preferred the Sanskrit model which also accounts for the choice of the names of the characters in Tagore's drama. Meyer-Benfey makes the statement that the poet himelf has Confirmed the Jatak story as his source for the king of the Dark Chamber in a personal talk in the year. 1926.—The centenary Book of Tagore (The king of Dark Chamber and its folklore background by Heinz Mode G. D. R) edited by Sukomal Ghosh. P/109-10

২। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮—সুকুমার সেন; পৃঃ ১৬২ দ্রষ্টব্য।

৩। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস,—সুকুমার সেন; পৃঃ ১৬৪-৭০ দ্রষ্টব্য।

যায়।[১] এ ছাড়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় 'এক জটা,' 'মহামায়ূরী,' 'পর্ণ শবরী,' 'মহামারিচী' ইত্যাদি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

ভগবান বুদ্ধের নির্বাণের পর দ্বিতীয় শতকেই কমপক্ষে আঠারো প্রকার বৌদ্ধ মতবাদের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু আদি বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার এক বিশেষ প্রকাশমাত্র, কোন নবাবিস্কৃত মতবাদ নয়। ভগবান বুদ্ধ নিজেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর আবিস্কৃত ধর্ম আর্য মতবাদের সনাতন ধর্মের ধারাবাহী। বলা যায় যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের উপর নির্ভরশীল। উপনিষদকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে উপনিষদের ভাবধারাকেই প্রকাশ করা হয়েছে। বহু হিন্দু ঋষি যে সত্য ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তথাগত সেগুলিকেই বিশ্বপ্রেমের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে বৃহত্তর ও উদারতম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৪]

১। রবীন্দ্রনাথের অচলায়তনের সঙ্গে মিল আছে নামে ও চরিত্রে। 'পন্থক—মহাপন্থক' নাম দুইটির পাঠান্তর আছে 'পঞ্চক-মহাপঞ্চক'। রবীন্দ্রনাথ এই পাঠান্তর নামই পাইয়াছিলেন। পঞ্চক-পন্থকের চরিত্রে গভীর মিল আছে। মহাপঞ্চক-মহাপন্থকের। মিল চরিত্রের দৃঢ়তায়, পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তিতে, এবং পঞ্চককে বিহার হইতে বহিষ্কারে। বুদ্ধ-গুরুর মিল অবধানামগম্য।—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮ —সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৭৫

২। 'ওট ভট তোটয়' ইত্যাদির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কোন্ ধর্মকে তাচ্ছিল্য করেন নাই। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাধনাগ্রন্থ যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এমন সব মন্ত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনরীতি একদা আকীর্ণ ছিল। একজটা, মহামায়ূরী, মহামারীচী ইত্যাদি দেবতা বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায় প্রসিদ্ধ।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন ; পৃঃ ২৬৮

৩। **In the seoond centenary after Buddha's death no less than eighteen varities of Buddhistic doctrine can be traced. —The Sects of Buddhism by Rhyds Davids : J. F. A. S, 1891 and Indian Philosophy. Vol. I. (2nd Edition, 1956) by Radhakrishnan ; P/342.**

৪। **Early Buddhism is not an absolutely original doctrine. It is no freak in the evolution of Indian thought···Buddha himself admits that the dharma which he discovered by an effort of self-culture is the ancient way, the Aryan path, the eternal dharma.···Early Buddhism we venture to hazard**

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনও উপনিষদের উপর ভিত্তিশীল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানি বিভিন্ন উপনিষদের বিশেষ বিশেষ অংশের সঙ্কলন বলা যায়। এই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির মধ্য দিয়েই উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়।[১]

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে মূলতত্ত্ব আছে তার মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব প্রচারিত অস্পৃশ্যতা বর্জনের নীতি রবীন্দ্রনাথের নীতির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের জাতি প্রথার প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে তিনি জাতিভেদপ্রথার বিরোধী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে গৌতম বুদ্ধ বিরোধিতা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন জাতিভেদ-

a conjecture is only a restatement of the thought of the Upanisads from a new standpoint. Rhys Davids says; "Gautam was born and brought up and lived and died a Hindu……There was not much in the metaphysics and principles of Gautam which can not be found in one or other of the orthodox systems, and a great deal of his morality could be matched in earlier or later Hindu books. Such originality as Gautama possessed lay in the way in which he adopted, enlarged, ennobled and systematised that which had already been well-said by others; in the way in which he carried out to their logical conclusion principles of equity and justice already acknowledged by some of the most prominent Hindu thinkers. The difference between him and other teachers lay chiefly in his earnestness and in his broad public spirit of philanthropy" (Buddhism pp. 83-84). —Indian Philosophy. Vol I (2nd Edition, 1956) by Radhakrishnan; P/360-61.

১। সবগুলি উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ব'লিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থখানির মধ্যে আমরা উপনিষদ হইতে একটি সঙ্কলন দেখিতে পাই, উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সঙ্কলনের মধ্য দিয়াই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপনিষদের যত মন্ত্রের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে মন্ত্রগুলি সবই এই সঙ্কলনের মধ্যে ধৃত।—টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত; পৃঃ ৪০

প্রথার তীব্রতা হ্রাস করতে। এইজন্য যে কেউ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারত এবং সংঘে প্রবেশ করার পর সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করতে পারত। তিনি উপনিষদের ধারাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনোভাব এই ছিল যে কেবলমাত্র জন্মগত অধিকারে কেউ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হওয়ার অধিকারী নয়। চরিত্রই মানুষকে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করে।[১]

ন চা' হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং,
ভোবাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চ নো।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।[২] অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন কিংবা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিনা। সে যদি পাপমলযুক্ত হয় তাহা হইলে সে ভোবাদী নামে অভিহিত হয়। যিনি নিষ্কলুষ ও অনাসক্ত, আমি সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলি।'

এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ পূর্ব হতেই অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্য 'ব্রাহ্মণে' দেখা যায় যে ভর্তৃহীনা জবালার সন্তান সত্যকামকে ঋষি গৌতম সমাদরে গ্রহণ করে বলেছেন,—'তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'[৩] ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ভগবান বুদ্ধের ছিল। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ পথপ্রদর্শকের কাজ করেন, কিন্তু তিনি হবেন সমস্ত আসক্তির উর্ধ্বে।

যো'ধ দীঘং বা রস্সং বা অনুং থূলং সুভাসুভং,
লোকে অদিন্নং নাদিযতি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।[৪]

অর্থাৎ এই জগতে যিনি দীর্ঘ, হ্রস্ব, সূক্ষ্ম, স্থূল অথবা ভাল মন্দ অদত্ত দ্রব্য

১। There is a good deal of misconception about Buddha's attitude to caste. He does not oppose the institution, but adopts the Upanisad standpoint. The Brahman or the leader of society is not so much a Brahmin by birth as by character.—Indian Philosophy. Vol. I. by Radhakrishnan; P. 437

২। ধম্মপদং—প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৩—মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী; পৃঃ ২৫৫

৩। ব্রাহ্মণ—কথা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৬২০

৪। ধম্মপদং—মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী; পৃঃ ২৬২

গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হলে ব্রাহ্মণত্বের অবসান হয়।[১] এইভাবেই ভগবান বুদ্ধ অর্থহীন জাতি ভেদের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অর্থহীন জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না, যদিও প্রকৃত ব্রাহ্মণে তাঁর বিশ্বাস ছিল। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব সদাচার পালনে। এমন সদাচারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে,—"যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সকল প্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয় স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।"[২] যদিও অর্থহীন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথের মনেরই কথা, তবুও অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মের নীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় 'চণ্ডালিকা'য়। আনন্দকে জলদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রকৃতি বলল,—"বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোরবেলাকার আলো দিয়ে তৈরী তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।"[৩]

১। The priest who pretended to be the channel of divine power dominates the religion of the country. Buddha has nothing but warm admiration for the prophet of the soul, the true Brahmin, who was required to say, "Silver and gold I have none." But when the prophet became a priest and amassed silver and gold, he lost the power and prestige born of spiritual gifts and could no more say to the lame man; "Rise up and walk".—Indian Philosophy. Vol. I. by Radhakrishnan ; P/356.

২। ব্রাহ্মণ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত; পৃঃ ১০৩৬

৩। চণ্ডালিকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ১১৪৪

রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন ভগবান বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত উচ্ছ্বাসহীন ভাবকে। বৌদ্ধধর্মে অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধিকেই সকলের উপরে স্থানদান করা হয়েছে।[১] বুদ্ধদেব ধর্মের নামে উৎসব অনুষ্ঠান, বলিদান, প্রার্থনা ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন না, নিঃস্বার্থ মানবকল্যাণই ছিল তাঁর কাছে প্রধান।[২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

যে ভক্তি তোমার লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদ ধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি, শান্তরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার ভবনদ্বারে।[৩]

বাসনা মোহ থেকে মুক্তিলাভ করা বৌদ্ধধর্মের প্রধান কথা। সেই কারণে ধনিয়সুত্তে দেখা যায় যে মারের প্রলোভনের উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন,—

'আসক্তিই মানুষের দুঃখের সামগ্রী।
সে কখনো দুঃখ পায়না, যাহার আসক্তি নাই।[৪]

১। The Bodhi amounts to realising in the spirit and in life the basic unity of existence, the spiritual communion pervading the whole universe.—History of Japanese Religion (1930) by Anesaki; p. 53 and An Idealist View of Life (1957) by S. Radhakrishnan; p. 129.

২। Right action is unselfish action. Buddha does not believe in ceremonialism, prayer and ritual, spell and sacrifice. "Better homage to a man grounded in the dharma than to Agni for a hundred years".—Indian Philosophy. Vol. I. by Radhakrishnan; p. 420-21

৩। অপ্রমত্ত—নৈবেদ্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৮১

৪। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম—প্রকাশ, ১৩৬৮—সুকুমার সেন পৃঃ ১৪৭

এই বাসনা থেকে মুক্তি রবীন্দ্রদর্শনের নিজস্ব মূল কথা এবং উপনিষদ ও পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ থেকে এসেছে। তবু বুদ্ধের বাসনা ত্যাগের আদর্শ অবস্থা বিশেষে তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর বিভিন্ন নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য 'চণ্ডালিকা'য় যখন প্রকৃতি আয়নায় বুদ্ধশিষ্য আনন্দের ম্লান, ক্লান্ত ও আত্মপরাজিত রূপ দেখতে পেল তখন তার বাসনার ক্ষীণ রেশটুকুও লুপ্ত হয়ে গেল।[১] 'নটীর পূজা'য় এইভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপের সম্মুখে যখন নটীকে নৃত্যের আদেশ করা হল, তখন নাচের অঙ্গহিসাবে আবর্জনায় শ্রীমতীর রাজবাড়ীর অলঙ্কারত্যাগ তারই ইঙ্গিত দেয়।[২]

মানবজীবনের পদস্খলন ও পাপের চেয়েও যে মানুষ বড় এ বস্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তরের দান হলেও বুদ্ধের প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর এই মনোভাব তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে ইতি-পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।[৩] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মনুষ্যত্ব সমাজের সব চেয়ে বড় জিনিষ।

সনাতন বিশ্বাস সমূহের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ।[৪] উপনিষদে দুঃখের এক বিশেষ স্থান আছে। ভগবান বুদ্ধ উপনিষদের এই ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে চারটি সত্যের উল্লেখ করেন তার মধ্যে দুঃখের স্থান সর্ব প্রথমে।[৫] বুদ্ধ দুঃখের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পৃথিবী যদি

১। চণ্ডালিকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ১১৫৬ দ্রষ্টব্য।

২। নটীর পূজা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ২১৮ দ্রষ্টব্য।

৩। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৪। Buddhism grew and flourished within the fold of orthodox belief.—Buddhism by Rhys Davids; p. 85 and Indian Philosophy Vol. I. by Radhakrishnan ; p. 361.

৫। The sorrow or suffaring is not the essential fact of life on earth is admitted by almost all school of Indian thought, Upanishad included. Buddha himself was not aware of any incongruity between his theory and that of Upanisads. He felt that he had the support and sympathy of the Upanisads and their followers (p. 361)·· From the spiritual experience Buddha became convinced of the four noble truths, that there is suffering (Dukkha), that there has a cause (Samudaya) ; that it can be suppressed (Niroda), and that there is a way to accomplish this (Marga)· (p. 362) —Indian Philosophy—Vol. I. by Radhakrishnan.

শুধু মাত্র আনন্দের স্থান হত তবে ধর্মের কোন প্রয়োজনই থাকত না। দুঃখই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। মরজগৎ হতে পরিত্রাণের উপায় কি, উপনিষদের এই জিজ্ঞাসাকেই বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন। কঠ উপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করেছিলেন যে পার্থিব জগতের সম্পদ ও আনন্দ জীবনকে সুখী করতে পারে কিনা?[১] বৌদ্ধ ধর্মেও একই মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি ?
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ ? (১৪৬)
পরিজিন্ন মিদং রূপং রোগনিড্ঢং পভঙ্গুরং,
ভিজ্জতি পূতি সন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং। [২] (১৪৮) অর্থাৎ

'এই জগৎ যখন নিত্য প্রজ্বলিত হইতেছে তখন কিসের হাসি কিসের আনন্দ? তোমরা কি মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে? আলোকের সন্ধান করিবে না! এই রূপ (দেহ) পরিজীর্ণ। ইহা রোগের আবাস ভূমি ও ক্ষণভঙ্গুর; এই দেহখানি ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ ও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায় এবং মৃত্যুতে জীবনের অবসান হয়।'[২]

একথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথও দুঃখকে এক বিশেষ মহত্ত্বদান করেছিলেন এবং দুঃখকে ধর্মসাধনার সোপানরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৩] সুতরাং বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর মতবাদের এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি দুঃখকে অস্বীকার করতে বা এড়াতে চাননি। কারণ,—

দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।[৪]

১। With a happy world there would have been no need for religion. How can we escape from this world of death? is the question which the Upanisad asks and Buddha is now asking it with a renewed force. Nachiketas, the Brahmin, asked Yama, Death, in the Katha Upanisad, "Keep thou thy houses, keep dance and song for thyself. Shall we be happy with these things, seeing these?"—Indian Philosophy. Vol. I. by Radhakrishnan; p. 364.

২। ধম্মপদং—মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী; পৃঃ ১১৩-১৪

৩। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৪। পূজা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড; পৃঃ ৬৯

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্ট করে বলা খুব কঠিন। তবে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে জন্মান্তরবাদকে তিনি উড়িয়ে দেননি।[১] এই বিশ্বাসের মূলে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের প্রতি তাঁর মনোভাবের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বুদ্ধের ধর্মতত্ত্বের মধ্যে এক প্রধান বিশ্বাস বা creed জন্মান্তরবাদ। প্রাচীন ব্রহ্মণ্যমতবাদের অনুসরণ করে তিনি পুণ্য ও পাপের জন্য স্বর্গ ও নরক এবং অসম্পূর্ণের জন্য জন্মান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে কখনও বা স্বর্গ ও নরক গমনকে জন্মান্তরের পূর্ববর্তী সাময়িক অবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের বোধিলাভের জন্য তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনীগুলি জাতকের কাহিনী নামে বিখ্যাত এবং বৌদ্ধ ধর্মে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।[২] এই জন্মান্তরচক্রের আবর্তন হতে মুক্তিলাভ অর্থাৎ নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য।[৩] ভগবান বুদ্ধের বাণীর প্রতি এবং বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের কীর্তিকাহিনীগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কথা বলা হল সেটি সম্ভব হত না যদি দুজনের মৌলিক বিশ্বাসে অর্থাৎ fundamental faith-এ সন্দেহ থাকত। যদি জন্মান্তরকে রবীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন তবে মনে হয় বুদ্ধ ও বুদ্ধের বাণীকে এমন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। জন্মান্তর

১। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

২। Buddha following the Brahmanical theory presents hell for the wicked and rebirth for the imperfect. A heaven is also recognised. "On the dissolution of the body after death the well-doer is reborn in some happy state in heaven" (Mahaparinibban, i, 24). Sometimes both heaven and hell are looked upon as temporary states before rebirth happens. Early Buddhism popularised the conception of rebirth by the tales of Jataks relating the previous births of Buddha and the many deeds of sacrifice by which he prepared himself for the final victory over evil in the great conflict under the Bo-tree. —Indian Philospshy. Vol. I. by Radhakrishnan ; p. 443-44.

৩। Escape from the chain of rebirth into the bliss of life eternal is the ideal of Buddhism, as many other Indian and Non-Indian systems.—Indian Philosophy. Vol. I. by Radhakrishnan ; p. 418.

বিশ্বাসী বুদ্ধদেবের মতবাদ ও বাণী জীবনের আদর্শের মধ্যে গ্রহণের ফলে মনে হয় জন্মান্তরবাদে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

বুদ্ধের মানবসেবার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। 'নগরলক্ষ্মী' (দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহারবে…) কাহিনীর মধ্যে তারই অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের এই সমস্ত বাণী ও তত্ত্বের উপর তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের সঙ্গে যেখানে বিরোধ দেখা দিয়েছে সেখানে কবি অন্তরের উপলব্ধিকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ফাল্গুনী' নাটকের উল্লেখ করা যায়। 'ফাল্গুনী'তে দেখতে পাওয়া যায় মহারাজ তাঁর পক্ব কেশের কথা জানতে পেরে সংসারে বীতরাগ হতে উদ্যত হয়েছিলেন, অর্থাৎ এমন অবস্থায় বৈরাগ্য গ্রহণ করা চলে স্থির করেছিলেন। এটি মখাদেব কাহিনী থেকে নেওয়া সম্ভব।[১] সেখানেও দেখা যায় যে বিদেহরাষ্ট্রে মিথিলাতে মখাদেব নামে ধার্মিক রাজা স্বীয় মস্তকে কল্পক দ্বারা আবিষ্কৃত দুইগাছি পলিত কেশ দেখে রাজ্য ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই অংশের সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র প্রস্তাবনা অংশের মিল আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর উপলব্ধির বাণী হচ্ছে—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।……তাই 'ফাল্গুনী' নাটকের নাট্যাংশে দেখতে পাওয়া যায় ভিন্ন কথা। সংসারত্যাগে মনস্থির করার পর রাজাকে কবি এসে জীবন রসে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুললেন। কবি বুঝিয়ে দিলেন যে পক্ব কেশ সমাপ্তির চিহ্ন নয় এবং তাতে হতাশ হওয়ারও কারণ নেই। শুষ্ক পত্র বৃক্ষজীবনের শেষ কথা নয়। শুষ্কপত্র আসন্ন কিশলয়েরই বাণী বহন করে আনে। শীতের পর বসন্ত ও বসন্তের পর শীত এইভাবে প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনের পালার মত মানবজীবনের ঋতুপরির্তন ঘটবে। মৃত্যুর পরে আবার নবীন জীবন, আবার মৃত্যু, আবার জীবন এইভাবে সৃষ্টিলীলা চলেছে এবং চলবে যতক্ষণ না 'মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে'[২] এই পর্যায়ে ওঠা যায়। তাই দেখা যায় বুদ্ধদেবের বাণী থেকে পরম সত্যকে বেছে নিলেও রবীন্দ্র দর্শনের শেষ কথা সেখানে নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের দর্শনের মধ্যে যে জীবনচাঞ্চল্য বা চলতাধর্মীর

১। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য—প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭—অতীন্দ্র মজুমদার ; পৃঃ ৯৪-৯৭

২। পূজা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ৭০

রূপ দেখা যায় তা তাঁর সৃষ্ট আনন্দলীলার অনন্ত প্রবাহের মধ্যেই চলমান হয়ে আছে, তাকে থামতে দেওয়া হয়নি। বুদ্ধদেবের জীবন বাণীর বহু সত্যরূপ তিনি হৃদয়ে মেনে নিলেও তাঁর নিজস্ব দর্শন কোন প্রভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়ে সত্যকে তাঁর দৃষ্টি পথে নিয়ে এসে অন্তরের চিন্তামননশীলতার দ্বারা তাকে পরীক্ষা করে নিজের উপলব্ধির সঙ্গে যতদূর মিলেছে গ্রহণ করেছেন, অবশিষ্ট ত্যাগ করেছেন বা এড়িয়ে গিয়েছেন।

'এই সত্যেরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যর সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের তুলনামূলক আলোচনায়। জাতিভেদ ও আচারের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের বিদ্রোহ তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধান্বিত করেছিল।[১] সেই শ্রদ্ধা জানিয়ে 'পাগল' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"পাগল শব্দটা আমার কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি·—আমাদের খ্যাপা দেবতা মহেশ্বর।[২]" শ্রীচৈতন্যের জাতিভেদ অবলুপ্তি প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—"চৈতন্য যখন ভক্তি বন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ বাঁধ ভাঙিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।"[৩]

চৈতন্যদেবের ভক্তি সাধনায় নামমাহাত্ম্যের এক বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের নানা গানের মধ্য দিয়ে এই নাম মাহাত্ম্যকে কিভাবে স্বীকার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[৪] এমন কি ১৩২০ সালে লণ্ডন থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে বসেও রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মরণে নামের মাধুর্য অনুভব করেছেন,—

১। শ্রীচৈতন্য জাতি ও সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, চণ্ডালও ভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় বলিয়াছিলেন এবং যবন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্বেও যে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সামাজিক ভেদবুদ্ধি বিলোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ইহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।—রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমানবিহারী মজুমদার ; পৃঃ ৬

২। পাগল—বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড ; পৃঃ ৭৫৬

৩। ব্যাধি ও প্রতিকার—রবীন্দ্ররচনাবলী ; ১৩শ খণ্ড ; পৃঃ ১৩২

৪। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপট) এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—৩য় খণ্ড—সুকুমার সেন ; পৃঃ ৪৯৭ দ্রষ্টব্য।

জীবনপথে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বধূ।[১]

তবে তিনি চৈতন্যের অন্ধ অনুসরণকারী নন। চৈতন্যদেবের আবেগ প্রাধান্য যে কখনই তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি এবং সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ একান্ত সীমাবদ্ধ একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২] ভাবাবেগের বিরুদ্ধে তিনি দীপ্তকণ্ঠে বলেছেন,—

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা-'পরে
যাহারা পড়িয়াছিল ভাবাবেশ ভরে
রসপানে হতজ্ঞান যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত—
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ, শুধু দীর্ঘবেলা
তোমারে খেলনা করি খেলিয়াছে খেলা।[৩]

তিনি আরও বলেছেন,—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ।[৪] সম্ভবত: বাউল ও সংযোগী

১। গীতিমাল্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৫০
২। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।
৩। নৈবেদ্য-রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৮৪
৪। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৮১

বৈষ্ণবদের সংযোগে এসেই তাঁর মনে এই ভাবের উদয় হয়েছিল।[১] চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা ঈশ্বর কেবলমাত্র পূজায় সন্তুষ্ট হন না। তিনি চান প্রেম। সেই কারণেই ব্রজের কান্তা, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। রবীন্দ্রদর্শনেও ঈশ্বরের প্রতি মানুষের পূজা নয়, প্রেম ও ভালোবাসাই প্রধান হয়ে উঠেছে।[২]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়,—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
সখা শুধু সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করে করয়ে ভর্ৎসনা।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন ॥[৩] ১।৪

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার তুলনা করা যায়:—

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দুহাত ধরিনে।

১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় সুকঠোর চিত্তসংযমের ব্যবস্থা আছে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তদিগকে প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষ নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। লক্ষ নাম জপের সময়ে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। সাধক জপের সময় উপলব্ধি করেন যে নাম ও নামী এক। ব্রজের বৈষ্ণবগণ যেভাবে সাধনা করেন তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখেন নাই। তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের ও রাঢ়ে সংযোগী বৈষ্ণবদের সংসর্গে যতটা আসিয়া ছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনপ্রণালী অনুসরণকারী বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে ততটা আসেন নাই।—রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমানবিহারী মজুমদার ; পৃঃ ৮১

২। রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমান বিহারী মজুমদার ; পৃঃ ৯০ দ্রষ্টব্য।

৩। চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ [সুকুমার সেন সম্পাদিত (১৯৬৩)]; পৃঃ ১২

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরিনে।[১]

কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে পরকীয়া প্রেম, শ্রীচৈতন্য তাঁর ভাবাবেগে তাকে অপূর্ব করে তুলেছিলেন। 'চতুরঙ্গে' দেখা যায় যে দামিনী ভালোবেসেছিল শচীশকে। শচীশের সাধনায় যাতে কোন বাধা না পড়ে সেই কারণেই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছিল। 'দামিনী শচীশের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজেকে প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিল।[২]' রাধার বিবাহ হয়েছিল অল্প বয়সে এবং এ বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল প্রশ্নের অতীত। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। গোবিন্দদাসের মতে তিনি প্রাণপতি নন, গৃহপতি মাত্র।[৩] রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ অংশের বহু গল্প ও উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে নারী বিবাহ করে একজনকে, কিন্তু ভালবাসে অন্যজনকে। দামিনী, লাবণ্য বা 'বাঁশরী'র সুষমার মধ্যে এই ভাবেরই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ ও আচারের বন্ধন দূর করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। কারণ চৈতন্যের অনুবর্তীরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ ভুলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। রামকৃষ্ণ পরমহংস উঠেছিলেন শুধু জাতিভেদের উর্ধ্বেই নয়, সম্প্রদায়েরও উর্ধ্বে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর একাত্মতা দেখতে পাওয়া যায়। দুজনেই জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছিল একই ভাবে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, বর্ষাকালের জলভরা মেঘের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরোপলব্ধি ও এ বিষয়ে Religion of Man-এ তাঁর

১। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩
২। রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমানবিহারী মজুমদার; পৃঃ ৯৭ ৯৮
৩। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান—বিমানবিহারী মজুমদার; পৃঃ ৯৮

নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।[১] রামকৃষ্ণ পরমহংসেরও বয়স যখন ছয় বৎসর তখন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জুন বা জুলাই মাসে জলভরা মেঘের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে আকস্মিক উপলব্ধি ঘটেছিল।[২] রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। পরমহংসও সকল কিছুর মধ্যেই ভগবানের সৌন্দর্যরূপ উপলব্ধি করতেন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে উভয়ের এক গভীর পার্থক্য আছে। কারণ মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত হতে পারে যুক্তিময় কর্মের মধ্য দিয়ে, স্বপ্নময় সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে নয়।[৩]

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে ইঙ্গিত একমাত্র 'মালঞ্চে' পাওয়া যায়। রোগকাতর নীরজার ঘরে সীমাবদ্ধ আসবাবের মধ্যে রয়েছে দেওয়ালে একটি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি।[৪] ভারাক্রান্ত নীরজা রমেনকে জানিয়েছে যে যখন তার অশ্রুজলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায়, তখন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সে চেয়ে থাকে পরমহংসের ছবির দিকে, কিন্তু তাঁর বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করার মত শক্তি তার নেই।[৫] নীরজা পরমহংসদেবের ছবির দিকে চেয়ে দুহাত জোড় করে প্রার্থনা জানিয়েছে,—"বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও

১। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

২। রামকৃষ্ণের জীবন—প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৯—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক ঋষি দাস ; পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য।

৩। ভগবানের সৌন্দর্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হওয়ার পথটিও ছিল তাঁর কাছে স্বাভাবিক ও সুপরিচিত। সমস্ত কিছুর মধ্যেই রামকৃষ্ণ বিধাতার সৌন্দর্যরূপ দেখিতেন। তিনি ছিলেন আজন্ম শিল্পী। এ বিষয়ে ভারতের অপর এক মহাত্মার সহিত—মহাত্মা গান্ধী, ইতিপূর্বেই আমি তাঁহার ইউরোপীয় প্রচারক হইয়াছি—তাঁহার কি গভীর পার্থক্যই না দেখা যায়। শিল্পবর্জিত, স্বপ্ন বর্জিত মানুষ হইলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি সেগুলিকে কামনা করেন নাই, বরং সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি যুক্তিময় কর্মের মধ্য দিয়া ভগবানের গোচরীভূত হইতে চান।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ ; অনুবাদক ঋষি দাস ; পৃঃ ৭

৪। মালঞ্চ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড ; পৃঃ ৮০৭

৫। বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী ত হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো।—মালঞ্চ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড ; পৃঃ ৮৬২

মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার।"[১] এরই মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান সম্বন্ধে প্রথমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধারণা ছিল যে সকল কিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন যেহেতু তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু পরে তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন হয়। তিনি অনুভব করলেন যে সকল কিছুই ভগবান ও সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি কাজ করছেন। এইভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে তিনি যে মিলন সাধন করলেন তার ফলে মানুষ হয়ে উঠল পবিত্র।[২] রবীন্দ্রদর্শনেও এই তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও মানুষকেই বড় করে দেখিয়েছেন। কারণ মানুষই ভগবান। তাঁর নানা রচনায় এই মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন,—

ভজনপূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।....
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস,
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে,
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।[৩]

১। মালঞ্চ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড; পৃঃ ৮৬৩

২। প্রথমে ভগবান সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি এই ছিল যে, ভগবান সর্বব্যাপী. সমস্ত কিছুই ভগবানের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ভগবান সেই সূর্যের মতো যে সূর্য সমস্ত বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ও মিশ্রণ করিতেছে। কিন্তু এই ধারনা হইতে পারে তাহার মধ্যে যে প্রাণোচ্চ অনুভূতি জন্মিল, তাহা হইল সমস্ত কিছুই ভগবান; সমস্ত কিছুই এক একটি ক্ষুদ্র সূর্য; এই সব কিছুর মধ্যেই তিনি রহিয়াছেন এবং কাজ করিতেছেন। ইহা সত্য যে, এই দুইটির মধ্যে একই ভাব রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে সম্পূর্ণ উলটাইয়া দিয়াছে। ফলে কেবল সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন নহে, সর্ব নিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত, দুইটি যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে সমস্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে যুক্ত করিয়াছে। এইরূপে মানুষ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।—রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ।—অনুবাদক ঋষি দাস—পৃঃ ৬৯

৩। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী,—২য় খণ্ড; পৃঃ ২৯১

রামকৃষ্ণ পরমহংস মায়াকে উপেক্ষা করেননি, অথবা মায়া হতে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেননি। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিষ্য রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই গুরু তোতাপুরী উপলব্ধি করেছিলেন যে সন্ন্যাসীরাও মায়ার কবল থেকে মুক্ত নয়, মায়াকে গ্রহণ করেও ঈশ্বরোপলব্ধি হতে পারে ও ব্রহ্ম এবং শক্তি বা মায়া এক।[১] মন্দ এবং মায়া সমস্তই ভগবান। সেইজন্য যারা সকল কিছুকে স্বীকার করেন পরমহংস তাদেরই পছন্দ করতেন।[২] রবীন্দ্রনাথ সে দর্শন বিশ্বাস করতেন না, যে দর্শন সংসারকে মায়া বলে। তিনি তাঁর অজস্র রচনায় মায়াকে এক উচ্চ স্থান দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত মতবাদের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[৩] সংসারকে রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ করেননি। সংসারে থেকে যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, মুক্তি সুদূরপরাহত হয়, এ মতবাদ তিনি গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রদর্শনের মূলকথা,—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।[৪]

রামকৃষ্ণ পরমহংসও সংসারীদের একই আশার বাণী শুনিয়েছেন। সংসারীদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন,—"গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।"[৫] স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগীদের অপেক্ষা

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ (উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়—রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ) দ্রষ্টব্য।

২। "জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং গভীর নিদ্রাবস্থা—এই তিন অবস্থাকেই জ্ঞানী অস্বীকার করেন। কিন্তু ভক্ত এই সকল অবস্থাকেই গ্রহণ করেন।" তাই যাঁহারা সকল কিছুকে, এমনকি মায়াকে গ্রহণ করেন, সকল কিছুকে স্বীকার করেন, ভালোবাসেন, কিছুকেই অস্বীকার করেন না, কারণ মন্দ এবং মায়া সবই ভগবান; রামকৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধভাবে তাঁহাদিগকেই অধিক পছন্দ করিতেন। —রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ—অনুবাদক ঋষি দাস; পৃঃ ২৩৮

৩। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৪। নৈবেদ্য—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৭৪

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬—শ্রীম কথিত পৃঃ ৭১ এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংসারীদের স্থান উচ্চে স্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে,—"সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর একথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ।"[১] অর্থাৎ দেখা যায় তিনজনেরই ভাবধারা একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল।

আমাদের দেশে কুমারী পূজা ইত্যাদির যে প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তার প্রকৃত অর্থ নারী পূজার মধ্য দিয়ে শক্তি পূজা। শক্তি নারীরূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। ইউরোপে ঠিক এই শ্রেণীর কোন পূজা প্রচলিত না থাকলেও সকল বিষয়েই প্রথমে নারীর স্থান দিয়ে পরোক্ষে শক্তিরই পূজা করা হয়।[২] ইউরোপের এই ধর্মগত শক্তি পূজা এবং আমাদের শক্তি পূজার সঙ্গে তার পার্থক্য স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন। ইউরোপের শক্তি পূজা কর্মের মধ্য দিয়ে, আমাদের দেশে অনুষ্ঠানের মধ্যে। প্রধান কথা এই যে কর্মকে উপেক্ষা করে ধর্মকে পূজা করাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন নি। [৩]রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনার মধ্য দিয়েও এই কর্মের প্রতি, এই শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব। এইজন্যই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন,—"হে ঈশ্বর তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯; পৃঃ ৫৮

২। আর মেয়ের পূজো। এ শক্তি পূজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তি পূজো কুমারী-সধবা-পূজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তি পূজো। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থ স্থানেরই, সেই ক্ষণমাত্র, এদের দিনরাত, বারোমাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর খাতির।—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ ১৩৬৯, পৃঃ ১৯১

৩। ইউরোপের ধর্মের মধ্যেও স্বামীজী শক্তি পূজারই আভাস দেখেছিলেন। আমাদের সর্ব সাধারণ্যে প্রচলিত যে শক্তি পূজা তার সঙ্গে ইউরোপের এই শক্তি পূজার তুলনা করে স্বামীজী বলেছেন, "আমাদের পূজা ঐ তীর্থস্থানেরই, সেই ক্ষণমাত্র, এদের দিনরাত, বারোমাস।" বস্তুত কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মকে পূজা স্বামীজী কখনই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না।—প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেশবিদেশ—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল (বিদ্যাপীঠ-বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা); পৃঃ ৩১

করো। আজ উৎসবের দিন শুধুমাত্র ভাবসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধ মাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে, আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি উপলব্ধির দিন, শক্তি সংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদবোধিত করো', প্রতিদিনের নিবীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে, আরাম আবেশ হইতে উদ্ধার করো।"[১] 'প্রতিনিধি'তেও এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানবজীবনের কর্মপালনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপালন করা হয়। এইভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মের পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন 'প্রতিনিধি'তে শিবাজীর গুরু রামদাস।[২]

ইউরোপের আত্মিক দৈন্যের কথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। ইউরোপের হৃদয়ের কথা এই যে সেখানে প্রকৃতি, মানুষ এবং ভগবান প্রত্যেকেই পরস্পর হতে পৃথক ও সেই কারণে ইউরোপের ধর্মগুরুরাও স্বতন্ত্র ভগবানকেই জানতে চান।[৩] তাঁর মতে ভারতের ধারা ভিন্নমার্গী। ভারতের চিন্তা বা বিদ্যাবুদ্ধি সকল কিছুই আধ্যাত্মিক এবং সকল কিছুরই বিকাশ ধর্মে। স্বাতন্ত্র্যতার ধারণা যে ভুল একথা ভারতের মনীষিরা বুঝতে পেরেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ-দেবতা এমন কি ঈশ্বরের মধ্যেও অবিচ্ছিন্ন ঐক্য আছে। সেই কারণে অদ্বৈতবাদীরা শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে বহুর মধ্যেই একের বিকাশ এবং এই পৃথক অস্তিত্বের ধারণা ভ্রান্ত, যার নাম তাঁরা দিলেন 'মায়া,' 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান।[৪] ইউরোপের আত্মিক দৈন্য ও পৃথক সত্তার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের

১। উৎসবের দিন—ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৮

২। প্রতিনিধি—কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

৩। প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে দেশ বিদেশ—ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল (বিদ্যাপীঠ—বিবেকানন্দ শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা); পৃঃ ৩২

৪। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষিরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল, ও সব আলাদা আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদীরা এক চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম', আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হল জ্ঞানের চরম-সীমা।—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,-ষষ্ঠ খণ্ড; ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯; পৃঃ ২০০

ভাবধারায়ও আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেন না স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃ প্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে।"[১] স্বামীজীর মত রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন ভারতের প্রাণকেন্দ্রে অখণ্ডসত্তার অনুভূতি। ভারতের সাধনা বহুর মধ্য দিয়ে একের সাধনা।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কার ধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।[২]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই হৃদয়গত পার্থক্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে তাঁরা চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হোক যার ফলে গড়ে উঠতে পারে সুন্দর মানব সমাজ, আদর্শ বিশ্ব। বিবেকানন্দের সাধনা ছিল পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মিলনসাধন।[৩] তাঁর মতে,—"ইউরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপকে শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু, ইউরোপীয় বলে কিছু থাকবে না; উভয় প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করেছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম

১। শিক্ষার মিলন—শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড; পৃঃ ৬৭১
২। ভারততীর্থ—গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৮১
৩। বিবেকানন্দের সম্মুখে কাজ ছিল দুইটি পাশ্চাত্য সভ্যতা যে অর্থ ও সামগ্রী অর্জন করিয়াছে তাহা ভারতে লইয়া আসা, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদকে পাশ্চাত্য জগতে লইয়া যাওয়া। একটি বিশ্বস্ত বিনিময়, একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা।—বিবেকানন্দের জীবন—রোঁমা রোঁলা অনুবাদক ঋষি দাস, পৃঃ ৬৫

স্বাধীনতা।"[১] রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর মিলন। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।' একই মতবাদের অনুবর্ত্তী হয়ে তিনি বলেছেন,— 'পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে। সেই সাধনা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে।[২]"

স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই একথা বিশ্বাস করতেন যে একদিন জড়বাদী ইউরোপ ভারতের অধ্যাত্মবাদের মহিমা কেবলমাত্র উপলব্ধি করবে না, মহিমা কীর্তনও করবে। তাঁরা উভয়েই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভারতকে জাগাতে চেয়েছেন।[৩] রবীন্দ্রনাথের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধ মতবাদের কথা বুদ্ধদেবের ধর্মদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীজীও জাতিভেদের মলিনতা দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন,—"ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"[৪] একই সুর ধ্বনিত হয় যখন রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানান,—

এসো, ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত কর অপনীত সব অপমান ভার।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯; পৃঃ ৪৬৭

২। শিক্ষার মিলন—শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড; পৃঃ ৬৭৪

৩। স্বামীজী যেমন আচণ্ডাল সমগ্র ভারতকে জাগাবার বাণী উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সকলকেই জাতিবর্ণভেদ ভুলে ঐকামন্ত্রে দীক্ষিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইউরোপকেও যে একদিন সমস্ত জড়বাদের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মহিমা কীর্তন করতে হবে একথা স্বামীজীর মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন। কবি তাই স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন—পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও একদিন বলিতে হইবে "যেনাহং নামৃতা কিমহং তেন কুর্যাম।"—প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে দেশবিদেশ— ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল; পৃঃ ৩২

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ২৪৯

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবায় পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।[১]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করতেন।[২] তাঁর এই শ্রদ্ধা জন্ম অধিকারগত ব্রাহ্মণের প্রতি নয়, কর্ম অধিকার গত ব্রাহ্মণের প্রতি। স্বামীজীও দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ সমাজে তুলে নেওয়ার আকাংক্ষা প্রকাশ করেছেন,।[৩] যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় কর্মের অধিকারে। রবীন্দ্রনাথ সমাজব্যবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর আদর্শচ্যুতির কথা নানা রচনায় ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন,—"ব্রাহ্মণও যখন আপন কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।"[৪] বিবেকানন্দও ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমাজ স্থাপন প্রসঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সমালোচনা করেছেন এবং সে সমালোচনার ভাষা হয়েছে তীব্র।[৫]

মানবকল্যাণের প্রতি আকর্ষণ, দুঃখ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস বুদ্ধদেবের দর্শনপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজীর

১। ভারততীর্থ—গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৮২

২। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৩। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না,' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড; ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯; পৃঃ ৭৮

৪। ব্রাহ্মণ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড; পৃঃ ১০৩৫

৫। রবীন্দ্রনাথও ভারতের সমাজব্যাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং এদেশের তথাকথিত উচ্চবর্ণেরা যে যে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সে কথাও নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।......যথার্থ ব্রাহ্মণসমাজ গড়িয়া তুলিতে বিবেকানন্দও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অধঃপতিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের ভাষা হইয়াছে অধিকতর জ্বালাময়ী (যেমন 'অতীতের কঙ্কালচয়', 'হাজার বছরের মমি', 'Kick out priest craft' প্রভৃতি)।—যুগমানব রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন (গল্পভারতী, বৈশাখ, ১৩৬৯); পৃঃ ১১৩২

পথও সেই পথ থেকে ভিন্ন নয়। সেইজন্য দেখা যায় যে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মানুষের দুঃখদুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তিনি নিজে প্রশ্ন করেছিলেন,—"আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এই অগণিত মানুষের জন্য কি করিয়াছি?"[১] ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুন-জুলাই মাসে বিলাত যাত্রাকালে সমুদ্রপথে দুঃখকে তিনি অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের সহায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সুখের অশ্রুতে নয়, দুঃখের অশ্রুতেই এই দৃষ্টি শক্তির উন্মেষ ঘটে।[২] তিনি তাঁর 'জগৎ' সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন।[৩]

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে একমাত্র 'ভানুসিংহের পদাবলী' ব্যতীত রাধা কৃষ্ণের আদর্শ কল্পনা কচিৎ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবনা ছাড়া আর কোন আদর্শ সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অপরপক্ষে তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বার বার নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মহেশ্বর হয়ে উঠেছেন প্রধান ও চরম আদর্শ। নটরাজের রুদ্ররূপের মধ্যে কবি শিব-সত্য ও শিব-সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে কুমারসম্ভবের শিবপার্বতীর মিলনের প্রভাব 'সোনার তরী'র 'প্রতীক্ষা'য় অনুভব করেছেন এবং নটরাজ শিবকে কবির জীবনদেবতারূপে অভিহিত করেছেন।[৪] এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকলেও রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিব যে রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশী মহত্বলাভ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিব অধিক প্রিয় ছিলেন। শিবের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, "He is the great God, calm, beautiful and silent! and I am His great worshipper."[৫] ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ প্রেমশিক্ষার

১। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক ঋষি দাস; পৃঃ ২১

২। The tears of sorrow alone bring spiritual vision, never tears of joy.—Reminiscences of Vivekananda; p. 277.

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—২য় খণ্ড; ১৩; ৬৯ পৃঃ ১২৬—৩৫ দ্রষ্টব্য।

৪। ত্রয়ী—২য় সংস্করণ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত; পৃঃ ২০৫ দ্রষ্টব্য।

৫। Notes on some wanderings by Sister Nivedita; p.3

কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোন ভুল না হয়। যুবকযুবতীদের (পক্ষে) রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে।"[১] ভগিনী নিবেদিতাও লিখেছেন যে কর্মের প্রসঙ্গে স্বামীজী কখনই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করতেন না। শিবই ছিল তাঁর প্রিয় দেবতা।[২] অর্থাৎ উভয়ের কাছেই রাধাকৃষ্ণ নয়, শিবই ছিলেন আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যান্য সমস্ত শিষ্যই একথা বিশ্বাস করতেন যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যখন সন্তান জননীর সম্বন্ধে পর্যবসিত হয়, গৃহিণী যখন জননী হন, তখনই বিবাহ সার্থকতা লাভ করে। এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই মানুষ দেবত্বে উপনীত হয়।[৩] রবীন্দ্রনাথও এইভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। চতুর্দশবর্ষ বনবাস যাত্রাকালে গান্ধারী দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন,—

তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।[৪]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু উভয়েই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীকে উপলব্ধি করেছিলেন। একথা

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২।

২। He did not talk of Radha and Krishna, where he looked for deeds. It was Siva who made stern and earnest workers, and to Him the labourer must be dedicated.—Notes on some Wanderings by Sister Nivedita ; p. 83.

৩। All the disciples of Ramkrishna believe that marriage is finally perfected by the man's acceptance of his wife as the mother ; and this means, by their mutual adoption of the monastic life. It is a moment of the mergence of the human in the divine, by which all life stands thence forward changed. —The Master as I saw him by Sister Nivedita ; p. 327-28.

৪। গান্ধারীর আবেদন—কাহিনী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড ; পৃঃ ৫৩৩

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' কর্মে ব্রাহ্মণ কিন্তু জাতিতে সোনার বেনে শচীশের চরিত্র সৃষ্টি করেন।[১] স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল প্রিয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তিনি যে কেবল অন্তরের কথাই পেয়েছিলেন তা নয়, তিনি নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন কাশীতে স্বামীজীর কণ্ঠেই প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে পান।[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।[৩] বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন শাস্ত্রের নির্দেশকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের নির্দেশকে প্রধান করেছেন। অন্তরের উপলব্ধ শাস্ত্রই সকল বাহ্য শাস্ত্রের বিধিনিষেধকে অতিক্রম করে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল অনুশীলনের প্রতিষ্ঠা। 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন,— ১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার নাম বৃত্তি দিয়াছি। সেগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। ২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। ৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তির সামঞ্জস্য। ৪। তাহাই সুখ[৪] 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি জানিয়েছেন যে জীবনের সার্থকতার জন্য পরিশ্রমের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে সমস্ত বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি ও সেই ভক্তি ছাড়া মনুষ্যত্ব নেই।[৫] 'কৃষ্ণ চরিত্রে' তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অনুশীলনের পূর্ণতা একমাত্র কৃষ্ণের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করেছে এবং সেইকারণে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রই একমাত্র আদর্শস্থল।[৬] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন

১। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

২। বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত—ক্ষিতিমোহন সেন (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৫); পৃঃ ২

৩। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৪। কৃষ্ণ চরিত্র (উপক্রমণিকা, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ১০

৫। জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানু-বর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।—ধর্মতত্ত্ব (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ৬৮

৬। পঞ্চম পরিচ্ছেদ (উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন) দ্রষ্টব্য।

সময়েই কৃষ্ণ চরিত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। কৃষ্ণের চেয়ে শিবের মহত্ব যে তাঁর কাছে বেশী ছিল বিবেকানন্দের সঙ্গে ধর্মদর্শনের আলোচনায় সে কথা বলা হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দুগৌরব প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। তাঁর বহু রচনায় বহুভাবে প্রাচীন হিন্দুগৌরব কীর্তিত হয়েছে। 'সীতারামে' দেখতে পাওয়া যায় যে পুরাতন হিন্দু স্থাপত্যের নৈপুণ্যে এবং উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, পাতঞ্জল, পাণিণি ইত্যাদি হিন্দুকীর্তি স্মরণে সীতারাম নিজের হিন্দুবংশে জন্মলাভ সার্থক বলে মনে করেছেন।[১] রবীন্দ্রনাথ এইভাবে কোথাও সীমাবদ্ধ হননি। তাঁর আদর্শ সকলক্ষেত্রেই ধর্মের সম্প্রদায়গত গণ্ডীর বাঁধন অতিক্রম করে বৃহত্তর, প্রশস্ততর ক্ষেত্রে মুক্তি ও সার্থকতা লাভ করেছে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গোরা'। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েননি। তিনি সকল ক্ষেত্রেই বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন। প্রাচীন হিন্দুগৌরব তাঁর কাম্য হলেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি। সেই কারণে তিনি 'রাজসিংহে'র উপসংহারে লিখেছেন,—"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন তারতম্য নির্দেশ করা এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না।......অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।......ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।" আবার 'সীতারামে'ও বর্তমান সংস্করণে পরিত্যক্ত এক অংশে দেখা যায় যে ফকীর সীতারামকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি সীতারাম হিন্দু মুসলমানের দেশে দেশাচারের বশীভূত

১। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু?......এই সকল স্ত্রী মূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিণি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত বৈশেষিক এসকলই হিন্দুর কীর্তি এ পুতুল কোন ছাড়। তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।—সীতারাম (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৪০

হয়ে হিন্দু মুসলমানকে সমান না দেখেন তবে তাঁর রাজ্য স্থাপনের আশা সার্থক হবে না, তিনি রাজ্যরক্ষা বা ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারবেন না।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নৈতিক পদস্খলনের মলিনতাকে তুচ্ছ

করে মানুষকে কিভাবে বড় করে তুলেছেন এবং বিধবাবিবাহ বিষয়ে দুইজনের মতামতের বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়েছে।[২] রবীন্দ্রনাথ বিধবার অন্তরের প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিধবাবিবাহের প্রতিকূল, যদিও তিনি দৃঢ়ভাবে এইমত ব্যক্ত করেন নি, কিন্তু তাঁর রচনায় এই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাম্যে' তিনি বলেছেন,—"বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে। তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহের অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।"[৩] শেষাংশের মধ্যে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ মতবাদই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। পরোক্ষে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে যে এই প্রথা সৎ স্বভাববিশিষ্টের অনুকূল নয় ও ফলে বিধবাবিবাহ অনাচারেরই প্রতিষ্ঠা করবে।

চৈতন্যদেবের ভাবাবেগ যে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেনি এ বিষয়ে

শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও চৈতন্যদেবের ভাবাবেগকে উচ্চে স্থান দেননি এবং সেই কারণেই 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন যে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম নয়। এ বিষয় আগেই বিশদ

১। ফকীর কহিল, "বাবা শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।"—সীতারাম (সহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পাঠভেদ) —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ১৭৮

২। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

৩। সাম্য (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ৩৯

আলোচনা করা হয়েছে।[১] জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রও জাতিভেদের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ করতেন বলে মনে হয়। কারণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপক হেষ্টির সঙ্গে তাঁর যে বিতর্ক হয় সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে হিন্দুধর্মের রীতিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, অত্যাবশ্যক এবং অত্যাবশ্যক নয়। ধর্মে সামাজিক ব্যবস্থায় যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে সেটিকে অত্যাবশ্যক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতিকে স্বচ্ছ ধর্মাচরণের রূপদান করতে চেয়েছেন। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনায় দেশপ্রীতির সঙ্গে ধর্মের এরকম মিলনসাধন করা হয়নি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত গীতার উপর ভিত্তিশীল। তিনি যেখানেই ধর্মমত প্রচার করেছেন সেখানেই গীতার বাণী প্রধান হয়ে উঠেছে।[৩] রবীন্দ্রনাথ গীতার উপর নির্ভরশীল নন। তাঁর ধর্মজীবনের ভিত্তি উপনিষদকে অবলম্বন করে। সেই কারণে দেখা যায় তাঁর রচনায় উপনিষদের উক্তির প্রাধান্য, গীতার উদ্ধৃত বা উল্লেখ কম। অপর পক্ষে মহাত্মা গান্ধীও গীতায় অসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর ভগবদ্ বিশ্বাস ছিল দ্বৈতবাদী হিন্দুদের অথবা খৃষ্টান বা মুসলমানদের মত **Personal God** বা পুরুষ ভগবত্তায় বিশ্বাস। লণ্ডনে বাসকালীন স্যার এডুইন আরনল্ডের 'সঙ্গ সিলোশ্চয়ালে' গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে গীতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। গীতার পরই

১। পঞ্চম পরিচ্ছেদ (ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন) দ্রষ্টব্য।

২। The students must distinguish between the essentials of Hinduism and its Non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure ethics and not religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential.—বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪৮৫

৩। পঞ্চম পরিচ্ছেদ (ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন) এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।

তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র প্রভাব গান্ধীজীর ধর্মজীবনে অধিক। সেইসঙ্গে গুজরাট—মারাঠার বৈষ্ণব সাধক কবিদের এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের সন্ত কবিদের প্রভাবও তাঁর ধর্মজীবনে পড়েছে।[১]

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়ের কাছেই ধর্ম কোন প্রথাবদ্ধ প্রণালীর মধ্যে আসে নি, এসেছে জীবনবোধের মধ্য দিয়ে। এই দুইজনেই ছিলেন অধ্যাত্মবিশ্বাসী, তবুও দুইজনের মত ও পথ অনেকক্ষেত্রেই ভিন্নধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজীর মুখ্য কর্মস্থল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে তাঁকে সকল ধর্ম ও সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়েছে। এই কারণে সর্বসাধারণের মত ও বিশ্বাসের কাছাকাছি যে মত ও পথ আছে সেই ধর্মমতকে গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন। 'রামধুন' গান এইজন্যই তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ এই গানের মধ্য দিয়ে সর্ব শ্রেণীর ও সর্বধর্মীয়দের সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন এবং উপাসনা মন্দিরের আচার্যরূপেও কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ভাবের প্রকৃত প্রকাশ হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে, সমাজের নেতা বা মুখপাত্র হিসাবে নয়।[২]

১। গান্ধীজী গীতা পড়েন প্রথম লণ্ডনে বসিয়া দুইটি থিওসফিষ্ট বন্ধুর প্রভাবে। মূল গীতা পূর্বে কোনও দিন পড়েন নাই, প্রথমে পড়িলেন ইংরাজী অনুবাদ, স্যার এড়ুইন আরনল্ডের সঙ সিলেশ্চিয়াল (Song Celestial) পরবর্তীকালে গুজরাট-মারাঠার বৈষ্ণব সাধক কবিগণ এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের সন্তকবিগণও গান্ধীজীর ধর্মবোধকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। গীতার পরে যে গ্রন্থখানি গান্ধীজীর ধর্মজীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইল গোস্বামী তুলসীদাসের রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'রামচরিত-মানস'।—টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ (১ম প্রকাশ, ১৩৫৯)—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ; পৃঃ ৫৯

২। ভারতবর্ষের সর্বসাধারণকে লইয়াই যখন তাহার সমস্ত জীবন কাজ করিতে হইয়াছে—শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সর্বদা নিজের সঙ্গে টানিয়া লইতে হইয়াছে—হিন্দুমুসলমান-খৃষ্টান পার্শী কাহাকেও বাদ দিলে চলে নাই—তখন ধর্মমতকে গান্ধীজী এই সকল শ্রেণীর জনসমাজের যে একটা সরল বিশ্বাসের মত ও পথ আছে—সেই মত ও পথের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন। এইভাবে 'রামধুন' গান তাঁহার সর্বপ্রিয় ভজন হইয়া উঠিয়াছিল।...ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপেই তিনি কাজ করিয়াছেন, উপাসনামন্দিরের আচার্য রূপে তিনি অনেক উপাসনা করিয়াছেন, ভাষণ দান

গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভীষ্টলাভের অস্ত্ররূপে অনেক সময়েই ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। কারণ জনসাধারণের ধর্মের প্রতি এক স্বাভাবিক দুর্বলতা রয়েছে এবং সেই কারণেই ধর্মের রূপদান করলে অনেক সময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য তিনি বিদেশী বস্ত্রকে 'অপবিত্র' এবং অস্পৃশ্যতাকে 'পাপ' বলে অভিহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গান্ধীজীর বহু পূর্ব হতে। কিন্তু অস্পৃশ্যতাকে 'পাপ' বলে অভিহিত করার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না।[১] বিদেশী বস্ত্রকে 'অপবিত্র' বলে অভিহিত করাও তাঁর মতের অনুকূল ছিল না। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রমতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে খাতায় জিওমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে সেই খাতা নষ্ট করে এ ভুলের সংশোধন হয় না; জিওমেট্রিরই সত্য নিয়মে সে খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের মনে একথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি তাহলে এরা ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে অন্যসব কাজ ছেড়ে সকল প্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে; তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের ওপরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না; তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের লড়তে হবে—এক হুকুম থেকে আর এক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না।[২] 'কালান্তরে'র বহু প্রবন্ধে তিনি কঠোরভাবে গান্ধীজীর নীতিকে

করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ধর্মের প্রকাশ ইহাদের মধ্যে ততখানি সত্য হইয়া ওঠে নাই যতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবিকর্মের মধ্য দিয়া। —টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত; পৃঃ ৪৪-৪৫

১। অস্পৃশ্যতাকে 'পাপ' বলিয়া একটা ধর্মসংস্কারের কোটায় টানিয়া আনিবার রবীন্দ্রনাথ অপক্ষপাতী ছিলেন।—টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত; পৃঃ ৮২

২। সত্যের আহ্বান—কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩

সমালোচনা করেছেন, তাঁর মতে স্বরাজলাভের প্রথম স্তর হচ্ছে প্রচলিত ধর্মসংস্কার হতে মুক্তিলাভ করা।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিহারে যে প্রবল ভূমিকম্প দেখা দেয় 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী তার কারণরূপে বিহারের বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতা পাপকে উল্লেখ করেন। ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করে বলেন যে, পাপ ও ভুলভ্রান্তি যত প্রবলই হোক, কখনও এত শক্তিশালী হতে পারে না যে সৃষ্টির আধারকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে। কেননা এই সৃষ্টির আধারেই পাপী ও পুণ্যাত্মা, আস্তিক ও নাস্তিক সমানভাবে নির্ভরশীল।[১] গান্ধীজী কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর 'হরিজনে' নিজের পূর্ব বক্তব্যকে দৃঢভাবে সমর্থন করে তিনি লিখলেন যে আত্মা ও জড়বস্তুর সঙ্গে বিবাহের সুদৃঢ় বন্ধন আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিপদপাত নৈতিক উন্নতির সাহায্য করে।[২]

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা আন্দোলন ভারতে ব্যাপকরূপে দেখা দেওয়ার প্রায় দশ বৎসর আগে 'ভারততীর্থ' ও 'অপমানিতে' অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর মতে অস্পৃশ্যতা মনের অসুস্থতার ফলে উদ্ভূত। ধর্মবিগর্হিত অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য কেবল অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেই হবে না। এর অর্থ সর্বজনের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার,

১। As for us, we feel perfectly secure in the faith that our sins and errors, however enornous, have not got enough force to drag down the structure of creation to ruins —টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত ; পৃঃ ৪৯ ও ১৭৪ দ্রষ্টব্য।

২। I have not the faith which Gurudeva has, that "Our sins and errors, however enormous, have not got enough force to drag down the structure of creation to ruins". On the contrary, I have faith that our sins have more forces to ruin that structure than any more the physical phenomenon. There is an indissoluble marriage between matter and spirit. Our ignorance of the results of the union makes it a profound mystery and inspire awe in us, but it cannot undo them. But a living recognition of the union has enabled many to use the very physical catastrophe for their own moral uplifting.—Harijan, dt. 16.2.34.

প্রীতিভালবাসা এবং সেবা। অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা বর্জন অহিংসায় এসে পরিসমাপ্ত হয়।[১]

অনশনের উপর গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অনশনের ফলে যে দৈহিক ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে আত্মিক শক্তি বর্ধিত হয়।[২] অধিকন্তু যখন এমন কোন দুঃখ বা দুর্দশা দেখা দেয় যা দূর করা সম্ভব নয়, তখন উপবাস ও প্রার্থনাই একমাত্র পথ।[৩] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে এবিষয়ে একমত ছিলেন না। গান্ধীজী বহুবার অনশনকালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনশনকালে বিচলিত বোধ করেছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন গান্ধীজী অনশনের সঙ্কল্প করেন তখন ১৫ই মে দার্জিলিং হতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক চিঠিতে জানান যে যারা মন্দ কাজ করে অনশনের কোন প্রত্যক্ষ ফল তাদের উপর পড়ে না। অপর পক্ষে যে অনশন সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারীর জীবনের অবসানে সক্ষম সে অনশন কখনই সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করতে পারে না।[৪]

১। The "touch-me-not"-ism that disfigures the present day Hinduism is a morbid growth. It only betrays a woodenness of mind, a blind self-conceit. It is abhorrent alike to the spirit of religion and morality.......The observance (of the view of the removal of untouchability) is not fulfilled merely by making friends with "untouchable" but by loving all life as one own-self. Removal of untouchability means love for and service of the world and it thus merges into ahimsa.—Selection from Gandhi by N. K. Bose; p, 268-69.

২। It is my firm belief that the strength of the soul grows in proportion as you subdue the flesh.—Young India, dt. 23. 10. 24.

৩ My religion teaches me that whenever there is distress which cannot remove, one must fast and pray.—Young India, dt. 25. 9. 24.

৪। The fasting which has no direct action upon the conduct of misdoers and which may abruptly terminate one's power further to serve those who need help, cannot be universally accepted and therefore it is all the more unacceptable for any individual who has the responsibility to represent humanity.—quoted in Tagore and Gandhiji Argue by Jag Pravesh Chander, Lahore, 1945.

গান্ধীজী যখন জনসাধারণের উপর প্রভাব সম্বন্ধে চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতিদের সঙ্গে তুলনায় রামমোহন রায়কে 'বামন' বলে উল্লেখ করেছিলেন।[১] তখন তাঁর সেই উক্তি রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। 'চরকা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"মহাত্মাজীর সঙ্গে কোন বিষয়ে আমার মতের বা কার্য প্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেন না, যাকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কি হতে পারে? ......যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি—অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণেই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না।"[২]

শ্রীঅরবিন্দ গীতার দর্শনকেই তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। এই দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে বেদ ও উপনিষদের আদর্শের মিলনের ফলে তাঁর জীবনদর্শন হয়ে উঠেছিল চলতাধর্মী।[৩] তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম ও বীরভাবে কর্তব্য পালনকেই কেবল

১। Ram Mohan and Tilak (leave aside my case) were so many pigmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Shanker, Kabir and Nanak.—An Unmitigated Evil by M. K. Gandhi (Young India, dt. 13. 4. 21.)

২। চরকা—কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড; পৃঃ ৩৩৬

৩। As a political worker he adopted the philosophy of the Gita, the philosophy of action without attachment and with self-surrender to the will of God. With it he had synthesized of the idealism of the Vedas and the Upanisads and developed a dynamic philosophy closely resembling that of the Saivism and Tantrism mentioned above.—The chief currents of contemporarv Philosophy (1950) by Dhirendra Mohan Dutta; p. 52.

গ্রহণ করেননি, কর্তব্য কি সে বিষয়েও অনুশীলন করেছেন।[১] তাঁর দর্শনের সর্ব প্রধান বিশেষত্ব মহামানবতা পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য মানবের কর্তব্যনির্দেশ এবং স্রষ্টিকর্তার সহায়তায় ও সকল মানবের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় সকল মানবের উন্নতি বিধান। ভগবান বুদ্ধও ব্যষ্টিগত নয়, সমষ্টিগত মানবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করতেন। এই অর্থে উভয়ের মধ্যে এক গভীর সাদৃশ্য আছে।[২]

শিবের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, পৃথিবীর অস্তিত্ব শিবের নিবিড় আনন্দ নৃত্য ব্যতীত কিছুই নয়। এরই ফলে ঈশ্বর এক হতে বহুতে প্রতিভাত হয়েছেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ

১। একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্তা গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাস-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন অপরদিকে ইংরাজ দর্শনাসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র বীরভাবে কর্তব্য পালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমণ্ডলীর মধ্যে ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন।...বীরভাবে কর্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধর্ম বটে তবে কর্তব্য কি, এই জটিল সমস্যা লইয়া ধর্ম ও নীতির যত বিভ্রাট। ভগবান বলিতেছেন, গহনা কর্মনো গতিঃ, কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, কি কর্ম, কি অকর্ম, কি বিকর্ম তাহা নির্ণয় করিতে জ্ঞানীও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না, কর্মজীবনের লক্ষ্য সর্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এক কথায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।—ধর্ম ও জাতীয়তা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৩—শ্রীঅরবিন্দ ; পৃঃ ১০।

২। The most striking thought in Aurobinda is that of the duty of man to rise to the superhuman, divine level by co-operation with the creater and by the joint upward effort of the human race, for the elevation of all its members. We may notice here a revival of the ideals of Bodhisatta which rejects the thought of individual liberation and strives for the liberation of all beings.—The chief currents of contemporary Philosophy by D. M. Dutta ; p. 523.

৩। World existence is the ecstatic dance of Shiva which multiplies the body of God numberlessly to the view ; it leaves that white existence precisely where and what it was, ever will be, its sole absolute object is the joy of dancing.—The Life Divine, Vol. 1. by Sri Aurobinda ; p. 119.

কখনই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী ছিলেন না।[১] তিনিও শিবনৃত্যের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন,—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে ॥…
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ-পারে
শুনিয়ে দিল অভয় বাণী ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথী হল আপন সাথে,
সব হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে ॥[২]

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নেই। কারণ উভয়েরই মূলে রয়েছে একই শক্তি। ভাণ্ডারে সঞ্চিত শান্ত জল এবং ভাণ্ডার হতে বিভিন্ন প্রণালী পথে প্রকাশিত জলধারার গতির মতই এর একদিকে আত্মসমাহিত ভাব, অপর দিকে রয়েছে আত্মদান।[৩] এইভাবেই ব্রহ্ম এক, তার সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তপস্যার মধ্যে তার রূপ শান্ত সমাহিত, নিষ্ক্রিয়, পরোক্ষ; তপস্যাগত কর্ম ও সৃষ্টির মধ্যে তার রূপ গতিময়, সক্রিয়, প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ব্রহ্মের অবস্থান জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ার জন্য। জীবনের মধ্যে ব্রহ্মের আত্মোপলব্ধির জন্যই ব্রহ্মের মধ্যে জীবনের প্রতিষ্ঠা। জীবনে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যেই মানুষের পূর্ণতালাভ।[৪] রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ভাবেরই বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, যখন তিনি বলেন,—

১। Rabindra refuses to adopt a rigid position on the question of Monism and Dualism.—Rabindra Nath Tagore and the Middle Path in Philosophy by V. S. Naravane (The Centenary Book of Tagore edited by Sukomal Ghose ; p. 141).

২। বিচিত্র—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ৪১৮

৩। There are the same consciousness, the same energy, at one end in a state of self-reservation, at the other cast into a motion of self-giving and self-deploying, like the stillness of a reservoir and the coursing of the channels which flow from it.—The Life Divine, Vol. II, Part I by Sri Aurobinda ; p. 425.

৪। Brahman is in this world to represent itself in the values of life. Life exists in Brahman in order to discover Brahman in itself.… To fulfil God in life is man's manhood. —The Life Divine, Vol. 1, by Sri Aurobinda ; p. 47.

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম ॥
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।······
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।[১]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়েছে যে তিনি মায়াকে কখনও অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেননি। শ্রীঅরবিন্দও মায়াকে অবজ্ঞা করেননি। তাঁর মতে ভারতের দুর্দশার কারণ মায়াবাদের প্রচার, কারণ মায়াবাদ প্রচারের ফলে দেশের রজঃশক্তি লুপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, সংসার বিতৃষ্ণ ভক্ত ও বৈরাগীর এবং অপরদিকে অজ্ঞ অপ্রবৃত্তির উদ্ভব জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়।[২] তাঁর মতে মায়ার সম্বন্ধে শঙ্কর অপেক্ষা উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। পরমেশ্বরের শক্তিশালী ইচ্ছায় এক হতে বহুর উৎপত্তি। ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা। কারণ পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম হতেই জগতের উৎপত্তি ও লয়। কিন্তু যেহেতু আমরা দেশ কালের অতীত নই, সেইজন্য জগতকে মিথ্যা বলার অধিকারও আমাদের নেই। যখন দেশকালাতীত হয়ে ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার শক্তি উৎপন্ন হবে তখনই একথা বলার অধিকার আসবে। দেশকালের অধীন হয়ে অনধিকারী যদি জগতকে মিথ্যা, পরামায়া প্রভৃত বলে তবে অধর্ম আচরণ হবে। আমাদের পক্ষে

১। বলাকা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড ; পৃঃ ৫০৪

২। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তা প্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাধান্য প্রাপ্তি হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জ্ঞান বিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তি প্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ্ঞ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকর্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে।—মায়া, ধর্ম ও জাতীয়তা (৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৩)—শ্রীঅরবিন্দ ; পৃঃ ২৬

সেই কারণে উপনিষদের নির্দেশ অনুযায়ী বলা উচিত 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম।'[১]

মন (Mind) ও অতিমনের (Supermind) বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, এটি পার্থিব অহং বা পার্থিব ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ দরিদ্র-জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমনই এক জীবনী শক্তি যা মরসীমার বন্ধন হতে ক্রমশঃ মুক্ত এবং লোকাতীতের উপযুক্ত পার্থিব জীবন, যা আমাদের বর্তমান কাঠামোর বিধিনিষেধ ও সংযোগের অতীত হয়ে ও জড়দেহের নিয়মকে অতিক্রম করে মৃত্যুকে জয় করেছে ও পার্থিব অমরতা লাভ করেছে।[২] রবীন্দ্রনাথও এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন,—

১। মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কিরূপে উৎপন্ন হয়? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্বচনীয়, মায়া প্রসূত হয় না। মায়া চিরকাল আছে অথচ চিরকাল নাই।... শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট, ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সচ্চিদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। আত্মার পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী, সেই ইচ্ছা দ্বারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্য; জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসূত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব; ব্রহ্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই।...প্রকৃতপক্ষে সর্বং সত্যং; দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব, অনধিকারী বলিলে মিথ্যাচার ও ধর্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম বলা উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সত্যের উপর আর্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।—মায়া, ধর্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ; পৃঃ ২৮-২৯

২। And this means the evolution not only of an untrammelled consciousness, a mind and sense not shut up in the walls of the physical ego or limited to the poor basis of knowledge given by the physical organs of the sense, but a life-power liberated more and more from its moral

মরতে মরতে মরণটারে শেষ করেছে একেবারে
তারপরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।[১]

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ জন্মান্তরে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে এটি আর্য ধর্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গ। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে জন্মান্তরবাদের প্রতিপত্তি যে খর্বতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্র যেমন স্থূলজগতে সত্য, তেমনই সূক্ষ্ম জগতে সত্য পূর্বজন্মবাদ।[২] বিবর্তনের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ পুনর্জন্ম। যাত্রাপথের যেমন লক্ষ্যস্থল আবশ্যক, জন্মের জন্য তেমনিই পুনর্জন্ম অত্যাবশ্যক। কারণ অসম্পূর্ণ জীবন পুনর্জন্মের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি লাভ করে।[৩]

limitations, a physical life fit for a divine inhabitant and in the sense not of attachment of restriction to our present corporal frame and exceeding of the law of the physical body, the conquest of death an earthly immortality.—The Life Divine, Vol 1. by Sri Aurobinda ; p. 399

১। পূজা—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭০

২। যে পূর্বজন্মবাদ চিরকাল আর্যধর্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গবিশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্ত শিক্ষা প্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলজগতে যেমন Heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্মজগতে তেমনিই পূর্বজন্মবাদ প্রধান সত্য।—নবজন্ম, ধর্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ ; পৃঃ ৬৩-৬৪

৩। Re-birth is self-evidently a necessary part, the sole possible machinery of such an evolution. It is as necessary as birth itself ; for without it birth would be an initial step without a sequel, the starting of a journey without its future steps and arrival. It is re-birth that gives to the birth of an incomplete being in a body its promise of completeness and its spiritual significance.—The Life Divine Vol. II Part II, by Sri Aurobinda ; p. 718.

শান্তির অনন্ত সমুদ্রে অন্তহীন যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ও মহাশক্তির সান্নিধ্যের প্রত্যাশা ও উপলব্ধি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ তিনজনের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে Peace লেখেন শেলীর Skylark-এর ছন্দে, যার বঙ্গানুবাদ,—

মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,
স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝার মাঝে,
মহাশূন্য—যা হতে সৃজন
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়া।
এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে
এসে শান্তি লক্ষ্য জীবনের
—একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।[১]

তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে পরিতৃপ্ত হয়নি সে কথা বোঝা যায় ২৪ শে জানুয়ারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে,—"যে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি তা আসবে বলে ত মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন।"[২] ১৮ই এপ্রিল জো'কে লেখা চিঠিতে সেই বৎসরই পরে আবার লিখেছেন,—"হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার-মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যায় শান্তিভঙ্গ করছে না।...যাই! মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।"[৩] এই অন্তহীন শান্তিসমুদ্রে মহাযাত্রার আকাংক্ষা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,—

সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসও তরণী হে কর্ণধার।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ১৩৬৯); পৃঃ ৪৩১
২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড; পৃঃ ৭৬
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড; পৃঃ ১৩২-৩৩

তুমি হবে চিরসাথি লও লও হে ক্রোড়পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতির ধ্রুবতারকা ॥
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহাঅজানার[১]।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তিন মাস আগে রচিত, কিন্তু ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের "The Infinite Adventure" সনেটটিতে শান্তি পারাবারে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ও কর্ণধারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়,—"On the water of a nameless Infinite my skiff is launched" এবং "An unseen hand controls my rudder" পংক্তি দুইটিতে। রবীন্দ্রনাথ যে অন্তরে 'মহাঅজানার' নির্ভয় পরিচয় পাওয়ার কথা বলেছেন সেই একই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দের মধ্যেও

"I shall be merged in the Lonely and Unique,
And wake into a sudden blaze of God."

এইভাবে অনন্তযাত্রার ক্ষেত্রে একই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিবেন্দের মধ্যে।[২] তিনজনের প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক। বিবেকানন্দের 'মা', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তিদাতা' এবং শ্রীঅরবিন্দের 'God'-এর মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মনায়কদের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের তুলনায় এই সত্যই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যে অন্যান্যদের মত তিনি কোন এক বিশেষ সীমাবদ্ধ মত বা পথকে গ্রহণ করেননি। তাঁর ধর্মদর্শন তাঁর অন্তরের উপলব্ধিতে। যেখানে অপরের মতবাদের মধ্যে তিনি কোন সত্যকে উপলব্ধি করেছেন সেটি গ্রহণ করেছেন। যেখানে তাঁদের মতবাদের মধ্যে এই সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সেখানে বিরোধ জেগেছে। এই অন্তরের উপলব্ধিই রবীন্দ্রদর্শনের মূলভিত্তি।

১। আনুষ্ঠানিক সংগীত—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ৬৬৭

২। বিবেকানন্দের কাব্য ও জীবন—সুনীলচন্দ্র সরকার (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭১ ; পৃঃ ২০৪—১৫) দ্রষ্টব্য।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ উত্তরকালে মানবচিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ॥

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি কোন দল সৃষ্টি করেন নি বা বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের মত বিধিনিষেধ ও নিয়মের বন্ধনে বাঁধতে চাননি। কিন্তু তাঁর এই উন্মুক্ত উদার বাণী দ্বারা বহু লোক, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তাঁর পথ অনুসরণ করে চলেছে। মনের যে কোন ভাবের, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের ব্যঞ্জনা, কর্ম জীবনে উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারই মধ্যে মন প্রশ্নের সমাধান ও নিজের পরিণতিলাভ করে মুক্তি পায়। কেবল ধর্মক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে চলা কল্পনাতীত ব্যাপার।[১] রবীন্দ্রনাথের বাণী নিরাশার বাণী নয়, সঙ্কীর্ণ মতবাদের বাণী নয়। তাঁর বাণী আশার বাণী, নির্ভীকতার বাণী। এমন বাণী পূর্বে আর শোনা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেছিলেন, যেভাবে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছিলেন আমরাও সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জগৎকে অনুভব করছি।

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।[২]

১। এই প্রসঙ্গে আমার জানা একটি ঘটনার কথা বলা যায়। একজন রাজনৈতিক কর্মী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন প্রথমবার কারারুদ্ধ হন, তখন তাঁর মন হতাশায় ভেঙে পড়ে। এই সময়ে তিনি কারাপ্রাচীরে পূর্ববর্তী কোন রাজনৈতিক বন্দীর লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়টি ছত্র দেখতে পান,—

"তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না॥......
বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারেবারে ঠেলতে হবে,
হয়ত দুয়ার টলবে না॥

এই ছত্র কয়টি তাঁর মনের সমস্ত বিষাদ, ক্লান্তি ও হতাশা দূর করে তাঁকে নবীন রসে সঞ্জীবিত করে তোলে।

২। প্রকৃতি—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড; পৃঃ ৩১৬

এই বাণীর দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা জগৎকে দেখছি, দেখতে শিখছি।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। তাঁর বাণী নানাজনে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে অনেক সময়। যার উদাহরণ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল...' ইত্যাদি গান। রাজনীতির সঙ্গে দেশপ্রেমের এক অলক্ষিত সম্বন্ধ রয়েছে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে আমাদের দেশে এখন সর্ব প্রথমে এবং সর্ব প্রধান ভাবে স্থান গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রনাথের গান। এই কারণেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়েছে।

হিন্দু ধর্ম যে অজস্র প্রকারের সংস্কারের বন্ধনে শ্লথ ও গতিহীন হয়ে পড়েছিল সেই সংস্কার হতে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের দান সবচেয়ে বেশী। এই ভাবেই সংস্কারমুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের প্রতিদিনের প্রতিনিয়ত কার্যে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে।

আজ শিক্ষিত তথা intellectual জনসমাজে সংসার ধর্মের মহত্ত্ব এবং তথাকথিত সন্ন্যাস ধর্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে চৈতন্য জেগেছে তা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ফলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রচিন্তার অনুযায়ী সমাজের হয়েছে সংস্কারমুক্তি। বর্তমানকালে জাতিভেদের ব্যবধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোপ পেয়েছে। অসবর্ণ বিবাহ আজ বহু প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর সমাজের সংস্কারমুক্তি আর বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। যদি সমাজ সংস্কারমুক্তির পথে এগিয়েও চলে তবুও তার গতি এত শ্লথ যে সহজে চোখে পড়ে না।

জীবনের প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনও তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই মুখ্যতঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। উত্তরকালের বাঙ্গালা সাহিত্য রবীন্দ্র দর্শনকেই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে অনুসরণ করে চলেছে। যদিও অনেক সময়ে তাঁকে অস্বীকার করার একটা ব্যাকুল আগ্রহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের সাহিত্যিক এবং কবির সংখ্যা বড় কম নয়। প্রত্যেকের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে

আলোচনা করাও সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে কয়েকজন মুখ্য সাহিত্যিক এবং কবির রচনা আলোচনা করলেই এ তত্ত্ব বুঝতে বাকী থাকে না যে উত্তরকালের সাহিত্য রবীন্দ্র দর্শন দ্বারা কতখানি প্রভাবিত।

আধুনিক সাহিত্যিকদের ধর্মচিন্তার মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার প্রভাব। বস্তুতঃ আধুনিক সাহিত্য ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্র চিন্তার অংশ যে লেখক যত বেশী নিয়েছেন তিনি নিজের সৃষ্টিকে তত ধন্য করছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী'র সৌদামিনীর নাস্তিক মামার চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামহাশয় থেকে নেওয়া। সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যামের সঙ্গে 'বোষ্টমী' গল্পের বোষ্টমীর স্বামী তুলনীয়। 'দত্তা' উপন্যাসে সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে বিজয়ার সঙ্গে নরেনের বিবাহের মধ্যে 'গোরা'র সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই বিবাহ গোরা ও সুচরিতা এবং বিনয় ও ললিতার মিলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য দয়াল 'গোরা'র পরেশবাবুর আদর্শে রচিত।[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' গল্পটির মধ্য দিয়া বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক অভিনব, উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে তারই মধ্যে সংগুপ্ত হয়ে রয়েছে 'রাইকমলে'র বীজ।[২] শ্রদ্ধেয় বিমানবিহারী মজুমদারের মতে "রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা বুঝাইবার জন্য মহাজনী পদের রত্নরাজি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত রীতি এখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীয়াইয়া রাখিয়াছেন।"[৩] শুধু তাই নয়, তারাশঙ্কর নানা ভাবেই রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করেছেন। 'বলাকা', 'অচলায়তন' প্রভৃতিতে যে নবীন ও প্রবীনের সংঘর্ষ, নবীনের জয়যাত্রা এবং প্রাচীন সংস্কারের মুক্তি দেখানো

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৯৭ দ্রষ্টব্য।

২। রাইকমল [১৯৩৫] বড় গল্প এবং ভালো গল্প, ভিখারী বৈষ্ণবদের জীবন কথা। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী'তে এ গল্পের ইঙ্গিত এবং শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-এ ও শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে এ জীবনের মোহন চিত্র। তবে তারাশঙ্করের চিত্র বাস্তবতর।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৫র্থ খণ্ড, ১৯৬০]—সুকুমার সেন ; পৃঃ ৩৪২

৩। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান (১৩৬৮)—বিমান বিহারী মজুমদার ; পৃঃ ৬৬

হয়েছে, তারাশঙ্করের বহু রচনার মধ্য দিয়েই তার রূপান্তরিত প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' বনোয়ারী ও করালীর সংঘাত তারই একটি বিশিষ্ট উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায়। একথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে অসামাজিক জন্ম ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মানুষকেই বড় করে দেখিয়েছেন।[১] 'নামঞ্জুর' গল্পে অমিয়ার জন্ম অসামাজিক সম্বন্ধের ফলে। তার মা ছিলেন পিসীমার দাসী। 'সপ্তপদী'তে রিণা ব্রাউনকে অমিয়ারই প্রতিলিপি বলা যায়। তারও জন্ম অসামাজিক বন্ধনে। তার মা ব্রাউন সাহেবের আয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তারাশঙ্করও দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণত্ব জন্মের মধ্য দিয়ে নয়, কর্মের মধ্য দিয়ে লাভ হয়। 'ট্যারা' গল্পে মহান্ত পদ অভিলাষী ভোলা জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও বাউরী ট্যারা কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েছে, হয়েছে প্রকৃত সন্ন্যাসী।[২]

'রাজর্ষি' প্রসঙ্গে আলোচনা কালে একথা বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মতে শিশুর মধ্যেই ঈশ্বরের রূপের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।[৩] বস্তুত বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক বাৎসল্যরসের অবতারণা করেন। পরবর্তীকালে সেই বাৎসল্যরসের অপূর্ব চিত্র দেখতে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে। 'পথের পাঁচালী'র প্রধান আকর্ষণ দুর্গা ও অপুর শৈশবকাহিনী। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর উপলব্ধি করেছিলেন।[৪] বিভূতিভূষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করেছিলেন কি না একথা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' তাঁর বাল্য স্মৃতিকাহিনী[৫] এবং স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে বিভূতিভূষণের ভাষা ও ভাবগত এক অপূর্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'মানুষের ধর্মে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —"দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার

১। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।
২। ট্যারা—জলসাঘর—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।
৪। সপ্তম পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ) দ্রষ্টব্য।
৫। পথের পাঁচালী [১৯২৯] লেখকের বাল্যস্মৃতিমূলক উপন্যাস চিত্র।
—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন ; পৃঃ ৩২৫

মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে।"[১] প্রায় একই ভাব দেখতে পাওয়া যায় 'পথের পাঁচালী'তে অপুর সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ যখন বলেন,—"গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমোটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনাডাঙ্গার মাঠের উপরকার আকাশে কতবর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপরী কাটা বাঁশবনের তলা, অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ রাখিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।"[২]

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিদ্রোহ সেই জাতিভেদ সম্বন্ধে বেদনা বিভূতিভূষণের রচনাতেও নানাস্থানে নানা ভাবে দেখা দিয়েছে। এইকারণেই বনভোজনের সময় বিনি অপুর গ্লাস দেখিয়ে বলে,—"আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জলতেষ্টা পেয়েছে।"[৩] কারণ সে জাতিতে যুগীর বামুন বলে পাড়ায় জল খেতে চাইলে তাকে ঘটিতে করে জল দিত এবং সে ঘটিও আবার মেজে দিতে হত। তেমনই দেখা যায় স্বর্ণ গোয়ালিনী ঘটি তুলে নেওয়ায় শূদ্রের এঁটো ছোয়ায় জাত যাওয়ার আশঙ্কায় সখী ঠাকরুণ শঙ্কিত

১। মানুষের ধর্ম [১৩৬০]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃঃ ৮৬-৮৭

২। পথের পাঁচালী [৮ম সংস্করণ, ১৩৬৩]—বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ২৫৯

৩। পথের পাঁচালী [৮ম সংস্করণ, ১৩৬৩]—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৮৭

হয়ে উঠেছেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদও সম্ভবতঃ তাকে এত বেশী হতাশ করত না। [১]

'বনফুল' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর রচনা গতানুগতিক নয়। আপন বৈশিষ্ট্যে তাঁর রচনাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[২] এই কারণে দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছেন,—"যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয় তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সমাজের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সকলপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।"[৩] বনফুলও সেই একই মতবাদের ধারক। সেই কারণে 'জঙ্গমে' শঙ্করের চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁরই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে,—"ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নয়?"[৪] শুধু তাই নয়। হরিহরের সঙ্গে বিবাহের পর কুন্তলার মনে যখন স্মৃতির রোমন্থন চলে তখন সে এই কথাই মনে করে যে, যেহেতু সে ব্রাহ্মণ কন্যা, সুতরাং বিবাহ করতে হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই সে বিবাহ করতে পারে। এই

১। স্বর শুনিয়া গোকুলের বউ-এর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাকরুণকে সে যমের মত ভয় করে। মায়া দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাকরুণের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা নিঃসংশয় বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড় করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—"দ্যাখোতো চক্ষু দিয়ে, দেখতে পাচ্ছো? একেবারেই স্পষ্ট জলের দাগ দেখলে তো? এখান থেকে সম্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শুদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আমার হেঁসেলে গিয়ে সাত রাজ্যি জজানো হয়েছে! যাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল!"

সখী ঠাকরুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুসাংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশী হতাশ হইতে পারিতেন না।—পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃঃ ১৫৪

২। সপ্তম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ।] দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রাহ্মণ—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড; পৃঃ ১০৩৬

৪। জঙ্গম [চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়] বনফুল; পৃঃ ২১৪

কারণেই সুধাংশুকে সে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ সুধাংশু ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকে বরণ করতে পারেনি, ভারতীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকে প্রাধান্য দিতে পারেনি। সে স্বপ্ন দেখেছে বিলাতীডিগ্রী অর্জন করে বড় চাকুরী লাভ করার।[১] সুতরাং ব্রাহ্মণত্বের অধিকার থেকে সে হয়েছে পতিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও বনফুলের মতবাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ মায়াবাদকে উপেক্ষা করেছেন, মায়াকে অস্বীকার করেন নি।[২] সংসারকে তিনি সন্ন্যাসের উপরে স্থান দিয়েছেন। সংসারকে মায়া বলে গ্রহণ করার অর্থ কর্মজগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে জড়ত্বকে সম্মান দেওয়া। বনফুলের রচনাতেও মায়াকে বর্জন করা সম্বন্ধে বিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য শঙ্করের চিন্তাধারায় দেখা যায়, "আমি ছটফট করিতেছি কেন? আমি কে? কি ক্ষমতা আছে আমার?" পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল, সংসারটা যে মায়ামরীচিকা ইহাই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দুসভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্যসত্যই যে ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দু সমাজের শিরোমণি, কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সকলের সে অধিকারও নাই।[৩]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানবসেবার আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে, 'বনফুল' সেই আদর্শকেও মেনে নিয়েছেন। উৎপলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্করের যে পল্লীসেবা তার মধ্যে শঙ্করের ভাবাদর্শের মোহ অনেকখানি কাজ করলেও মানবসেবার আদর্শকেই লেখক প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

১। সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত যদি সে বিলাতি ডিগ্রী অর্জন করিয়া বড় চাকুরী করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত, তাহা হইলে কুন্তলা হয়ত তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণকন্যা সে, পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় তবে সত্যকার ব্রাহ্মণকে সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থগৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের মুখোস পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে-জঙ্গম-প্রথম চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় [বনফুল] পৃঃ ২৩৩-৩৪

২। সপ্তম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ] দ্রষ্টব্য

৩। জঙ্গম [চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়]—বনফুল; পৃঃ ২১৪

একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ যখন সন্তানজননীর সম্বন্ধে পর্যবসিত হয় তখন নারীজীবন সার্থকতা লাভ করে দেবীত্বে উপনীত হয় এই মতবাদে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন; যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় 'গান্ধারীর আবেদনে' দ্রৌপদীকে গান্ধারীর আশীর্বাদবাণীর মধ্য দিয়ে। [১]

'তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।[২]

বনফুলের 'মৃগয়া'তেও এই 'জননী-গেহিনী'র সন্ধান পাওয়া যায়। মেজ জা হিরন্ময়ী বাড়ীর সকলেরই মা।

'এ বাড়ীর সকলেরই তিনি মা।
নিজের স্বামীর প্রতিও তাঁর স্নেহ
তা অপত্যস্নেহ।
বাড়ীর ঝি চাকর থেকে সুরু করে
বড়বাবু পর্যন্ত
সকলেই তাঁর দাক্ষিণ্যভোগী।......
বাড়ীর যত ছোট ছেলেমেয়ের আশ্রয়
মেজ মা।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাঁর প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বনফুল' স্পষ্টকণ্ঠে বলেছেন—রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রণাম করি

তখন প্রণাম করি
ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শকে
যা
রূপে রসে রঙে

১। অষ্টম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মনায়কদের মতবাদের তুলনা] দ্রষ্টব্য।

২। গান্ধারীর আবেদন-কাহিনী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩

১। মৃগয়া—বনফুল [প্রথম প্রকাশ 'শনিবারের চিঠি,' কার্তিক, ১৩৪৬; পৃঃ ৩৬]

শ্রদ্ধায়, গৌরবে
মণ্ডিত করেছে সেই মনুষ্যত্বকে
যা ঐশ্বর্যলোলুপ ভিক্ষুক নয়।
দারিদ্র্যের পঙ্কিলস্পর্শ যাকে মলিন করে না
যা নির্ভীক
যা ঊর্ধ্বমুখী
যা ভূমাবিলাসী
যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।[১]

এইভাবে দেখা যায় উত্তর-বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতি সাহিত্যিকের রচনার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেছেন ভিন্ন ভিন্নরূপে। যেমন জাতিভেদ এবং সর্বমানবের দেবতার সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তারই প্রকাশ তীব্র বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে,—"জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের বাতাস হাড়ে গিয়া বাজে কনকন।......ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"[২]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধগাথা ও জাতক এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নানা আখ্যানকাব্য রচনা করেন। সুবোধ ঘোষ তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। 'ভারত প্রেমকথা' এর নিদর্শন। পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অধিকাংশ বৌদ্ধ কাহিনী এবং সুবোধ ঘোষের রচনায় অধিকাংশ পৌরাণিক কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ শ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। সুবোধ ঘোষের 'ভদ্রা কুন্তলবেশা'র।[৩] 'প্রথমাংশ'শ্যামা'র ও শেষাংশ 'চণ্ডালিকা'র গদ্য প্রতিলিপি বলে

১। প্রণাম ও প্রশ্ন—বনফুল [প্রথম প্রকাশ 'দেশ', ৫ই জুন, ১৯৬৫। পৃঃ ৫০৮]

২। পদ্মানদীর মাঝি [১১শ মুদ্রণ, ১৩৬৮]—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃঃ ১১

৩। ভদ্রাকুন্তলবেশা—দিগঙ্গনা—সুবোধ ঘোষ দ্রষ্টব্য।

মনে হয়। তেমনই 'ফাল্গুনী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের 'রক্তসন্ধ্যা', 'জাতিস্মর' ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া জন্মান্তরবাদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এসে পড়েছে। তাঁর প্রথম দুইটি বলিষ্ঠ কাব্য 'প্রলয়োল্লাস' ও 'বিদ্রোহী'র প্রত্যক্ষ প্রেরণা এসেছিল রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র 'দুরন্ত আশা' ও 'পূরবী'র 'বিজয়ী' থেকে।'[১] 'অগ্নিবীণা' নামটিও রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নেওয়া,—

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে,
আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।[২]

রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কোন ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত নন এই কারণে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ারে' তিনি বলেছেন,—

"হিন্দু না ওরা মুশলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারী ! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।[৩]

তাঁর প্রেমের কাব্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মতই জন্মান্তরের স্বীকৃতি,—

আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে অপরূপা, ডাক তুমি, চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো সে-ই তুমি ধরা দেবে তায়।[৪]

কবি মোহিতলাল মজুমদার বাঙ্গলা সাহিত্যে আপন প্রতিভায় স্থান করে নিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একথা নিঃসংশয় বলা যায় যে তিনি ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সকল দিক দিয়েই অলক্ষিতে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসারী। ভাবের প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁর 'বিস্মরণী' কাব্য-

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থখণ্ড]—সুকুমার সেন ; পৃঃ ২৮২ দ্রষ্টব্য
২। নজরুল গীতিকা—নজরুল ইসলাম [৯ম মুদ্রণ, ১৩৭১] ; পৃঃ ১৭
৩। অনামিকা—কাজী নজরুল ইসলাম [প্রথম প্রকাশ কালি-কলম, আশ্বিন, ১৩৩৩]

গ্রন্থের শিল্প-সৌন্দর্য-সাধনার প্রেরণা 'মানসলক্ষ্মী' রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ধারাবাহি। প্রকাশভঙ্গীর প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তাঁর প্রথমযুগের 'কাব্য' বিস্মরণী' হতে আরম্ভ করে শেষ যুগের রচনাসমূহেও রবীন্দ্রানুসরণ প্রত্যক্ষ।[১] ভাষার দিক দিয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তাঁর 'দীপশিখা'য় তিনি যখন বলেন,—

'তপন যখন অস্তমগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখিগো, পথিক-বধূর বেশে।'

তখন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন অন্ধকার'-এর [২] বেশ সুস্পষ্ট। তেমনই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণে যখন বলেন,—

'বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ?'[৩]

তখন তারই ধারা বহন করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণ উপলক্ষ্যে মোহিতলাল 'স্মরগরল'-এ 'সত্যেন্দ্রনাথে' বলেন,-

'বাহিরে বিদ্যুতঘটা নবমেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী মধু শীতল সুরভি;
হৃদয়ে গুঞ্জরে গীত—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হা হা স্বর
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জন ভবন-বলভি!'—

কবির শেষ জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পূর্ণভাবে তাঁকে অধিকার করেছিল। বিদ্রোহী কবি নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করলেন। কবির জীবন চিন্তায় রবীন্দ্র-দর্শন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। গতি এবং স্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;—

'যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি

১। মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা (প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৬২)—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ; পৃঃ ৬০ ও ৬২ দ্রষ্টব্য।
২। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; ২৫৩
৩। পূরবী—রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৬২১

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে।' [১]

মোহিতলালও সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যেন উত্তর দিলেন 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'যাত্রাশেষে,'—

'আজ আমি থেমে গেছি জগৎ থেমেছে মোর সাথে,
নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্তন ;
থামিয়াছে কালচক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বুঝি—কার নাম গতি, অগতি কেমন !'

এইভাবে দমিত হয়েছে বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহ। 'মোহিতলালের কাব্য সচেতন রবীন্দ্র-বিদ্রোহ পরিণতি লাভ করেছে রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের উদার ব্যাপ্তিতে।' [২] এই কারণেই আধুনিক কালের বিশিষ্ট কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—"রবীন্দ্রনাথের জীবন কালেই তাঁর অমোঘ প্রভাব,—এড়িয়ে গিয়ে নয়, আত্মসাৎ করে বাংলা কাব্যে প্রথম স্বতন্ত্র নতুন স্বাদ যদি কেউ এনে থাকেন, তাহলে তিনি কবি মোহিতলাল।" [৩]

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। কার্যতঃ তাঁরা করেছেন অনুসরণ। জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আদ্যন্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যেমন 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র 'হৃদয়ের প্রতিনিধি'র 'পারিনে শুনিতে আর একই গান। এক্-ই গান।' এবং 'তারকার আত্মহত্যার' 'শত শত মৃত তারকার মৃতদেহ রয়েছে শয়ান'—এর সঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ'-এর 'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' এবং 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর 'যে নক্ষত্র মরে যায় তাহার

১। চঞ্চলা—বলাকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৪৮২
২। মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ; পৃঃ ১০২
৩। মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ; পৃঃ ১১১

বুকের শীত'-এর তুলনা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।[১] রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে সে দুঃখবাদ নৈরাশ্যবাদ নয়, সে দুঃখবাদ ধর্মসাধনার সোপান স্বরূপ, একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।[২] জীবনানন্দও দুঃখবাদকেই গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন অতি নিবিড়ভাবে। তবে তাঁর দুঃখবাদ পরবর্তী সোপান পর্যন্ত তত সুস্পষ্টরূপে অগ্রসর হতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে,—"জীবনানন্দের কবি কল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা, জীবনের অচরিতার্থতার ব্যর্থতার ক্লান্তির অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ।"[৩] রবীন্দ্রনাথের মত জীবনানন্দও প্রকৃতিকে অনুভব করেছিলেন অন্তর দিয়ে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের পর জীবনানন্দের কাব্যধারার মধ্যেই পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।[৪] সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'র 'স্বপ্নে'র সঙ্গে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' তুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপটে উপনিষদের প্রভাব সুদূর বিস্তৃত।[৫] তিনি উপনিষদের বাণীকে গ্রহণ করেন অন্তরের সঙ্গে একাত্ম করে। বিষ্ণু দে-ও উপনিষদকে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি উপনিষদের বাণীকে নয়, উপনিষদের উদ্ধৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন নানাস্থলে, যেমন,—

> 'ক্রেসিডা! তোমায় থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
> তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুক্রতমের শেষ।
> মন্তপ্রলয় তোমাতেই করি জয়।[৬]

ক্রতুক্রতম শব্দ ব্রাহ্মণ উপনিষদের "ওঁ ক্রতো স্মর কৃতম স্মর" মন্ত্র হতে গ্রহণ করা। তেমনই,—বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৭০ দ্রষ্টব্য।

২। সপ্তম পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির নিজস্ব দর্শনের স্বরূপ] দ্রষ্টব্য।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৬৫

৪। গোবিন্দচন্দ্র দাসের পর জীবনানন্দই একমাত্র কবি যাঁহার রচনায় পূর্ববঙ্গের আবেষ্টনের রূপ রস ধরিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড] —সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৬৮

৫। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ [রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের পশ্চাৎপট] দ্রষ্টব্য।

৬। ক্রেসিডা—চোরাবালি [১৩৬৭]—বিষ্ণু দে; পৃঃ ৮২ ও ৮৬

জড়তাবদ্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার করি নর্মাচারে
প্রাক্তন—পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।[১]

উপনিষদে ব্রহ্মের নেতিবাচক বর্ণনায় 'অপাপবিদ্ধ' এবং 'অস্নাবির' শব্দ দুইটি রয়েছে।[২] মনে হয় কচিৎ উপনিষৎ থেকে ও মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়েই এভাব রচনায় এসেছে। এ ছাড়া বিষ্ণু দে তাঁর রচনার বহুস্থলেই রবীন্দ্র নাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন হয়ত নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। যেমন,—

'বেকার বিহঙ্গে'—'ইতিহ-ভাগ্য জড়াক না নাগ পাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
করো না অন্ধ বন্ধ জটায়ু পাখা।'[৩]

'শিখণ্ডীর গানে'— 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ।'[৪]

অথবা 'টপ্পা ঠুংরি'তে—'তোমার পোষ্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।
সূর্যদেব, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে
চলে যাক।'[৫] এবং
'পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিটই মোটে।
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে হাওড়ায়।'[৬]

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৭২ দ্রষ্টব্য।

২। বেকার বিহঙ্গ—চোরাবালি—বিষ্ণু দে; পৃঃ ৫৬

৩। শিখণ্ডীর গান—চোরাবালি—বিষ্ণু দে; পৃঃ ৭০

৪। টপ্পা ঠুংরি—চোরাবালি—বিষ্ণু দে; পৃঃ ৭৮ ও ৮০

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৮০ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রেমেন্দ্রবাবু জীবনবিধাতাকে দুঃখমূর্তি খেলার-বুড়িরূপে কল্পনা করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহাকে দুঃখখেলার খেলুড়িরূপে সঙ্গে লইয়াছেন। তবে এখানে অবশ্যই আতিশয্য আছে এবং তাহা প্রবল।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড] —সুকুমার সেন; পৃঃ ২৯৬

'টপ্পা ও ঠুংরি' কবি সমর সেনকে লেখা। সমর সেন-ও রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি নানাস্থানে উপাদানের মত ব্যবহার করেছেন।[১] এর একটি ভালো উদাহরণ 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' অবলম্বনে 'মৃত্যু'র চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্র:—

ধূসর পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ী,
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন।
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়
সূর্য অস্ত গেল, সূর্য দেব কোন দেশে—
এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের সবচেয়ে প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে জীবন বিধাতাকে তিনি নিঃসম্পর্কীয় মনে করেন নি। জীবনবিধাতার দুঃখমূর্তিও তিনি স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ তাকে দুঃখমূর্তি 'খেলার বুড়ি' রূপে কল্পনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করে তাকে স্বীকার করেছেন 'দুঃখখেলার খেলুড়িরূপে'। অবশ্য তার মধ্যে আতিশয্য আছে।[২]

নিখিল ভুবন ভরি খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা।
অনাদি অতীত কাল ধরি।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।......
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।
যত কান্না ধরণীতে;

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) সুকুমার সেন; পৃঃ ৩৮০ দ্রষ্টব্য

২। প্রেমেন্দ্রবাবু জীবনবিধাতাকে দুঃখমূর্তি খেলায় বুড়িরূপে কল্পনা করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের মত তাহাকে দুঃখখেলার খেলুড়িরূপে সঙ্গে লইয়াছেন। তবে এখানে অবশ্যই আতিশয্য আছে এবং তাহা প্রবল।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—সুকুমার সেন; পৃঃ ২৯৬

তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনাকে মানি।১

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান'২ এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব বসুর উপর রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায় তাঁর রচিত বই ও রচনাগুলির নামকরণে।৩ যেমন রডোড্রেনড্রনগুচ্ছ, হে বিজয়ী বীর, ধূসর গোধূলি, যেদিন ফুটলো কমল, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, তিথি ডোর, একদা তুমি প্রিয়ে, অন্য কোনখানে, আমি চঞ্চল হে, ঘরেতে ভ্রমর এল, মন দেয়া নেয়া, সব পেয়েছির দেশে, কালের পুতুল, 'মর্মবাণী'তে শঙ্খ, অরূপ, জীবনদেবতা, যাত্রী ইত্যাদি। 'কঙ্কাবতী' এবং সাগর দোলায় নায়িকার সুরঙ্গমা নামকরণে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের ইঙ্গিত দেখা যায়।

'ফাল্গুনী'তে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনের মত মানব জীবনেও ঋতুপরিবর্তন চলেছে। শীতের পর বসন্ত এবং বসন্তের পর শীত, এই ভাবে ঋতুপরিবর্তনের মত জীবনযৌবন এবং জরামৃত্যুর আবর্তন চলেছে।৪ এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর সম্বন্ধে মতবাদ জানতে পারা যায়। মরণের ধূসরতা জীবনের শ্যামলতারই অগ্রদূত। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গে' এর রূপায়ন দেখতে পাওয়া যায়,—

চঞ্চল মুহূর্তে যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে॥
জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

১। প্রথম প্রকাশ, 'ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে' নামে [বিজলী, ১ফাল্গুন, ১৩৩১]।

২। অপমানিত, সঞ্চয়িতা [ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৫]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃঃ ৫০৯

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড]—সুকুমার সেন ; পৃঃ ৩৩৬

৪। সপ্তম পরিচ্ছেদ ও অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন—নাশন
বারে বারে দেখা দিবে।[১]

বুদ্ধদেব বসুও জীবন ও মৃত্যুর এই লীলাচক্রকে স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে 'রূপান্তর' [১৯৪৪], 'দ্রৌপদীর শাড়ি' [১৯৪৮] এবং শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'-এ এই জীবন ও মৃত্যুর আবর্তন গভীরতা ও স্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি এই আবর্তনকে রূপান্তর বলেই মনে করেছেন।[২]

দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সঙ্গম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।[৩]

মৃত্যু মানে লুপ্তি নয়। মৃত্যুর অর্থ নবজন্মের আগমনের সূত্রপাত, রূপান্তর গ্রহণ। 'যে মৃত্যুকে ভেদ করে লুপ্তবীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে মৃত্যুকে জীর্ণ করে বরফের কবর কেটে ফুল
জ্বলে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়
সেই মৃত্যুর নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ মায়াকে স্বীকার করেছেন, মায়াবাদকে করেছেন অস্বীকার। মায়াময় পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য রসকে তিনি গ্রহণ করে রমণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুও এই মাধুর্যরসকে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে একান্ত করে নিতে চেয়েছেন। সেইজন্যই 'বন্দীর বন্দনায়' দেখা যায়,—

বিশ্বের মাধুর্য রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি।[৫]

রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও দুঃখের মধ্যে সুন্দরের আবির্ভাব লক্ষ্য করেছেন। সেইজন্য দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। দুঃখকে আহ্বান জানিয়েছেন সুন্দরের আগমনের জন্য,—

১। তপোভঙ্গ—পূরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড ; পৃঃ ৬৩০-৩১
২। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৬) —দীপ্তি ত্রিপাঠী ; পৃঃ ১১৬—১৭ দ্রষ্টব্য।
৩। রূপান্তর—রূপান্তর—বুদ্ধদেব বসু।
৪। শীতরাত্রির প্রার্থনা—শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর—বুদ্ধদেব বসু।
৫। বন্দীর বন্দনা—বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব বসু।

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর শুভ্র অগ্নিশিখা ;
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।[১]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' রচনার কাল হতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অবিশ্বাসের মনোভাব প্রকাশ করেছেন।[২] সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের অসম্পূর্ণতাও প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ। 'প্রশ্নে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ।।
আমি যে দেখেছি, কুটিল হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।[৩]

সুধীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কথাই বলেছেন। তবে তাঁর বক্রোক্তি কিছু বেশী কঠোর।

হায় ভগবান,
হায় হায়, ব্যর্থ ভগবান।
তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে ?
কিন্তু যারা প্রহরে প্রহরে
উৎসর্গিছে অকাতরে অতিমূল্য প্রাণ
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব,
তারা অবজ্ঞার পাত্র ?[৪]

১। রূপান্তর—রূপান্তর—বুদ্ধদেব বসু।
২। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী ; পৃঃ ২৪৬ দ্রষ্টব্য।
৩। প্রশ্ন—সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃঃ ৬৩৭
৪। প্রশ্ন—ক্রন্দসী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথের আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা মহাকাব্যের আদর্শ অনুসরণ করে 'মেঘনাদবধকাব্য', 'বৃত্রসংহার কাব্য' ইত্যাদি রচনা করেন, বিহারীলাল প্রমুখ কবিরা এর ব্যতিক্রম করে যে সব গীতিকাব্য রচনা করেন সেগুলির মধ্যে কেবল কবির ভাবরাজ্যে বিচরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম জনসমাজ ও গণদেবতার কথা বলেন। আধুনিক কবিরা নিজেদের বাস্তববাদী বলে পরিচয় দেন। তাঁদের লেখনী যে জনসমাজের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনায় মুখর সেটি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ব্যতীত কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে মন অর্পণ করলেও কর্ম ত্যাগে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে,—"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি, তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না।"১ এই কারণেই তিনি বলেছেন,

> কবি তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ,
> তবে তাই লহ সাথে তবে তাই কর আজি দান।২

তাঁর এই আহ্বানের পরবর্তী ঘোষণা বলে মনে হয়,—

> অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
> মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই।৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'-কে অনুসরণ করেই আধুনিক কবিরা রূঢ় পৃথিবীর হাসিকান্না, দুঃখ দুর্দশার বন্ধনের মধ্যে নিজেদের গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন এবং তাঁদের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন কঠোর ভাবে, উগ্রভাবে এবং সম্ভবতঃ দিশাহারা হয়ে। মহাপুরুষ যে ধর্মজীবনের ও মানব-কল্যাণ সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা দিয়ে যান সাধারণ মানুষ সব সময়ে তা গ্রহণ করতে পারে না। এর অপপ্রচার বা ভুল বোঝার ফলে অনেক গ্লানির সৃষ্টি হয়। এই

১। শিক্ষার মিলন—শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড; পৃ: ৬১৩
২। এবার ফিরাও মোরে – চিত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড; পৃ: ৪১৪
৩। প্রস্তুত—ছাড়পত্র [৩য় সংস্করণ, ১৩৬৯]—সুকান্ত ভট্টাচার্য; পৃ: ২,

ভাবে বহু আধুনিক কবি বাঙ্গলা কাব্যে যে মলিনতার সৃষ্টি করেছেন সেটা রবীন্দ্রনাথের ধর্মনীতির অপব্যাখ্যার ফল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সর্বমানবের ভগবানের কথা, যে ভগবান প্রাত্যহিক পূজাপদ্ধতি ও দেবালয়ের মূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যে ভগবান বাস করেন দিনমজুর, চাষী প্রভৃতির কর্মকোলাহলের মধ্যে,—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।
রৌদ্রেজলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে,
তারি মতন শুচিবসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।[১]

ঠিক এই কথাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে,—

ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান।
আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি
আমি যাযাবর কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি।[২]

'প্রশ্নে' রবীন্দ্রনাথ যেমন ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগ জানিয়েছেন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে, তেমনই ছবির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সুকান্তর লেখনীতেও।

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভীড়ে।
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার;

১। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৯১
২। ঠিকানা—ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য; পৃঃ ৩২

লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।......
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছো ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।......
আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিস্ফল
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।[১]

লক্ষ্য করার বিষয় যে এর মধ্যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্নে'র মতই এর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগ ও মনের হতাশার অভিব্যক্তি।

শিবরাম চক্রবর্তী একদা 'অ-লঘু' কাব্য রচনানিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর এই 'অ—লঘু' রচনাগুলির পরিচয় পাওয়া যায় 'মানুষ' ও 'চুম্বন' নামক বই দুইটিতে।[২] এগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। যেমন 'মানুষে' তিনি বলেছেন,—

মানুষ যখন পথ চলে
তার মনে, জীবনে, স্বজনে, চিত্ততলে—
দুঃখে—সুখে, শোকে—প্রেমে, আসক্তি—আঘাতে
ব্যর্থতা ব্যাঘাতে,
বিধাতা, দাঁড়ায়ে রহে ব্যগ্র কুতূহলে,
প্রাণে প্রাণে কহে তার হাত রাখি হাতে—
"এই পথ-সমাপ্তি উৎসবে
আমি পূর্ণ হবো, বন্ধু তুমি পূর্ণ হবে,
এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও মোর চেয়ে।"[৩]

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবেরই অনুরণন দেখা যায়,—

১। বোধন—ছাড়পত্র সুকান্ত ভট্টাচার্য ; পৃঃ ৫৯

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—সুকুমার সেন ; পৃঃ ২৯১ দ্রষ্টব্য।

৩। বিধাতায় চেয়ে বড়ো—মানুষ—শিবরাম চক্রবর্তী।

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা।…
আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এলো তোমার দুখ,
আমি এলেম, এলো তোমার আগুন ভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ—তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।……
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।[১]

এই ভাবে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে জড়িয়ে ছড়িয়ে আছেন যে আমাদের যে কোন চিন্তাকর্মে তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রদর্শন এমন ভাবে সকলকে প্রভাবিত করেছে যে তাঁকে ত্যাগ করে বর্তমান যুগে পথ চলা দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে পরবর্তীযুগে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা এই কারণে একান্ত আবশ্যক যে পরবর্তীযুগে তাঁর অনস্বীকার্য প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁর ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উভয়ই বহুল পরিমাণে কমে যায়। কারণ সমসাময়িক নয়, পরবর্তীযুগকে যে ধর্ম ও দর্শন প্রভাবিত ও পরিচালিত না করেছে তার ভার লঘু, সে স্থায়ী নয়। এই কারণেই পরবর্তী যুগের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব আরও সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

যিনি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চান, তিনি তাঁর অস্বীকারের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে আরও বেশী করে স্বীকার করে নেন। এইরূপে সৃষ্টি হয়েছে এক নবযুগের, যে যুগের ভাব, ভাষা, চিন্তা ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন নিবিড়ভাবে, যে যুগকে তিনি পরিচালিত করছেন অলক্ষিতরূপে।

১। বলাকা রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ৫০৪-০৫

গ্রন্থপঞ্জী

১। অগ্নিপুরাণম—১৩১৪— পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

২। আত্মজীবনী—৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬২— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। আত্মপরিচয়—১৩৬১— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। আত্মচরিত—১৩৫৯— শিবনাথ শাস্ত্রী।

৫। আধুনিক বাংলা কাব্য—১ম পর্ব, ১৩৬১—
তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—২য় সংস্করণ, ১৩৬৬—দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৩
—মোহিতলাল মজুমদার।

৮। আধুনিক সাহিত্য—১৩৫৫— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। আলালের ঘরের দুলাল—৩য় সংস্করণ, ১৩৬২
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১০। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে
—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত।

১১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৬
—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

১২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—২য় ভাগ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৮
—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

১৩। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—১৩৬৮—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৪। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—২য় সংস্করণ, ১৩৬৫—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

১৫। কৃষ্ণ চরিত্র—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৬। ক্রন্দসী— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১৭। ক্ষণিকা—১৩৬১— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮। চোরাবালি—১৩৬৭— বিষ্ণু দে।

১৯। চৈতন্যচরিতামৃত—১৯৬৩— কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সুকুমার সেন সম্পাদিত)

২০। ছাড়পত্র—৩য় সংস্করণ, ১৩৬৯— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

২১। জলসাঘর—১ম সংস্করণ, ১৩৬৬— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২। জঙ্গম—চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়, ১ম সংস্করণ, ১৩৬২—বনফুল।
২৩। জাতিস্মর — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪। জীবনস্মৃতি—১৯৬১— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৫। টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
২৬। ত্রয়ী—২য় সংস্করণ — শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
২৭। দশমহাবিদ্যা—১৩০০ — হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮। দত্তা — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৯। দিগঙ্গনা—১ম সংস্করণ, ১৩৬৭ — সুবোধ ঘোষ।
৩০। দ্রৌপদীর শাড়ী—১৯৪৮ — বুদ্ধদেব বসু।
৩১। ধম্মপদ—প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৩ — মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী।
৩২। ধর্মনীতি—১ম ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৮৯৪—অক্ষয়কুমার দত্ত।
৩৩। ধর্মতত্ত্ব—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩৪। ধর্ম ও জাতীয়তা—৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৩— শ্রীঅরবিন্দ।
৩৫। নজরুল গীতিকা—১৩৭১ — নজরুল ইসলাম।
৩৬। পথের পাঁচালী- ৮ম সংস্করণ, ১৩৬৩— বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭। পদ্মাবত — মালিক মুহম্মদ জায়সী, অনুবাদক—বাসুদেব শরণ অগ্রবাল।
৩৮। পাহুর দোঁহা — ডাঃ হীরালাল জৈন সম্পাদিত।
৩৯। পদ্মানদীর মাঝি—১১শ মুদ্রণ, ১৩৬৮— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪০। প্রতিভা—১৭শ সংস্করণ — রজনীকান্ত গুপ্ত।
৪১। বনলতা সেন — জীবনানন্দ দাশ।
৪২। বঙ্গে সুফী প্রভাব—১৯৩৫ — এমানুল হক।
৪৩। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৬
৪৪। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—১৯৫৫ — মোহিতলাল মজুমদার।
৪৫। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী—৩য় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত।
৪৬। বঙ্কিম জীবনী — শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৭। বন্দীর বন্দনা — বুদ্ধদেব বসু।

৪৮। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা—আব্দুল করিম।

৪৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড সুকুমার সেন।
অপরার্ধ, ১৩৬৯

৫০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৩য় খণ্ড, সুকুমার সেন।
৩য় সংস্করণ, ১৩৬৮

৫১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড—১৩৭০—সুকুমার সেন।

৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—১৯৬০— সুকুমার সেন।

৫৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের একদিক—৩য় সংস্করণ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
১৩৬৭

৫৪। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ—সুকুমার সেন।

৫৫। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—তৃতীয় সংস্করণ— সুকুমার সেন।

৫৬। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার— অক্ষয়কুমার দত্ত।
১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৮৭১

৫৭। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত
—২য় ভাগ

৫৮। বিচিত্র সাহিত্য—১ম খণ্ড — সুকুমার সেন।

৫৯। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—১৩৬০—রোমাঁ রোলাঁ;
অনুবাদক ঋষি দাস।

৬০। বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ, ১৯০৫— ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৬১। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—২য় খণ্ড,—বিনয় ঘোষ।
১ম সংস্করণ, ১৩৬৪

৬২। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—৩য় খণ্ড,—বিনয় ঘোষ।
১ম সংস্করণ, ১৩৬৬

৬৩। বিদ্যাসাগর— — চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৪। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—১৯৩৮— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

৬৫। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—১ম ভাগ,—অক্ষয়কুমার দত্ত।
১৩১৮

৬৬। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—২য় ভাগ,—অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৩১৪

৬৭। ভারত প্রেমকথা— — সুবোধ ঘোষ।

৬৮। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—১ম প্রকাশ,—সুকুমার সেন। ১৩৬৮

৬৯। ভূদেব রচনাসম্ভার—১ম প্রকাশ, ১৩৬৪— প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

৭০। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য—প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭— অতীন্দ্র মজুমদার।

৭১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত— যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৫ম সংস্করণ ১৯২৫

৭২। মানুষ — শিবরাম চক্রবর্তী।

৭৩। মানুষের ধর্ম—১৯৬০— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭৪। মেঘনাদবধ কাব্য—৫ম সংস্করণ, ১৯৫৮— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৭৫। মোহিতলালের কাব্যপরিক্রমা —১ম প্রকাশ—১৯৬২— দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ।

৭৬। যুগ প্রবর্তক বিবেকানন্দ-১ম সংস্করণ, ১৩৬৮—স্বামী অপূর্বানন্দ।

৭৭। রমেশ রচনা সম্ভার—১ম প্রকাশ, ১৩৬৪— প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

৭৮। রবিদীপিতা—তৃতীয় মুদ্রণ— সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

৭৯। রবীন্দ্রনাথ—কবি ও দার্শনিক—১৯৬২— মনোরঞ্জন জানা।

৮০। রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব—১ম প্রকাশ—১৩৬৫—বিমল কান্তি সমাদ্দার।

৮১। রবীন্দ্র সরণী—১ম প্রকাশ, ১৩৬৯— প্রমথনাথ বিশী।

৮২। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৯—নীহাররঞ্জন রায়।

৮৩। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান—১৩৬৮—বিমানবিহারী মজুমদার।

৮৪। রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড, ১৩৬৭ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৫। রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, ১৩৫৫ — প্রভাকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৬। রবীন্দ্রজীবনী—৩য় খণ্ড, ১৩৫৯ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৭। রবীন্দ্রজীবনী—৪র্থ খণ্ড, ১৩৬৩ —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮৮। রবীন্দ্ররচনাবলী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১ম খণ্ড

৮৯। রবীন্দ্ররচনাবলী ,, ,, ২য় খণ্ড
৯০। রবীন্দ্ররচনাবলী ,, ,, ৩য় খণ্ড
৯১। রবীন্দ্ররচনাবলী ,, ,, ৪র্থ খণ্ড
৯২। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ৫ম খণ্ড
৯৩। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ৬ষ্ঠ খণ্ড
৯৪। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ৭ম খণ্ড
৯৫। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ৮ম খণ্ড
৯৬। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ৯ম খণ্ড
৯৭। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ১০ম খণ্ড
৯৮। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ১১শ খণ্ড
৯৯। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ১২শ খণ্ড
১০০। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ১৩শ খণ্ড
১০১। রবীন্দ্র রচনাবলী ,, ,, ১৪শ খণ্ড
১০২। রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা—শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৬—উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য।
১০৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—১৩৬২—শিবনাথ শাস্ত্রী।
১০৪। রামকৃষ্ণের জীবন—১৯৪৯ — রোমাঁ রোলাঁ। অনুবাদক ঋষি দাস।
১০৫। রূপান্তর—১৯৪৪ — বুদ্ধদেব বসু।
১০৬। শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর বুদ্ধদেব বসু।
১০৭। শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—১৯৫৯ — বিমানবিহারী মজুমদার।
১০৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ, ১৭ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১০৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য়ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩য় ভাগ, ৯ম সংস্করণ, ১৩৫৬—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১১১। ষড়দর্শন সংবাদ—১৮৬৭ — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১২। সপ্তপদী — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১৩। সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ — জগদীশ ভট্টাচার্য।
১১৪। সঞ্চয়িতা—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৫ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১৫। সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী—১ম সংস্করণ ১৯১১ — কাশীনাথ ভট্টাচার্য।

১১৬। সাধক ভাব — স্বামী সারদানন্দ।

১১৭। সামাজিক প্রবন্ধ—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৩৭ — ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১১৮। সাম্য—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১৯। সারদামঙ্গল—১৩৬১ — বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১২০। স্বামী — শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২১। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী—১৩৩৪—
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

১২২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯

১২৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ ১৩৬৯

১২৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯

১২৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯

১২৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৮ম খণ্ড ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯

১২৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯

১২৮। সেকাল আর একাল—১৯৫১ — রাজনারায়ণ বসু।

১২৯। সীতারাম—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩০। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩১। হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা—১৯৫০ — ক্ষিতিমোহন সেন।

১৩২। হুতোমপ্যাঁচার নক্সা—২য় সংস্করণ, ১৩৬৫—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

পত্রপত্রিকা

১৩৩। কালিকলম।

১৩৪। গল্পভারতী।

১৩৫। দেশ।

১৩৬। দি বেদান্ত কেশরী।

১৩৭। বিদ্যাপীঠ।

১৩৮। বিজলী।

১৩৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা।

১৪০। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ।

১৪১। শনিবারের চিঠি।

১৪২। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা।

ENGLISH BOOKS

143. Ancient Sanskrit Literature—1859—Max Muller.
144. An Advanced History of India (Part I)—R. C. Mazumdar, H. C. Roy Choudhury and K. K. Datta.
145. An Idealist View of Life (Second Edition, 1957) —S. Radhakrishnan.
146. Begining of Secular Romance in Bengali Literature (1959)—Dr. S. N. Ghoshal.
147. David Hare (1949)—Peary Chand Mitra.
148. Dictionary of Islam—Thomas Patrik.
149. Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture —Rakhal Das Banerjee.
150. Epigraphica India—Vol. XV.
151. Epigraphica India—Vol. XVII.
152. Encyclopaedia of Islam—Vol. IV.
153. Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol. II, 1953) —James Hastings.
154. Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol. IX) —James Hastings.
155. Encyclopaedia of Religion and Ethics. (Vol. X)
156. Encyclopaedia of Religion and Ethics. (Vol. XII)
157. Encyclopaedia of Britanica (Vol. III, 1961).
158. History of Brahma Samaj I—Shivnath Shastri.
159. History of Dharmashastra, Vol II, Part I (1941) —P. V. Kane.
160. History of Japanese Religion (1930)—Anesaki.
161. History of Sanskrit Language—Vol. I—De and Dasgupta.
162. India and Indian Missions—Alexander Duff.
163. Indian Philosophy, Vol. I (2nd Edition, 1956) —Radhakrishnan.
164. Kumarsambhava (1923)—edited by M. R. Kale.
165. Modern Religious Movement in India (1943) —Dr. J. N. Farquhar.

166. Notes on Some Wanderings—Sister Nivedita.
167. Obscure Religious Cult (1946)—Shashibhusan Dasgupta.
168. Panini, His place in Sanskrit Literature (1861) —Theodor Goldstucker.
169. Personality—Rabindra Nath Tagore.
170. Raja Rammohan Roy (1911)—R. N. Samaddar.
171. Rammohan to Ramkrishna (1952)—F. Max Muller.
172. Religion of Man (1961)—Rabindra Nath Tagore.
173. Reminiscences of Vivekananda.
174. Selection from Gandhi—N. K. Bose.
175. Tagore and Gandhi Argue (1945)—Jag Pravesh Chander.
176. The Age of Imperial Guptas—Rakhal Das Banerjee.
177. The Centenary Book of Tagore (1961)—edited by Sukomal Ghosh.
178. The Chief Currents of Contemporary Philosophy (1950)—Dhirendra Mohan Dutta.
179. The Cultural Heritage of India—Vol. IV (2nd Edition, 1956)—Haridas Bhattacharya.
180. The Discovery of India (2nd Edition, 1946) – Jawaharlal Nehru.
181. The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (3rd Edition, 1931.)—P. C. Mazoomdar.
182. The Life Divine—Vol. I—Sri Aurobinda.
183. The Life Divine—Vol. II—Sri Aurobinda
184. The Master as I saw Him—Sister Nivedita.
185. The Philosophy of Hegel—W. T. Stace.
186. The Present Position of Woman (1911)—Sister Nivedita.
187. The Religions of World—Vol. II (1938)—Ramkrishna Mission Institute of Culture.
188. The Serpent Power (1924)—Arthur Avalon.
189. Types of Tragic Drama—C. E. Vanghan
190. View of History, Literature and Religion of Hindus—Ward.

JOURNALS ETC :

191. Harijan.
192. R. A. S. Journal.
193. Young India.

নির্ঘণ্ট